মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক বিশ্লেষণ

[Social, Psychological and Geo-Environment Analysis of Arsenicosis Patients in Shibchar Thana of Madaripur District]

অধ্যাপক ড. রেজওয়ান হোসন ভূঁইয়া
তত্ত্বাবধায়ক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

DIGITIZED
425546
Dhaka University Library
425546
GIFT

মোহাম্মদ সফুর খান
এম. ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ২২৮
শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৯-২০০০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভটি দাখিল করা হল]

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর,২০০৬

ঘোষণা পত্র

DIGITIZED

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক বিশ্লেষণ"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজেস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপিত করিনি।

তারিখ ঃ ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৬

মোহাম্মদ সফুর খান

এম.ফিল গবেষক

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

425546

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম. ফিল ডিগ্রির জন্য **"মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক বিশ্লেষণ"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ সফুর খান কর্তৃক রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

আমার জানামতে গবেষক মোহাম্মদ সফুর খান এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ বিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

সর্বপরি আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পান্ডলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। এরই ভিত্তিতে অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

4?5546

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

14.12.06

তত্ত্বাবধায়ক

তারিখ ঃ ১৪ডিসেম্বর' ২০০৬ইং

অধ্যাপক ড. রেজওয়ান হোসেন ভূঁইয়া
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

একটি অদৃশ্য নিরব ঘাতকের নাম আর্সেনিক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানকে তার নির্বাসিত জীবনে স্লো পয়জনিং করে হত্যা করা হয়েছিল। অর্থাৎ তার হত্যার জন্য যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল তার নাম আর্সেনিক। একজন ইতিহাস বিখ্যাত দুঃসাহসিক সম্রাটের জীবন নাটেকের শেষ দৃশ্য রচিত হয়েছিল এই ভয়ানক ও জীবন বিনাশী বিষ 'আর্সেনিক' দ্বারা। এছাড়া যুগে যুগে আর্সেনিক প্রয়োগে মানুষ হত্যার লোমহর্ষকময় বহু কল্প-কাহিনী ইতিহাসে লিবিপদ্ধ আছে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এই আর্সেনিক বিষে এখন আক্রান্ত ও জর্জরিত বাংলাদেশের বিশাল গ্রামীণ জনপদ ও তার ধারণকৃত প্রায় অর্ধেক মানুষ। এ আতংক আজ বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের তথ্যমতে দেশের ৬১টি জেলার নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আছে এবং দেশের প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ এই জীবননাশী আর্সেনিকোসিসে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি।

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি বিভিন্ন সমস্যা বহুল দেশ। আর এসব সমস্যার সাথে নতুন করে এই আর্সেনিককোসিস সমস্যাটি যুক্ত হয়ে দেশের সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে। এই সমস্যা হতে মুক্তি পেতে হলে দেশের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এই সমস্যার গভীরতা, প্রভাব, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাদের সচেতনতা সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের মানুষের মধ্যে আর্সেনিকোসিসের প্রভাব, প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সর্বপরি সামাজিক, মানসিক ও ভূ পরিবেশিক সচেতনতা বৃদ্ধির সামান্যতম প্রয়াস চালানো হয়েছে এই গবেষণায়।

আমি আশা করি **"আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক বিশ্লেষণ"** শীর্ষক এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ঠদের আর্সোনিকোসিস মোকাবেলায় এবং আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক ও মানসিক সমস্যা সমাধানে ও তাদের রোগ সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্ব পুর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমার এ উদ্দেশ্য সফল হলে বেঁচে যেতে পারে এই সর্বনাশা জীবনগ্রাসী রোগের সম্মুখীন দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠি। আর তাতেই আমার এই লেখা সার্থক হবে।

মোহাম্মদ সফুর খান
এম.ফিল গবেষক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতার স্বীকার

এই গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরীর ক্ষেত্রে প্রথম থেকে অর্থাৎ গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী প্রশ্নমালা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং শেষ পর্যন্ত পতিবেদনটি চূড়ান্তভাবে তৈরী করতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দ বোধ করছি। কেননা এই আনন্দের সাথে আমার অনেক দিনের পরিশ্রম জড়িত। তবে এই প্রতিবেদনটি তৈরী করতে গিয়ে নিজের অনেক সীমাবদ্ধতা ও উপলব্ধি করতে পেরেছি। ফলে অনেকেরই সাহায্য সহযোগিতা আমার পরিশ্রমকে সার্থক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক স্যার অধ্যাপক ড. রেজওয়ান হোসেন ভূঁইয়া কে। যার অনুপ্রেরণায় আমি এম. ফিল প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছিলাম, বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ও গবেষণার প্রতিটি পরতে পরতে যিনি আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উপদেশ দিয়ে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এম.ফিলে ভর্তির জন্য আমাকে আরো অনুপ্রাণীত করেছি আমার প্রিয় স্যার অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম। । কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি আমার ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আমানত উল্লাহ ও অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব স্যারকে। যারা আমাকে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে এম.ফিল করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ একটি কঠিন কাজ, এ ব্যাপারে যারা সহযোগিতা করেছিল তাদের মধ্যে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারী রোগীরাই অন্যতম। যারা অসীম যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে সময় দিয়েছেন ও কথা বলেছেন। এদের প্রতি রইল আমার অফুরান্ত ঋণ। এছাড়া আমি ঋণ স্বীকার করছি যারা গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছে। এদের মধ্যে ফিরোজ রশিদ, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মিতু মন্ডল, টুটন উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণার তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমি ছোট ভাই সোহাগ এর কম্পিউটার ব্যবহার করেছি। তার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. নুরুল আমিন, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, শিবচর এবং কলেজের অধ্যক্ষকে যিনি আমাকে গবেষণার কাজে বাইরে যেতে সময় করে দিয়েছেন।

আমার আরো ভাল লাগছে সেই সব সহপাঠীদের কথা মনে পড়ে যারা আমাকে এ ব্যাপারে সব সময়ই উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং যাদের রুমে গিয়ে আমি পড়াশোনাসহ গবেষণার অনেক কাজ করেছি।

গবেষণার পান্ডুলিপি কম্পোজ ও বিভিন্ন আলোক চিত্র সংযোজনে সহায়তা করেছে এক্সেল কম্পিউটার, সেতু প্যালেস কম্পিউটার এবং রংধনু কম্পিউটার সেন্টার। এদের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী।

মোহাম্মদ সফুর খান
এম.ফিল গবেষক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

মুখবন্ধ i

কৃতজ্ঞতাস্বীকার ii

সূচীপত্র iii-viii

সারণী সূচী ix-xi

চিত্র সূচী xii-xiii

মানচিত্র সূচী xiv

আলোকচিত্র সূচী xiv

প্রথম অধ্যায় ১-২৪

১. ভূমিকা ১

২. আর্সেনিকোসিস সমস্যা পর্যালোচনা ৩

৩. পরিবেশ ও আর্সেনিক সমস্যা ৫

৩.১. মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্ক ৫

৩.২. পরিবেশ ও আর্সেনিক দূষণ ৮

৪. আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস পরিস্থিতি ৮

৪.১. আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বিশ্ব পরিস্থিতি ৮

৫. আর্সেনিক ও আর্স্যোনিকোসিসের বাংলাদেশ পরিস্থিতি ১৪

৬. আর্সেনিক ও আর্সোনিকোসিসের গবেষণা এলাকা (শিবচর) পরিস্থিতি। ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫-৩৫

১. গবেষণা পদ্ধতি ২৫

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ২৫

৩. তথ্য সূত্র ২৮

৪. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ২৯

৫. মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস রোগী সণাক্ত করণ প্রসঙ্গে ৩০

৬. তথ্য বিশ্লেষণ ৩০

৭. গবেষণার যৌক্তিকতা ৩১

৮. অধ্যায় পরিকল্পনা ৩২

৯. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৩৪

তৃতীয় অধ্যায় ৩৬-৫৫

১. গবেষণা এলাকার পরিচিতি ৩৬

২. গবেষণা এলাকার ঐতিহাসিক পটভূমি ৩৭

৩. গবেষণার এলাকার ভৌগলিক প্রেক্ষাপট ৪২

৩.১. অবস্থান ও আয়তন ৪২

৩.২. ভূ প্রকৃতি ৪২

৩.৩. জলবায়ু ৪৩

৩.৪. মৃত্তিকা ৪৪

৩.৫. জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ৪৫

৩.৬. কৃষি ব্যবস্থা ৪৬

৩.৭. বনভূমি ও উদ্দিজ্জ ৪৮

৩.৮. নদ-নদী ৪৮

৪. গবেষণা এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা ৪৯

৫. গবেষণা এলাকার জনসংখ্যা ৫০

৬. গবেষণা এলাকার বসতি ও ঘরবাড়ি ৫২

৭. গবেষণা এলাকার পানি ব্যবহার ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা ৫৩

৮. গবেষণা এলাকার বিদ্যুতায়ন ৫৩

৯. গবেষণা এলাকার জনগণের পেশা ৫৪

১০. গবেষণা এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা ৫৪

১১. গবেষণা এলাকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ৫৪

চতুর্থ অধ্যায় ৫৬-৬৭

১. আর্সেনিক ও আর্সেনিকের বিষক্রিয়া ৫৬

২. আর্সেনিক কি ৫৭

৩. ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে আর্সেনিক ৬০

৪. পানিতে আর্সেনিক দুষণের প্রক্রিয়া ৬২

৫. মানব দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া ৬৩

পঞ্চম অধ্যায় ৬৮-৮৩

১. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয় ৬৮

২. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

২.১.	বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো	৬৯
৩.	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বৈবাহিক অবস্থা	৭৩
৪.	পরিবারের ধরণ	৭৪
৫.	পরিবার প্রধান ও আক্রান্তকারীর পেশা বা আয়ের উৎস	৭৫
৬.	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ধর্মীয় পটভূমি	৮০
৭.	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার স্তও	৮১
৮.	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক অবস্থা	৮২

ষষ্ঠ অধ্যায় **৮৪-১১১**

১.	আর্সেনিকোসিস রোগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী	৮৪
১.১.	আর্সেনিকোসিস	৮৪
১.২.	আর্সেনিকোসিসকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি	৮৫
২.	বিভিন্ন পর্যায়ে আর্সেনিকোসিসের উপসর্গ ও লক্ষণ সমূহ	৮৫
২.১.	লক্ষণ পূর্ব পর্যায়	৮৫
২.২.	লক্ষণ পরবর্তী পর্যায়	৮৫
৩.	ত্বকে প্রকাশ পাওয়া আর্সেনিকোসিসের প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গ	৮৬
৩.১.	ত্বকে প্রকাশ পাওয়া মেলানোসিসের ধাপ সমূহ	৮৭
৩.২.	ত্বকে প্রকাশ পাওয়া নিউকোমেলানোসিস	৮৭
৩.৩.	ত্বকে প্রকাশ পাওয়া হাইপার কেরাটোসিসের ধাপসমূহ	৮৭
৪.	ত্বক ব্যতীত অন্যত্র দেখা দেওয়া আর্সেনিকোসিসের প্রধান লক্ষণ সমূহ	৯০
৫.	মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস রোগী সণাক্তকরণ ও চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে।	৯০
৬.	গবেষণায় সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিস।	৯১
৬.১.	তীব্রতা অনুসারে রোগীদের আর্সেনিকোসিসের পর্যায়।	৯৩
৭.	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকোসিস সংক্রান্ত	
৮.	জ্ঞান এবং আর্সেনিকোসিস সণাক্তকরণে তাদের ভূমিকা।	৯৫
৯.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের গ্রহণীয় চিকিৎসা বনাম	
১০.	প্রকৃত বা প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা।	১০১
১১.	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের মন্তব্য।	১০৯

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ১১২-১৩৯

১. গবেষণা এলাকার আর্সেনিকোসিস রোগীদের খাদ্যভাস। ১১২

২. গবেষণা এলাকা শিবচরের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা ও তার পুষ্ঠিমান। ১১৪

৩. আর্সেনিকোসিস রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য তালিকা। ১১৬

৪. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের দৈনন্দিন খাদ্যাভাস, খাবার রুচি এবং রুচির পরিবর্তন। ১২২

৫. আক্রান্ত রোগীদের বিভিন্ন ধরণের শাক খাবার প্রতি আগ্রহ, অনাগ্রহ এবং পরিবর্তন। ১২৮

৬. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পানি পান ও হাটা চলাফেরার অভ্যাস। ১৩১

৭. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বর্তমান প্রতিদিনের গ্রহণকৃত খাদ্যের কিলোক্যালরী ও প্রয়োজনীয় পুষ্ঠিমান। ১৩৪

৮. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের খাদ্যাভাসের সার্বিক পর্যালোচনা। ১২৯

অষ্টম অধ্যায় ১৪৩-১৬৯

১. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বসতি, বাড়িঘরের ধরণ ও পরিবেশ। ১৪৩

২. বাসস্থান ও বসবাসের পরিবেশ। ১৪৩

৩. গবেষণা এলাকার নির্মানশৈলী ও ঘরবাড়ির ধরণ বিন্যাস। ১৪৪

৪. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের বসতি ও বসতির ধরণ বিন্যাস। ১৪৭

৪.১. বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি। ১৪৮

৪.২. সন্নিবিষ্ট ও অনুকেন্দ্রীক বসতি। ১৪৯

৫. রোগীদের পানীয়জল ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জলের উৎস। ১৫০

৫.১. রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পানের স্থিতিকাল। ১৫৩

৫.২. আর্সেনিক দুষিত পনির অন্যান্য ব্যবহার। ১৫৬

৫.৩. রোগীদের বর্তমান বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস। ১৫৮

৬. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সেনিটেশন ব্যবস্থা। ১৬২

৭. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা। ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় **১৭১-১৯২**

১. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাদজিক ও মানসিক অবস্থা এবং রোগীদের সচেতনতা। ১৭১
২. রোগীদের সামাজিক প্রতিক্রিয়া। ১৭২
২.১. কর্মক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া। ১৭২
২.২. পারিবারিক ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া। ১৭৪
২.৩. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া। ১৭৬
২.৪. ধর্মীয় ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া। ১৮০
২.৫. আর্থিক ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া। ১৮১
২.৬. ব্যক্তিগত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া। ১৮৪

দশম অধ্যায় **১৯৩-২১১**

১. গবেষণায় প্রাপ্ত আর্সেনিকোসিস রোগীদের সামাজিক,মানসিক ও ভূ পরিবেশিক সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকার। ১৯৩
২. গবেষণায় উদঘাটিত বিষয়সমুহ। ১৯৩
৩. সম্ভাব্য সুপারিশ সমূহ। ১৯৯
৪. আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানির বিকল্প ব্যবস্থা। ২০৭
৪.১ পাত কুয়া খনন। ২০৭
৪.২ ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারী। ২০৮
৪.৩ পারিবারিক ফিল্টার পদ্ধতি বা কলসি পদ্ধতি। ২০৮
৪.৪ বালতি পদ্ধতি (বাকেট ট্রিটমেন্ট ইউনিট)। ২০৮
৪.৫ রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি)। ২০৯
৪.৬ অ্যালকেন এনহেনসড একটিভেটেড এলুমিনা ফিল্টার। ২০৯
৪.৭ আর্সেনিক অপসারণ ইউনিট স্থাপন। ২১০
৪.৮ ছাঁকনির মাধ্যমে নলকূপের আর্সেনিক অপসারণ। ২১১
৪.৯ কলাম ফিল্টার (সফি ফিল্টার)। ২১১

একাদশ অধ্যায় **২১৫-২৩৬**

১. উপসংহার ও তথ্যপঞ্জি। ২১৫
১.১. উপসংহার। ২১৫
১.২. তথ্যপঞ্জি। ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

১.৩. পরিশিষ্ট -১। ২২৪

১.৪. পরিশিষ্ট -২। ২২৮

১.৫. পরিশিষ্ট -৩। ২৩৬

সারণী সূচী

সারণী ১.১ঃ শিবচর থানার ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিকমুক্ত ও আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ। ২০

সারণী ১.২ঃ ইউনিয়ন ভিত্তিক শিবচর থানার আর্সেনিককোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পরিসংখ্যান। ২১

সারণী ৩.১ঃ শিবচর থানার গ্রুপিং প্যাটার্ণ। ৪৭

সারণী ৩.২ঃ শিবচর থানার গ্রাম ও শহরের ঘর-বাড়ি তৈরীর প্রধান উপাদান। ৫২

সারণী ৪.১ঃ ত্যাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক বিক্রিয়ার ক্লিনিকেট প্যাথোলোজিক্যাল ফলাফলের তালিকা । ৬৪-৬৫

সারণী ৫.১ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের বয়ঃনিঙ্গ কাঠামো। ৬৯

সারণী ৫.২ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের বয়সশ্রেণীর সাথে আর্সোনিকোসিস হওয়ার তীব্রতার সম্পর্ক। ৭১

সারণী ৫.৩ঃ শিবচরের মোট জনসংখ্যার নারী পুরুষ অনুপাত। ৭২

সারণী ৫.৪ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিচয় ও তাদের জনমিতিক চিত্র। ৭৩

সারণী ৫.৫ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বৈবাহিক অবস্থা। ৭৩

সারণী ৫.৬ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবারের ধরণ। ৭৪

সারণী ৫.৭ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের প্রধান পেশা। ৭৬

সারণী ৫.৮ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিবারের মাসিক আয়। ৭৭

সারণী ৫.৯ঃ আক্রান্ত রোগীদের আয়ের সাথে কিলো ক্যালোরী গ্রহণের সম্পর্ক। ৭৯

সারণী ৫.১০ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বর্ণের ধরণ। ৮০

সারণী ৫.১১ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার স্তর। ৮১

সারণী ৬.১ঃ সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিস। ৯১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী	৬.২ঃ	আর্সেনিকোসিসের তীব্রতানুযায়ী সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিস পর্যায়।	৯৪
সারণী	৬.৩ঃ	সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ ধরা পরার সময়কাল।	৯৬
সারণী	৬.৪ঃ	আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ সণাক্তকরণের ক্ষেত্রে আক্রান্ত রোগীদের ভূমিকা।	৯৭
সারণী	৬.৫ঃ	আক্রান্তরোগীদের আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণে অন্যান্যদের ভূমিকা।	৯৮
সারণী	৬.৬ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের নিকট আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকি।	৯৯
সারণী	৬.৭ঃ	আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর রোগীদের করণীয় কাজ।	১০১
সারণী	৬.৮ঃ	আক্রান্তকারীদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তন।	১০৩
সারণী	৬.৯ঃ	আক্রান্তকারীদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তন কারণ।	১০৩
সারণী	৬.১০ঃ	ডাক্তারদের কারণে রোগীদের অন্যান্য সমস্যা।	১০৫
সারণী	৬.১১ঃ	ডাক্তারদের কারণে রোগীদের অন্যান্য সমস্যা সমুহ।	১০৫
সারণী	৬.১২ঃ	আর্সেনিকোসিসের কারণে রোগীদের অন্যান্য রোগ/বা সমস্যাসমূহ।	১০৬
সারণী	৬.১৩ঃ	আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ ও উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা।	১০৮-১০৯
সারণী	৬.১৪ঃ	আর্সেনিকোসিস হওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের মতামত।	১১০
সারণী	৭.১ঃ	কয়েকটি সাধারণ খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ (প্রতি ৫০ গ্রাম)।	১১৭
সারণী	৭.২ঃ	কয়েকটি সাধারণ খাবারে ভিটামিন 'এ' ও ভিটামিন 'সি' পরিমাণ (প্রতি ৫০ গ্রামে)।	১১৯
সারণী	৭.৩ঃ	বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের দৈনিক অনুমোদিত পরিমান।	১২০
সারণী	৭.৪ঃ	কয়েকটি দেশী বা গ্রাম বাংলার প্রচলিত খাদ্যের ক্যালোরিয়াম।	১২১
সারণী	৭.৫ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সাধারণ খাবারের প্রতি রুচি।	১২৪
সারণী	৭.৬ঃ	আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণের পর রোগীদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন।	১২৫
সারণী	৭.৭ঃ	আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণের পর রোগীদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন সমূহ।	১২৫
সারণী	৭.৮ঃ	আর্সেনিকোসিস আগে ও পরে রোগীদের দৈনিক খাবার গ্রহণ।	১২৭
সারণী	৭.৯ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগ সনাক্তের আগে ও পরে অধিক গ্রহণকৃত শাক-সবজি।	১২৮
সারণী	৭.১০ঃ	শিবচরের তিনটি অধিক প্রচলিত শাকের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান(প্রতি ১০০ গ্রামে)।	১৩০
সারণী	৭.১১ঃ	রোগীদের গ্রহণকৃত শাকের উৎপাদন পদ্ধতি।	১৩০
সারণী	৭.১২ঃ	আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণের আগে ও পরেদৈনিক পানি পানের পরিমান।	১৩১
সারণী	৭.১৩ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের হাটার ব্যাপ্তিকাল।	১৩৩
সারণী	৭.১৪ঃ	আক্রান্তরোগীদের বয়সানুসারে দৈনিক গড় প্রয়োজনীয় কিলোক্যালোরীর তালিকা।	১৩৫
সারণী	৭.১৫ঃ	আক্রান্তরোগীদের বয়সানুসারে দৈনিক গড় গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরীর তালিকা।	১৩৫
সারণী	৭.১৬ঃ	রোগীদের ক্যালোরিয়াম গ্রহণের সাথে আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার সম্পর্ক।	১৩৮
সারণী	৭.১৭ঃ	অধিক পরিশ্রমী একজনপ্রাপ্ত বয়স্কলোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য তালিকা।	১৪০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী	৭.১৮ঃ	স্বল্প পরিশ্রমী একজনপ্রাপ্ত বয়স্কলোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য তালিকা।	১৪১
সারণী	৮.১ঃ	আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের ঘর বাড়ির ধরণ (নির্মান শৈলীঅনুসারে)।	১৪৫
সারণী	৮.২ঃ	আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের নলকূপের মালিকানা।	১৫০
সারণী	৮.৩ঃ	আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের নলকূপে আর্সেনিকের উপস্থিতি।	১৫১
সারণী	৮.৪ঃ	আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের ব্যবহৃত নলকূপের গভীরতা।	১৫২
সারণী	৮.৫ঃ	আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ব্যাপ্তিকাল।	১৫৪
সারণী	৮.৬ঃ	আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের পানি পানের স্থিতিকালের সাথে আসেনিকোসিসের। তীব্রতার সম্পর্ক।	১৫৫
সারণী	৮.৭ঃ	পান করা ব্যাতীত গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত আর্সেনিকযুক্ত পানি।	১৫৬
সারণী	৮.৮ঃ	বর্তমান বিভিন্ন কাজে রোগী ও তাদের পরিবারের পানি ব্যবহার।	১৫৮
সারণী	৮.৯ঃ	রোগীদের বর্তমান আর্সেনিক দুষিত পানি পান সম্পর্কে মতামত।	১৬০
সারণী	৮.১০ঃ	বর্তমান আর্সেনিক দুষিত পানি পান বন্ধ না করার কারণ।	১৬০
সারণী	৮.১১ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বাড়ির পায়খানার ধরণ।	১৬২
সারণী	৮.১২ঃ	আক্রান্ত পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করার কারণ।	১৬৩
সারণী	৮.১৩ঃ	রোগীদের পায়খানায় যাওয়া আসার ক্ষেত্রে স্যান্ডেল ব্যবহার না করার কারণ।	১৬৫
সারণী	৮.১৪ঃ	আক্রান্ত রোগীদের পায়খানা হতে ফেরার পর হাত পরিস্কারের উপায়।	১৬৬
সারণী	৮.১৫ঃ	আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের বাচ্চাদের মলমুত্র ফেলার স্থান।	১৬৭
সারণী	৮.১৬ঃ	নিরাপদ পানি ব্যবহার না করলে কি কি রোগ হতে পারে এ ব্যাপারে রোগীদের মতামত।	১৬৯
সারণী	৯.১ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের কাজ করার সমস্যা সংক্রান্ত মতামত।	১৭২
সারণী	৯.২ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এই রোগের কারণে স্কুল হতে বের করে বা বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয় কিনা সে সংক্রান্ত মতামত।	১৭৪
সারণী	৯.৩ঃ	রোগীকে তার আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে পরিবার হতে তাকে পৃথক রাখা হয় কিনা? সে সংক্রান্ত মতামত।	১৭৫
সারণী	৯.৪ঃ	রোগীকে তার পরিবার এই রোগের কারণে আলাদাভাবে বিশেষ খাবার খাওয়ানোর মতামত।	১৭৫
সারণী	৯.৫ঃ	আক্রান্ত রোগীর সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবহার।	১৭৬
সারণী	৯.৬ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের বিবাহ কার্যক্রমের সমস্যা সংক্রান্ত মতামত ।	
সারণী	৯.৭ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের বিবাহ কার্যক্রমের সমস্যা সংক্রান্ত মতামত সমূহ।	১৭৭
সারণী	৯.৮ঃ	আর্সেনিকোসিসের কারণে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিয়ের পর বাপের বাড়ি পাঠানো হয় কিনা? সে সম্পর্কে রোগীদের মতামত।	১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণী	৯.৯ঃ	সামাজিক অনুষ্ঠানাদীতে আর্সেনিকোসিস রোগীদের আমন্ত্রণ সংক্রান্ত মতামত।	১৮০
সারণী	৯.১০ঃ	আক্রান্ত রোগীরা এই রোগের কারণে ফতুয়াবাজদের সম্মুখীন হওয়া সংক্রান্ত মতামত।	১৮১
সারণী	৯.১১ঃ	এই রোগের পেছনে রোগীদের আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত মতামত।	১৮২
সারণী	৯.১২ঃ	আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক ক্ষতির পরিমান।	১৮৩
সারণী	৯.১৩ঃ	আক্রান্তকারীদের এই রোগের জন্য বাইরে যাওয়া সংক্রান্ত মতামত।	১৮৪
সারণী	৯.১৪ঃ	নিজেকে আলাদা করে রাখার ক্ষেত্রে রোগীদের মতামত।	১৮৫
সারণী	৯.১৫ঃ	আর্সেনিকোসিসের কারণে রোগীদের একাকিত্ব সংক্রান্ত মতামত।	১৮৫
সারণী	৯.১৬ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের বিষাধগ্রস্থতা সংক্রান্ত মতামত।	১৮৬
সারণী	৯.১৭ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে রোগীদের স্বতঃস্ফুর্ততার মতামত।	১৮৭
সারণী	৯.১৮ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে রোগীদের হৃদয়ে আঘাত জনিত মতামত।	১৮৮
সারণী	৯.১৯ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে রোগীদের প্রতি অন্যান্যদের ব্যবহার।	১৮৯
সারণী	৯.২০ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে রোগীদের ব্যক্তিত্বে আঘাত জনিত মতামত।	১৯০
সারণী	৯.২১ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগ আল্লাহর গজব; সংক্রান্ত মতামত।	১৯১
সারণী	৯.২২ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগের ধরণ সম্পর্কে রোগীদের মতামত।	১৯২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র সূচী

চিত্র	১.১ঃ	মানুষ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পর্ক।	৬
চিত্র	১.২ঃ	মানুষ ও পরিবেশের আন্তঃ সম্পর্ক।	৭
চিত্র	১.৩ঃ	শিবচর থানার ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিক দুষিত নলকূপ।	২২
চিত্র	১.৪ঃ	শিবচর থানার ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিকোসিস রোগী।	২২
চিত্র	৫.১ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো।	৭০
চিত্র	৫.২ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের প্রধান পেশা।	৭৬
চিত্র	৫.৩ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী বা তাদের পরিবারের মাসিক আয়।	৭৮
চিত্র	৫.৪ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ধর্মের ধরণ।	৮০
চিত্র	৫.৫ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার স্তর।	৮২
চিত্র	৬.১ঃ	সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিস।	৯২
চিত্র	৬.২ঃ	সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের তীব্রতা বা পর্যায়।।	৯৪
চিত্র	৬.৩ঃ	সণাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের নাম জানার সময়কাল।	৯৬
চিত্র	৬.৪ঃ	আর্সেনিকোসিসের নাম জানার ক্ষেত্রে রোগীদের ভূমিকা।	৯৭
চিত্র	৬.৫ঃ	রোগীদের আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের ভূমিকা।	৯৮
চিত্র	৬.৬ঃ	আক্রান্ত রোগীদের নিকট আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকি।	১০০
চিত্র	৬.৭ঃ	আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর করণীয় কাজ।	১০২
চিত্র	৬.৮ঃ	সণাক্তকৃত রোগীদের চিকিৎসক পরিবর্তনের কারণ।	১০৪
চিত্র	৬.৯ঃ	চিকিসকদের কারণে রোগীদের সংঘটিত সমস্যা।	১০৫
চিত্র	৬.১০ঃ	আর্সেনিকোসিসের কারণে রোগীদের দেখা দেওয়া অন্যান্য রোগ ।	১০৭
চিত্র	৬.১১ঃ	আর্সেনিকোসিসের হওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের মতামত ।	১১০
চিত্র	৭.১ঃ	আক্রান্ত রোগীদের দৈনিন্দন খাবারের প্রতি রুচি।	১২৪
চিত্র	৭.২ঃ	আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হবার পর রোগীদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তনসমূহ।	১২৬
চিত্র	৭.৩ঃ	আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণের আগে ও পরে রোগীদের খাবারের সময়।	১২৭
চিত্র	৭.৪ঃ	আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করণের আগে ও পরে রোগীদের পানি পানের অভ্যাস।	১৩২
চিত্র	৭.৫ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের দৈনিক হাটার ব্যাপ্তিকাল।	১৩৩
চিত্র	৭.৬ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের দৈনিক গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী।	১৩৬
চিত্র	৮.১ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের ঘর বাড়ির ধরণ ও নির্মাণ শৈলী।	১৪৫
চিত্র	৮.২ঃ	রোগীদের নিজস্ব নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি।	১৫১

চিত্র ৮.৩ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের ব্যবহৃত নলকূপের গভীরতা। ১৫৩
চিত্র ৮.৪ঃ আর্সেনিকোসিস আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের স্থিতিকাল। ১৫৪
চিত্র ৮.৫ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত পানির অন্যান্য ব্যবহার। ১৫৭
চিত্র ৮.৬ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের বাড়ি গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস। ১৫৮
চিত্র ৮.৭ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পান বন্ধ না করার কারণ। ১৬১
চিত্র ৮.৮ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের বাড়ির পায়খানার ধরণ। ১৬৩
চিত্র ৮.৯ঃ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী না করার কারণ। ১৬৪
চিত্র ৮.১০ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের পায়খানায় যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে স্যান্ডেল ব্যবহার না করার কারণ। ১৬৫
চিত্র ৮.১১ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের পায়খানা হতে ফেরার পর হাত পরিস্কারের উপায়সমূহ। ১৬৬
চিত্র ৮.১২ঃ আক্রান্ত পরিবার বাচ্চাদের মলফেলার স্থান। ১৬৮
চিত্র ৮.১৩ঃ নিরাপদ পানির অভাবে সৃষ্ট রোগসমূহ (রোগীদের মতামত)। ১৭০
চিত্র ৯.১ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের কাজের সমস্যা। ১৭৩
চিত্র ৯.২ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা। ১৭৭
চিত্র ৯.৪ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ও বাপের বাড়ী ফেরৎ। ১৭৯
চিত্র ৯.৫ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের ফতুয়াবাজদের সম্মুখিন কি না। ১৮১
চিত্র ৯.৬ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের চিকিৎসায় রোগীদের খরচের পরিমাণ। ১৮৩
চিত্র ৯.৭ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের বিষাদ গ্রস্থতার মতামত। ১৮৬
চিত্র ৯.৮ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের স্বতঃস্ফুর্ততার মতামত। ১৮৭
চিত্র ৯.৯ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের হৃদয়ে আঘাত জনিত মতামত। ১৮৮
চিত্র ৯.১০ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের প্রতি অন্যান্যদের ব্যবহার। ১৮৯
চিত্র ৯.১১ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের ব্যক্তিত্বের আঘাত। ১৯০
চিত্র ৯.১২ঃ আর্সেনিকোসিস আল্লাহ প্রদত্ত গজব সংক্রান্ত মতামত। ১৯১
চিত্র ৯.১৩ঃ আর্সেনিকোসিস রোগের ধরণ সংক্রান্ত মতামত । ১৯২
চিত্র ১০.১ঃ একটি নমুনা পাতকূয়া। ২১২
চিত্র ১০.২ঃ একটি নমুনা ইদারা। ২১২
চিত্র ১০.৩ঃ একটি নমুনা আর্সেনিক অপসারণ ইউনিট। ২১২
চিত্র ১০.৪ঃ একটি নমুনা ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারী। ২১৩
চিত্র ১০.৫ঃ কলাম ফিল্টার বা শফি ফিল্টার। ২১৩
চিত্র ১০.৬ঃ পারিবারিক ফিল্টার বা কলসি পদ্ধতি। ২১৪
চিত্র ১০.৭ঃ আর্সেনিক মুক্তকরণ বালতি পদ্ধতি। ২১৪
চিত্র ১০.৮ঃ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি। ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র সূচী

মানচিত্র	১.১ঃ	আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বিশ্ব পরিস্থিতি।	১২
মানচিত্র	১.২ঃ	আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বাংলাদেশ পরিস্থিতি।	১৭
মানচিত্র	১.৩ঃ	আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের গবেষণা এলাকা শিবচর পরিস্থিতি।	২৮
মানচিত্র	৩.১ঃ	গবেষণা এলাকা শিবচরের অবস্থান মানচিত্র ঃ ১।	৪০
মানচিত্র	৩.২ঃ	গবেষণা এলাকা শিবচরের অবস্থান মানচিত্র ঃ ২।	৪১

আলোক চিত্র সূচী

আলোকচিত্র	৬.১ঃ	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সণাক্ত করণের ছবি ঃ ১।	৮৮
আলোকচিত্র	৬.২ঃ	গবেষণা এলাকার আর্সেনিকোসিস রোগীদের ছবি ঃ ২।	৮৯
আলোকচিত্র	৭.১ঃ	আর্সেনিকোসি প্রতিরোধমূলক কিছু দেশীয় পুষ্টিকর খাদ্যের ছবি ঃ ১।	১৪২/এ
আলোকচিত্র	৭.২ঃ	আর্সেনিকোসি প্রতিরোধমূলক গবেষণা এলাকায় প্রাপ্ত কিছু পুষ্টি খাদ্যের ছবি ঃ ২।	১৪২/বি
আলোকচিত্র	১০.৬ঃ	পারিবারিক ফিল্টার বা কলসি পদ্ধতি।	২১৪
আলোকচিত্র	১০.৭ঃ	আর্সেনিক মুক্তকরণ বালতি পদ্ধতি।	২১৪
আলোকচিত্র	১০.৮ঃ	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি।	২১৪

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা

সমগ্র জাতি ও পৃথিবী নামের এই গ্রহটির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। আর এ বিপদ হঠাৎ এমনি এমনি এসে হাজির হয়নি। মানুষ তার নিজের ভোগ-বিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও উন্নতির জন্য প্রকৃতিকে অপরিকল্পিতভাবে যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই ডেকে এনেছে এই বিপদ। প্রকৃতির বুকের ধনের যথেচ্ছা ব্যবহারের রুগ্ন প্রকৃতি যেন আজ প্রতিশোধ নিতে বসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমনটি হলো, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এই পরিণতিই কি অনিবার্য ছিল ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুব জটিল নয়।

পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছরের মতো। স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর আরো ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর টিকে থাকার কথা। এই সময়ে সূর্য তার সব হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলে প্রসারিত হবে এবং পৃথিবীসহ তার চার পাশের সব গ্রহ ভস্মীভূত করে দেবে, বিজ্ঞানীদের তাই ধারণা। অন্যদিকে পারমাণবিক মারণাস্ত্র পৃথিবীকে যে কোনো সময়ই ধ্বংস করে দিতে পারে। এই দুই চরম পরিণতির মাঝে রয়েছে পৃথিবীর আয়ু, যা কিনা মানুষের কর্মকান্ডের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

এ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক, একেবারে নিখুঁত হিসেব না পাওয়া গেলেও ধরে নেয়া হয়, ইতিহাসটা ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ বছরের। ১৮০০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে লোক সংখ্যা ছিল ১০০ কোটির মত। এরপর গত কয়েক শতকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির হাতিয়ার নিয়ে মানুষ যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তেমনি তার বংশ বৃদ্ধির গতিও হয়েছে দ্রুততর। বর্তমানে মানুষের এই সংখ্যাটি ৬০০ কোটির অংক ছাড়িয়ে ৭০০ কোটিতে চলছে। গত একশ বছরে মানুষের গড়পড়তা আয়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। নগরায়ণও বাড়ছে খুব দ্রুত। বিশ্বের অনেক দেশেই কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে। নানা ধরনের স্বাচ্ছন্দ এসেছে জীবনে। অন্যদিকে এই অতি সাফল্য আর দ্রুত বংশ বৃদ্ধি পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জন্য রীতিমত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমশই বিপর্যয়ের দিকে এগুচ্ছে। বায়ু মন্ডল, পানি, মাটি সবই দূষিত হচ্ছে সীমাহীনভাবে। এক শ্রেণীর মানুষের অতিরিক্ত মুনাফা লিপ্সা, এই বিপর্যয়কে আরো তীব্রতর করেছে। সঙ্গতকারণেই বাংলাদেশকে এর অধিক জনসংখ্যা, পরিবেশ অসচেতনতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার দরুণ সংকটের এই ধকল সইতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মাত্রায়।

নানা কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র, অবাধ বৃক্ষ নিধন ও বন উজার, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, শিল্পায়ণ ও যানবাহন থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নির্গত কালো ধোঁয়া যানবাহনে ব্যবহৃত উচ্চ শব্দযুক্ত হর্ণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, পৌর আবর্জনার নিরাপদ অপসারণ ব্যবস্থার অভাব, জ্বালানী স্বল্পতা, ইটের ভাটার ও তার ধোঁয়া ও ধুলা, অনিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ নিধন ও রপ্তানি, ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টন সমস্যা, অপরিষ্কার ও বদ্ধ ডোবা-নালার আধিক্য, অনেক জায়গায় ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যাধিক আহরণ, ভৌগোলিক অবস্থান ও নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জনসাধারণের উচ্চ হারের অশিক্ষা ও পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব। এসব কারণে এ দেশের বাতাস, পানি ও মাটিসহ সামগ্রিক পরিবেশ দূষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে একটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি। এটিকে বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। সংগত কারণেই যত্রতত্র অবলীলায় পানি পান করার বহুকালীন অভ্যেসটাকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। এ আমাদের বড় এক আক্ষেপের বিষয়। যে কোন মুমূর্ষু মানুষের মুখে এখনও আমরা ঢেলে দেই এক আজলা পানি, যেন তা রূপকথার জিয়ন-কাঠির মত কাজ করবে। ফিরিয়ে দেবে তার সুস্থতা। কিন্তু এখন আমরা জেনে গেছি পানি মাত্রই নিরাপদ কিছু নয়। পানিতেও মিশে থাকে অদৃশ্য মৃত্যুদূত। আমরা এখন খুঁজে ফিরছি 'নিরাপদ পানি' এই নিরাপদ পানির সংস্থানের জন্য যে শ্রম মূল্য এখন আমাদের দিতে হচ্ছে তাতে করে 'পানির দরে পাওয়া' বাগধারার অর্থ বদলে যেতে বসেছে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী দুশ-ত্রিশের মত নদী, উপনদী ও শাখানদী বিধৌত আমাদের এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ নদীমাতৃক বাংলাদেশ। এখানে কখনো খাবার পানির সংকট হতে পারে নিকট অতীতেও তা ভাবা হয়নি। প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশ ছিল তার পানির উৎসের জন্য স্বখ্যাত। নলকূপের আবির্ভাবের পূর্বে নদী, হ্রদ ও খালের মত প্রাকৃতিক উৎস এবং তৈরী পুকুর ও কুয়ার ভূ-উপরিভাগের পানিই ব্যবহার করে গেছে এ দ্বীপের (বাংলাদেশ) মানুষ। তবে এইসব উৎস হতে প্রাপ্ত পানি ব্যবহারের ফলে বেশ কিছু পানিবাহিত রোগ; বিশেষত কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রায়সই প্রাদুর্ভাব হতে থাকল। যা বহু লোকের বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। পানিবাহিত এ সকল সংক্রামক রোগ হতে রক্ষা পাবার জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হল। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষত ইউনিসেফ-এর ব্যবস্থাপনায় দেশের সর্বত্র নলকূপ বা টিউবওয়েল বসানোর উদ্যোগ শুরু হল। নলকূপের এই পানি ছিল জীবাণুমুক্ত এবং কোন প্রকার পরিশোধন ছাড়াই তা সরাসরি গ্রহণ করা হত। বিংশ শতাব্দীর শেষে দেশের প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ লোক এই ভূ-গর্ভস্থ পানির আওতায় চলে আসায় এবং পানিবাহিত সংক্রামক রোগ সমূহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় তা বেশ সন্তুষ্টির বিষয় ছিল। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে এই উদ্যোগ চলাকালীন ভূ-গর্ভস্থ সেই পানির মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হবার বিষয়টি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়নি। তাই আমরা বর্তমানে আর্সেনিক জনিত এক মারাত্মক আর্সেনিকোসিস সমস্যার সম্মুখিন।

২. আর্সেনিকোসিস সমস্যা পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সর্বত্র আজ আর্সেনিকোসিস আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার নলকূপের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে [অ.রহমান, ২০০০:৫৫]। এর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত বিস্তির্ণ এলাকা, দক্ষিণের বরিশাল বিভাগ, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার পরিস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক। এছাড়া দেশের উত্তরাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ইউনিসেফের সহায়তায় সারা দেশে ৩০ হাজার নলকূপের পানি পরীক্ষা করে পেয়েছে এই চিত্র। দেশের ৫৯ টি জেলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ আর্সেনিকোসিস নামক জীবণনাশী স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি বিশেষজ্ঞদের মতে, এদের মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি লোক এই কড়ালগ্রাসী আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার বাহুগ্রাসে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই গ্রামের দরিদ্র মানুষ [কে.ইসলাম, ২০০০: পূর্ব কথা] ফলে দেশব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে এক মারাত্মক স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক বিপর্যয়।

সম্প্রতি ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তজেলা সমূহে প্রতি হাজারে ৩.৮ জন রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ২০টি জেলায় ২০০ টি গ্রামের প্রতিটি পরিবার ও তাদের ব্যবহৃত নলকূপ জরিপ করে তারা এই তথ্য পেয়েছে। পরিবেশগত কোন একক সমস্যায় একসাথে এত মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অতি বিরল।

সম্প্রতি আমাদের দেশে আর্সেনিকোসিস সমস্যা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-খরা, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সুনামী, সাস ভাইরাস ইত্যাদির চেয়েও বেশী দুর্দশাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। এক সময় প্রকৃতির বিভিন্ন বিপর্যয়ে মানুষ ভাগ্যের উপর নির্ভর করতো কিন্তু আর্সেনিকোসিসের ক্ষেত্রে এটা পুরোপুরিই অসহায়। ইহা পরিবেশ ও সমাজের একটি সাংঘাতিক সমস্যা এবং আমাদের দেশের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়।

তের সদস্যের সুখের সংসার ছিল আব্দুর রশিদের। তিনি ছিলেন ১১ সন্তানের গর্বিত পিতা। জীবণ ছিল তার আশায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এখন কেবলই শূন্যতা। মরণ ব্যাধি আর্সেনিকোসিস তার ১১ সন্তানের ১০ সন্তানকেই কেড়ে নিয়েছে। বাকী যারা আছে তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এমনই অপর

একটি ৬ সদস্যের পরিবার হাসেমের। এই পরিবারের সকল সদস্যই আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। হাসেমের নাই দুটি পা। আর্সেনিকোসিস তার পা কাটতে বাধ্য করেছে। আরো বাধ্য করেছে তার দুই সন্তানের হাতের আঙ্গুল কাটতে [অ. রহমান, ২০০০: ৫৫] এমন একটি দুটি সংবাদ নয়। এ অবস্থা আজ বাংলাদেশের অনেক পরিবারেরই। তাই এই সমস্যা আজ কোন একটি পরিবারের একক সমস্যা নয় বরং এটি আমাদের দেশের জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় সমস্যা।

আর্সেনিকোসিস সমস্যা শুধু যে মানুষের জীবন বিনাশ করছে এবং স্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি করছে তা নয়। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবার নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক মানসিক সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। অজ্ঞানতা, কুসংস্কারসহ বিভিন্ন কারণে গ্রামীণ জনপদে আর্সেনিকোসিসকে আল্লাহর / শ্রষ্টার গজব বা অভিশাপ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এটিকে কুষ্ঠ ও ছোঁয়াচে রোগ ভেবে আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। এমনকি আক্রান্ত গ্রামগুলোও অন্যান্য গ্রাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে কেউ মেলামেশা করতে চায় না। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আর্সেনিক দূষণ একটি বড় ধরণের সামাজিক সংকট সৃষ্টি করছে। আক্রান্ত মেয়েদের বিয়ের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বিবাহিত নারীদের অনেককেই এই রোগের কারণে শ্বশুর বাড়ী হতে বিতারিত হতে হচ্ছে। প্রতিবেশীরা তাদের নলকূপের পানি পর্যন্ত ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে দাওয়াত করছে না। এরূপ ভয়াবহতা আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে / কল্যাণে ইদানিং অনেকেই জেনে গেছেন আমরা ভূগর্ভস্থ যে পানিকে এতকাল নিরাপদ পানি মনে করে আসছিলাম তা সব ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এর সাথে মিশে আছে বিশ, যার নাম আর্সেনিক (As: "A knownking of Poison")

New York times-এর ১০ই নভেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "বাংলাদেশ ইতিহাসের সবচেয়ে বিপুল মাত্রায় গণবিষাক্রান্ত হবার মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করছে। এদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক, দেশের চার মিলিয়নের চেয়েও বেশী আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপ পানি উত্তোলন করে প্রতি চুমুকে এই বিষ গ্রহণ করে চলেছে। এ ধরণের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটলে ন্যাশনাল গার্ড ডাকা হত এবং প্রত্যেককে বোতলকৃত পানি খাওয়ানো হত। আসলে এরূপ অবস্থা যে কোন দেশের জন্য একটি Medical Emergency".

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৯ সালের ২ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সি.বি.এস. টেলিভিশন তাদের এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এই আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস সমস্যাকে আখ্যায়িত করেছিল, "মানব ইতিহাসের বৃহত্তম দূর্যোগ" বলে। এই ভয়াবহতা আমরা প্রাথমিক ভাবে ততটা উপলব্ধি করতে না পারলেও এখন স্পষ্ট যে এই বিষে ধীরে, কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা আক্রান্ত হতে চলেছি।

৩. পরিবেশ ও আর্সেনিকোসিস সমস্যা

পরিবেশবাদ বিশ্বের একটি উজ্জ্বল ও নতুন একটি চিন্তা-চেতনা। উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতীয় আলোচনায় ইহা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা যথাযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। কেননা, শিল্পায়নের বিস্তারের ফলে পরিবেশের উপর অত্যান্ত ক্ষতিকর প্রভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের পরিবেশের অবস্থা আজ একটি পরীক্ষাগার স্বরূপ। তাই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পানি, মাটি, বায়ুমন্ডল ইত্যাদির ক্ষতিকর দিক এবং কিভাবে ইহা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করছে তা জানার চেষ্টা করছে। পরিবেশের খারাপ গবেষণাগুলো মানবিয় জনসংখ্যার মধ্যে নাটকীয় ভাবে বেড়ে গেছে, যা অতীত শতকের দিকে অকালে বোঝা যায়। পরিবেশের এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে পানি, মাটি, বাতাস, ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদির দূষণ থেকে। এছাড়া চাষযোগ্য জমিতে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ, পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ৬০ এর দশকের পর হতে বিশ্ব পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। অধিকন্তু পরিবেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে সেগুলো অতিক্রম করার জন্য আজ বিশ্বে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছে। পরিবেশের এই আন্দোলনের শরিকদার হিসেবে আর্সেনিকোসিস সমস্যার ক্ষেত্রে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শারিরীক মানবিক, সামাজিক ও ভূ-পরিবেশক বিশ্লেষণ এই আন্দোলনের পর্যায় ভূক্ত।

৩.১. মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক

পরিবেশ বলতে পানি, বাতাস, মাটি এবং প্রাকৃতিক উপাদান এবং এগুলোর মানবীয় সম্পর্ককে এবং অন্যান্য উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ছোটখাট অবয়বকে বুঝায়। পরিবেশ হলো জীবণকে সহযোগীতা করার সঞ্চিত সম্পদ। প্রকৃতির সর্বত্র পরিবেশ লুকায়িত। যার ফলে মানুষের সকল প্রকার আকর্ষণ এই পরিবেশকে ঘিরেই। মানুষসহ অন্যান্য সকল কিছুই পরিবেশের দ্বারা বেড়ে ওঠে। আধুনিক সভ্যতার যুগেও প্রকৃতির সহযোগীতা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে বিভিন্ন Technological Systems এর উন্নয়ন হচ্ছে। বর্তমানে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদে পরিণত করছে। এটা পরিবেশের সাথে আন্তঃ সম্পর্কের কারণেই সম্ভব হচ্ছে।

নিম্নে বিষয়টি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো

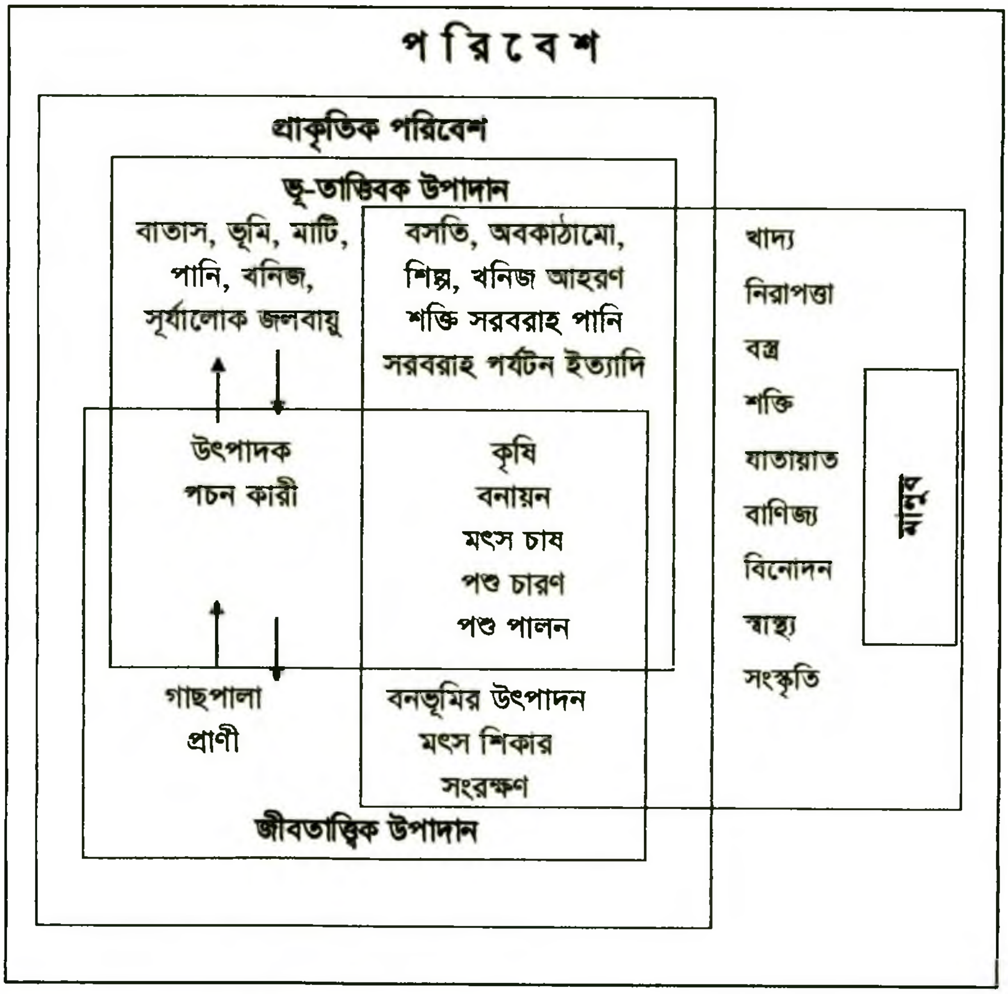

চিত্র১.১ ঃ মানুষ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পর্ক

উৎস ঃ Ahamed, 2002, Coded by F.Rashid, 2005।

Dhaka University Institutional Repository

হুসাইন তার "মানুষ / জনসংখ্যা ও পরিবেশের সম্পর্ক" বিষয়ক গবেষণায় মানুষ এবং পরিবেশের বিভিন্ন সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন এবং চিত্রের মাধ্যমে তিনি বিভিন্নভাবে এই সম্পর্ক দেখিয়েছেন। যেমন-

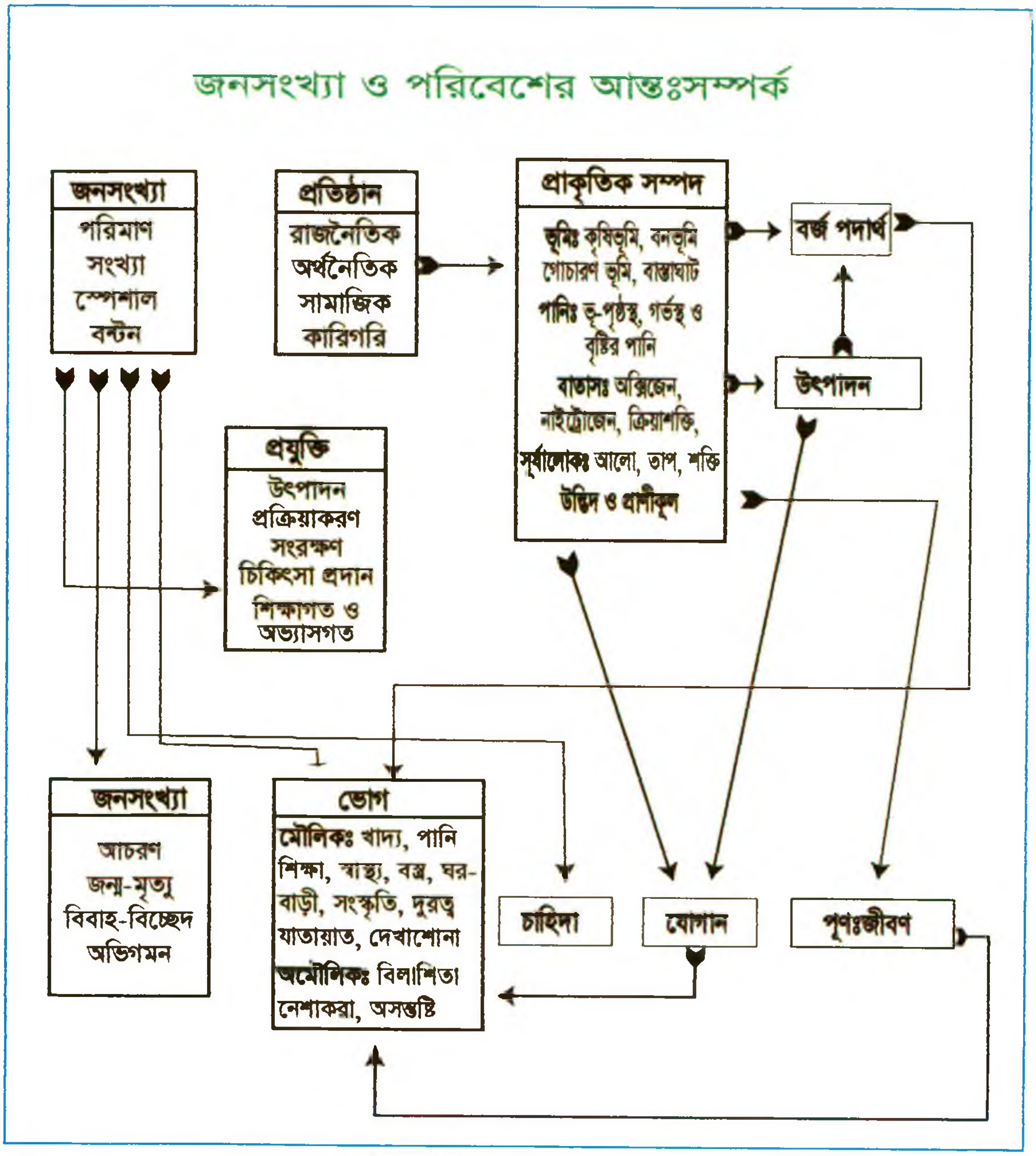

চিত্র ১.২ ঃ মানুষ/জনসংখ্যা ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক
উৎস ঃ হোসাইন, ২০০২, সংকলিত এফ.রশিদ, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.২. পরিবেশ ও আর্সেনিক দূষণ

প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের মৌলিক অধিকার রয়েছে। অনেক বছর পূর্ব হতেই মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং পরিবেশই তার প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করছে। কেননা মানুষ দ্বারাই পরিবেশ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও ধ্বংশ হচ্ছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সম্প্রতি মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড দ্বারা পরিবেশ হুমকি স্বরূপ।

পরিবেশ দূষণ আমাদের নিকট আজ অত্যন্ত অপ্রীতিকর বাস্তুসংস্থানের সংকটময় অবস্থা। আমরা জানি বসবাসের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান মনোরম বিষয় এগুলো হলো বাতাস, মাটি ও পানি। অতীতে এই মনোরম বিষয়গুলো ছিল খাটি, অক্ষতিকারক, দূষণহীন, সতী কুমারীর মত; অর্থাৎ বসবাসের জন্য অত্যধিক আদর্শবান বা অতিথি পরায়ণ। কিন্তু বর্তমান পরিবেশের এই অবস্থা উল্টো হয়েছে। কেননা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিবেশের উপর পরছে, ফলে পরিবেশের বিভিন্ন বাস্তুসংস্থানগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হচ্ছে।

বড় বড় নদীর নিম্নগতিতে বাংলাদেশের অবস্থান। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও এদের শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য নদীবাহিত পলি দ্বারা বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা গঠিত। তাই এদেশের মাটিও স্তরে স্তরে সজ্জিত। এই সজ্জিত স্তরের কোন এক পর্যায় অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে আর্সেনিকের গঠন ক্রিয়াশীল। আমাদের দেশে স্যালো টিউবয়েলের মাধ্যমে মানুষ এই সমস্ত পানি ভূ-পৃষ্ঠে উত্তোলন করছে এবং পান করা সহ অন্যান্য অনেক কাজে ব্যবহার করছে। ফলে মানুষ আস্তে আস্তে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হচ্ছে। যেহেতু আর্সেনিকোসিস একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া সেহেতু এর লক্ষণ কার্যকরী অবস্থায় প্রতিয়মান হয়। কাজেই এর প্রতিকার ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানা দরকার।

৪. আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের পরিস্থিতি

৪.১. আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বিশ্ব পরিস্থিতি

পৃথিবীতে আর্সেনিকোসিসের যে সব ঘটনা ঘটেছে তার কোনটি পানীয় জল, কোনটি কলকারখানা, আবার কোনটি খাদ্যদ্রব্য থেকে। ১৯৩৮ সালে আর্জেন্টিনায় পানি বাহিত আর্সেনিকোসিস রোগের তথ্য প্রথম পাওয়া যায়। আর্জেন্টিনার বেলিভিলি নগরে আর্সেনিকোসিসের প্রার্দুভাব হওয়ায় এ রোগটি প্রথম দিকে 'বেলভিলি ডিজিজ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকার প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ৬১টি জেলা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। এ পর্যন্ত (জুন ২০০২) চিহ্নিত আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার দু'শর মত বলা হলেও, পুঙ্খানুপুঙ্খ বাড়ি বাড়ি জরিপ করলে এই পরিসংখ্যান নিশ্চিত বাড়বে। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের এক জরিপে জানা যায় দেশে এখন দু'লক্ষেরও বেশি আর্সেনিকোসিস রোগী রয়েছে যাদের অধিকাংশই ভূগছে আর্সেনিক বিষক্রিয়া জনিত চর্মরোগে।

আর্সেনিকের আলামত সার্বজনীন। আর্সেনিকের সমার্থক শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষাক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত বিষাক্ততা আর্সেনিকোসিস স্বাস্থ্যের জন্য চরম ঝুকিপূর্ণ। মানুষ অনিবার্য কারণেই পানি পানের এবং রান্নার কার্যে ব্যবহৃত পানিতে বিরাজমান আর্সেনিকের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে। পানি পানের মাধ্যমে আমরা যে অতিমাত্রায় আর্সেনিকের সংস্পর্শে এসেছি এর সাথে আর্সেনিকোসিসের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। আর্সেনিক হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত একটি উপাদান যা পৃথিবীর কঠিন উপরিভাগ গঠনের উপাদান সমূহের মধ্যে প্রাচুর্যের দিক থেকে বিশতম এবং মানব দেহের গঠনের উপাদান সমূহের মধ্যে বারতম স্থানে রয়েছে। তাছাড়া ভূ-প্রকৃতিতে অন্যান্য উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় ১.৫ হতে ২ মিলিগ্রাম আর্সেনিক রয়েছে [NAS. 1977 coded by F. Rashid]। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন-ভারত, চিলি, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, হাঙ্গেরী, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়েছে পানির বিভিন্ন উৎস হতে। আর্সেনিকোসিস ব্যাপক হারে পরিবেশগত দূষণ এবং মারাত্মক স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণ। আর্সেনিকের দূষণের ফলে মানব দেহে আর্সেনিকোসিস এবং পরিবেশেও সংঘঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখন নিয়মিত এ ঘটনার সম্মূখীন হচ্ছে।

বর্তমানে ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ হচ্ছে বড় ধরনের বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক সমস্যা এবং পৃথিবীর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। অতিমাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আর্সেনিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে ফলশ্রুতিতে অনেক লোককেই সারাজীবন এর কুফল নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক মানুষ এই ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে ভীতু হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেকেই আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে ব্যাপক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ভূ-তলস্থ পানির আর্সেনিকের স্তর খুবই দীর্ঘ। সাধারনত বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলে আর্সেনিকের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে

চীন, মঙ্গোলিয়া, তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ডে ভূ-তলস্থের পানি পান করার জন্য অসংখ্য মানুষ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে বিশ্বের পাঁচটি অঞ্চলে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬,০০,০০০। নিম্নে কয়েটি উল্লেখযোগ্য আর্সেনিকোসিস দেশের নাম আলোচিত হল।

তাইওয়ান ঃ তাইওয়ানে প্রথম ব্যাপকহারে আর্সেনিক ধরা পরে ১৯৫৮ সালে তাইওয়ানের জি জি প্রদেশে। ইয়েনশাহ পর্বতের দক্ষিণে এবং হলকে নদীর উত্তরে অবস্থিত টিউমোট এবং হিটাও অঞ্চল হচ্ছে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক আক্রান্ত একটি অঞ্চল। এ অঞ্চলের প্রায় দশ হাজার বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিকের অস্তিত্ব। এছাড়া পূর্ব ভাক্সিং এ্যাংলিং উপত্যকায় বসন্তকালীন পানিতে, উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক আছে। এ অঞ্চলের ব্যাপ্তী প্রায় ৫০ বর্গ কি. মি.। পানিতে উঁচু মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে নিম্নভূমি অঞ্চলেও। অতিমাত্রায় আর্সেনিক আক্রান্ত এসব এলাকা সমূহে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিকোসিস রোগীও রয়েছে।

১৯৮৫ সালের শেষের দিকে আর্সেনিকোসিসে তাইওয়ান প্রদেশের জিই এবং তাইনান অঞ্চলে 'কালো পা' রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৩৬ জনে। দেশটিতে ১৯৯৬ সালে আর্সেনিক সংক্রান্ত গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় Fluoride and Arsenic Society of China (FASC).

চীন ঃ চীন দেশে আর্সেনিকোসিস ধরা পড়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। যদিও এর ইতিহাস খুব ছোট কিন্তু এর অবস্থা এবং বিস্তৃতি খুবই ব্যাপক। মূল ভূখন্ডের জিনজিয়ান প্রদেশের কুইয়ুনে ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। ১৯৮৩ সালের এক জরিপে দেখা যায় যে, ঐ অঞ্চলের এক লক্ষ লোকের মধ্যে দুই হাজারেরও বেশি রোগী ছিল যারা আর্সেনিকোসিস দ্বারা আক্রান্ত।

জাপান ঃ জাপানের টৌরেকু খনি এবং মিয়াজাকি শোধনাগারে সর্ব প্রথম সাদা আর্সেনিক ধরা পড়ে। এতে ১৯৩০ সাল এক পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু ঘটে এবং কতিপয় ঘরের অধিকাংশ লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক জরিপে দেখা গেল যে খনি আবিষ্কারের পর থেকে গড় আয়ুস্কাল জাপানীদেরও কমে যেতে শুরু করল।

Dhaka University Institutional Repository

ইরান ঃ ইরানের কুর্দিস্থান প্রদেশ যা ৩৪°৪৪′ থেকে ৩৬°৩০′ উত্তর এবং ৪৫°৩১′ থেকে ৪৮°১৬′ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এবং ইরাকের প্রতিবেশী। এ অঞ্চলে ব্যাপক হারে আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। একই ভৌগোলিক সীমারেখায় অবস্থিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক ধরা পড়েছে। ইরানের অনেক গ্রামে ৩০ বছর পূর্ব হতেই আর্সেনিকোসিস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গ্রামগুলোতে ১.৪৮Mg মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

থাইল্যান্ড ঃ ন্যাকন শ্রী থামারালি প্রদেশের রণপিবোল জেলার কয়েক হাজার লোক প্রায় সাত দশক ধরে ভূ-পৃষ্ঠস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণের ফলে আর্সেনিকোসিস দ্বারা আক্রান্ত। এটি হচ্ছে থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের একটি প্রদেশ। ১৯৮৭ সাল থেকে সরকারী ভাবে ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়ে তদারকী করা হয়। যেমন বৃষ্টির পানি বড় কোন পাত্রে ধারণ করা। নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পানীয় জলের ব্যাপারে মনিটরিং করা। যে সমস্ত রোগী স্কিন রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ভারত ঃ ভারতের পশ্চিম বাংলায় ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে যা ভারতের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সকল স্তরের জনগণ এবং সরকারের সেবামূলক সকল প্রতিষ্ঠান অত্র অঞ্চলের আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণের জন্য একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের ৮টি জেলার (মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধওয়ান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগাণা, হাওড়া এবং হুগলী) আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা দ্বারা আক্রান্ত। এ অঞ্চলের আয়তন ৩৮,০০০ বর্গ কি. মি. এবং অঞ্চলে প্রায় ৩৮ মিলিয়ন লোক বাস করে। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় যে, পশ্চিম বাংলায় ১.৫ মিলিয়ন লোক আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে এবং আর্সেনিকোসিস দ্বারা অনেকেই ভূগছে। বর্তমানে গঙ্গা নদীর পার্শ্ববর্তী ৬১টি ব্লকে ব্যাপক হারে আর্সেনিক পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া চন্ডিগড়ে এবং পাঞ্জাবে ১৯৭৬ এবং ১৯৭৯ সালে অতিমাত্রায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা যায়।

হাঙ্গেরী ঃ হাঙ্গেরীতে ১৯৮৪ সালের পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ শহরের (ক্যারাগ শহরে) পাইপের পানিতে আর্সেনিক পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলের ২৪,০০০ অধিবাসী আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকির মাঝে বাস করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইংল্যান্ড ঃ ইংল্যান্ডে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল হচ্ছে আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চল, ডেভেন এবং কর্নওয়াল প্রদেশ আকারে ছোট কিন্তু এই দুটি এলাকা দক্ষিণ পূর্ব ইংল্যান্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আর্সেনিক দূষণযুক্ত এলাকা। তবে এই এলাকায় বেশ কয়েকজন আর্সেনিকোসিস রোগীর ও সন্ধান পাওয়া গেছে।

জার্মানী ঃ ১৮৭৯ সাল পূর্বে জার্মানীতে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল আর্সেনিক গ্রহণের ফলে ব্যাপকভাবে ফুসফুসের ক্যান্সার হয়। এর কিছুদিন পরে হাটসিনসন রিপোর্ট প্রকাশ করলেন যে, রোগীদের স্কিন ক্যান্সারের কারণ হচ্ছে আর্সেনিকাল ঔষধ গ্রহণ। এছাড়া, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, চিলি, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে আর্সেনিক এবং আর্সেনিকোসিসের প্রার্দুভাব লক্ষণীয়।

আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বিশ্ব পরিস্থিতি মানচিত্রে দেখানো হল।

আর্সেনিকের বিশ্ব পরিস্থিতি

মানচিত্র ঃ ২.১

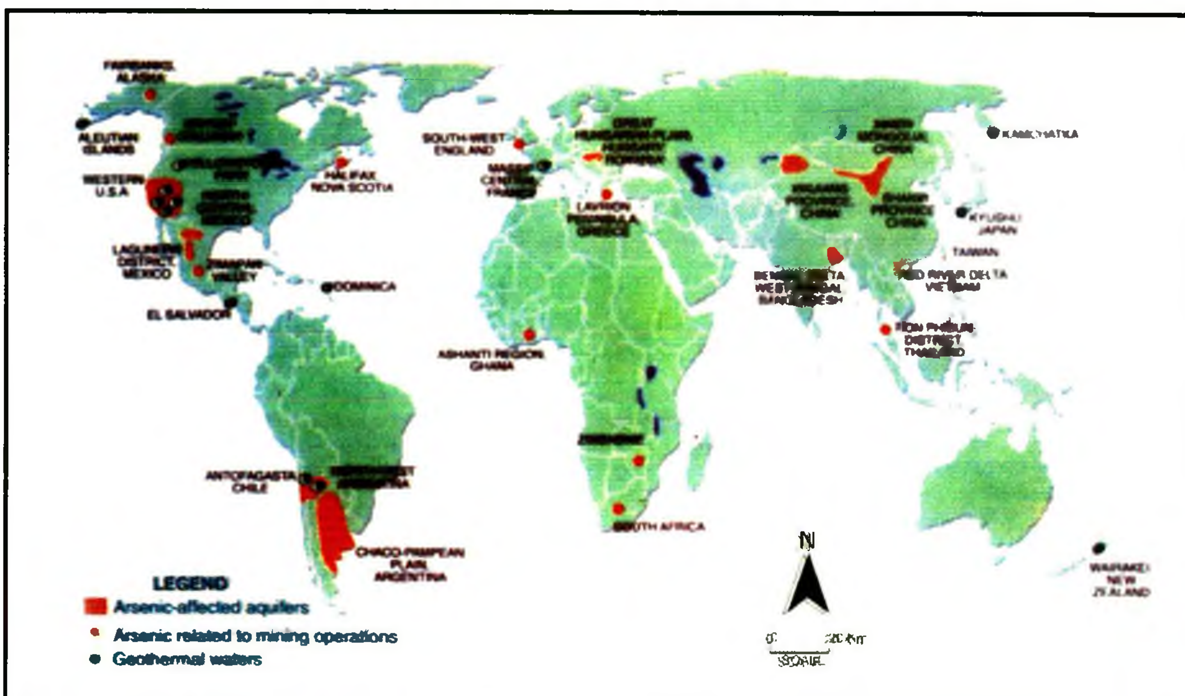

উৎস ঃ কে. ই. চৌধুরী, ২০০১, অর্সেনিক চিত্র ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বাংলাদেশ পরিস্থিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বা ২০°৩৪′ হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। বাংলাদেশের ভূমি ও ঐ দেশে বসবাসকারী জনসাধারণের উপর বঙ্গোপসাগরের উপর ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। ইহা ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের আয়তনের একটি দেশ যার লোকসংখ্যা প্রায় ১৩০ মিলিয়ন। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। কিন্তু জনসংখ্যা অধ্যুষিত কৃষিনির্ভর অর্থনীতির গ্রাম প্রধান একটি দেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর বৃহৎ ব-দ্বীপ। ইহা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকা দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক সমতল ভূমি। এ ভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জালের ন্যায় ছোট বড় প্রায় ২৩০ টি নদী। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই নদীজ, নদীজ ব-দ্বীপ এবং উপকূলীয় পলল দ্বারা বেষ্টিত নিম্নভূমি। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবছরই এর একটি বৃহৎ অংশ প্রলংকারী বন্যার কবলে পতিত হয়।

বাংলাদেশের ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ধরণের উদ্বেগের বিষয়। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ সম্পর্কিত সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আর্সেনিক। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে আর্সেনিকোসিস এবং পরিণামে মৃত্যু। বিশ্বের ৪টি আর্সেনিক বিপর্যয় অঞ্চল এশিয়াতে অবস্থিত। অঞ্চলগুলো হল ঃ বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, ভারত, অন্তবর্তী মঙ্গোলিয়া, জিনজিয়াং প্রদেশ পি.আর চীন এবং তাইওয়ান [F. Rashid, 2005: 34]। বাংলাদেশের ভূ-তলস্থ পানির উৎস্যে আর্সেনিক দূষণ হচ্ছে এককভাবে সর্ববৃহৎ হুমকীস্বরূপ। বাংলাদেশের ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক বিষের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে ফারাক্কা বাঁধ, তিস্তা ও অন্যান্য বাঁধের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা ভারত দ্বারা বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ নদীগুলোতে আবিস্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ শুরু হয়েছে ১৯৭৫ সালের পর থেকে [ব্রীজ এবং হুসাইন-২০০০)]।

বর্তমান সরকার প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১টি জেলা এবং ২৮টি মিউনিসিপ্যাল এলাকা আর্সেনিক দূষণের হুমকীতে পরিপূর্ণ [চৌধুরী-২০০১]। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবানে এখনও জরিপ চালানো হয়নি। পানীয় জলে সর্ব প্রথম আর্সেনিক ধরা পরে ১৯৭০ সালের পর। ভারতের পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর (DPHE) ১৯৯৩ সালে ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক উত্তোলনের কথা ঘোষণা করেন। জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অধিদপ্তর এবং বিট্রিশ ভূ-তাত্ত্বিক বিভাগ দ্বারা সারাদেশ ব্যাপী পরিচালিত ১৯৯৯ সালের

Dhaka University Institutional Repository

জরিপে দেখা গেছে যে, দেশের ৪৭টি জেলার প্রায় ২১ মিলিয়ন লোক আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে। ঢাকা আনবিক শক্তি কেন্দ্রের রসায়ন বিভাগ দ্বারা ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে সর্ব প্রথম রাজশাহী বিভাগের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার বড়োয়ারিয়া গ্রামে বাংলাদেশের ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক আবিস্কৃত হয় । আলী এবং তরফদার ২০০২ সালে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেণ যে, ভারতের সীমান্ত বর্তী অঞ্চলগুলো হতে ব্যাপক আর্সেনিক দূষিত পানি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করে। ১৯৯৫ সালে সর্ব প্রথম আর্সেনিকোসিস রোগী চিহ্নিত করা হয়। বিরামহীনভাবে যাদের চুল, নখ, ও রক্তে এ রোগের প্রভাব পড়েছে। সাধারণ ভাবে আর্সেনিক সমস্যা প্রধানত ভূ-তাত্ত্বিক সমস্যা হলেও এটাকে নৃ-তাত্ত্বিক কার্যাবলীর অবনতি ঘটানো হিসেবে ধরা হয়। কেননা ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ এবং আর্সেনিকোসিস ভয়াবহতা মানব জাতীর উপরই ক্রিয়াশীল। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের দেশে নব্বই এর দশকের শুরুর দিকেও প্রায় অজানা ছিল। যদিও আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলায় এর প্রমাণ মিলেছিল ১৯৭৮ সালে। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ভারতের সীমান্ত বর্তী ৩৪টি জেলাতেই রয়েছে চরম আকারে আর্সেনিক দূষণ।

যদিও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস সমস্যা নিয়ে নিয়মিত অনুসন্ধান করে যাচ্ছে, তার পরেও ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের সঠিক কারণ এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। ভূ-তাত্ত্বিকদের অভিমত যে, বাংলাদেশের মত দেশ সমূহে ভূ-তলস্থ পানীয় জলের ট্যাপিং, সেচ ও অন্যান্য গৃহস্থালীর কার্যে ব্যবহারের কারণেই আর্সেনিক স্তর উপরে উঠে আসছে এবং এটা পানির স্তরের সঙ্গে মিশে গিয়ে আর্সেনিক দূষণ ঘটাচ্ছে। আর্সেনিকের বিচরণ পরিবেশে প্রধানত মাটি এবং পানিতে। তবে বাংলাদেশের মাটির উচুস্তরের পানির সাথে আর্সেনিকের দূষণ এখনও ভালোভাবে জানা যায়নি। অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিভিন্ন ধরণের অনুমান নির্ভর তথ্য প্রদান করা হয়। সুইডেনের স্টকহম রয়েল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজীর একদল ভূ-তত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে, আর্সেনিক হচ্ছে ফেরিক হাইড্রো অক্সাইডের বিচ্ছুরণ যা পললের অন্ত বর্তী নির্দিষ্ট অবণমিত অবস্থা। কিছু কর্তৃপক্ষ এর থেকে ভিন্নমত প্রদর্শন করেছেন। তাদের মতে দ্বিধামূলক পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশের উচু অঞ্চল সমূহে এখনও পরিষ্কারভাবে আর্সেনিক চিহ্নিত হয়নি। তাছাড়া খুব অল্প পরিসরেই ভূ-তলস্থ পানিতে সালফেটের পরিমাণ প্রত্যক্ষ হয়।

বাংলাদেশের ভূ-তলস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের কথা ব্যাপকভাবে রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে [DPHE-99]। এটা জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক সমস্যা। অতিমাত্রায় আর্সেনিক দূষিত

Dhaka University Institutional Repository

পানি পান স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। পরিণতিতে আর্সেনিকোসিসের করাল গ্রাসে আক্রান্ত হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। বাংলাদেশে ব্যবহৃত পানীয় জলের ৯৫ শতাংশই ভূ-তলস্থ পানি। যে সকল লোক পানীয় জলের মাধ্যমে হিসেবে টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে থাকেন তাদের সবাইকে আর্সেনিকোসিস আক্রান্তের আশংকায় উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। কেননা প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গেই আর্সেনিকের সম্পর্ক। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিাঞ্চলের জেলাগুলোতে ও উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক মিশ্রিত। অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট যে, আর্সেনিকের উৎসের সঙ্গে ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারের একটি উদ্বেগের কারণ হচ্ছে ভূ-তলস্থ পানির আর্সেনিক চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ সরকার একে জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং সরকার এর জন্য তার সমস্ত বিভাগকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ভূ-তলস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও উপশম করার জন্য সরকার তিনটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী গঠন করেছেন 'ন্যাশনাল ষ্টিয়ারিং কমিটি, স্বাস্থ্য সেবার পরিচালক গঠন করেছেন 'আর্সেনিক টেকনিক্যাল কমিটি' এবং আনবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সাইন্টিফিক রিসার্স কমিটি'। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী বিভাগের মাধ্যমে একটি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করেছে আর্সেনিক চিহ্নিতকরণ এবং স্বাস্থ্য জরিপের জন্য। বাংলাদেশ সরকারের চিকিৎসা এবং পরিবেশ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৯৪ সাল থেকে রোগী সনাক্তকরণ, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মামলা, পানি পরীক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পুরস্কার সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ে কাজ করে যচ্ছে। সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশলী অধিদপ্তর, কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ এনভাইরনমেন্টাল স্টাডিস' হতে আর্সেনিক দূষণের বিভিন্ন দিকের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে আর্সেনিকোসিস রোগ জনসাধারণের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুকি। ভূ-তলস্থ আর্সেনিক দূষিত পানির উপরে আসার প্রতিফলন হচ্ছে আর্সেনিকোসিস। এ রোগের কারণে আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এবং মানসিকভাবে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

অপর পৃষ্ঠায় আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

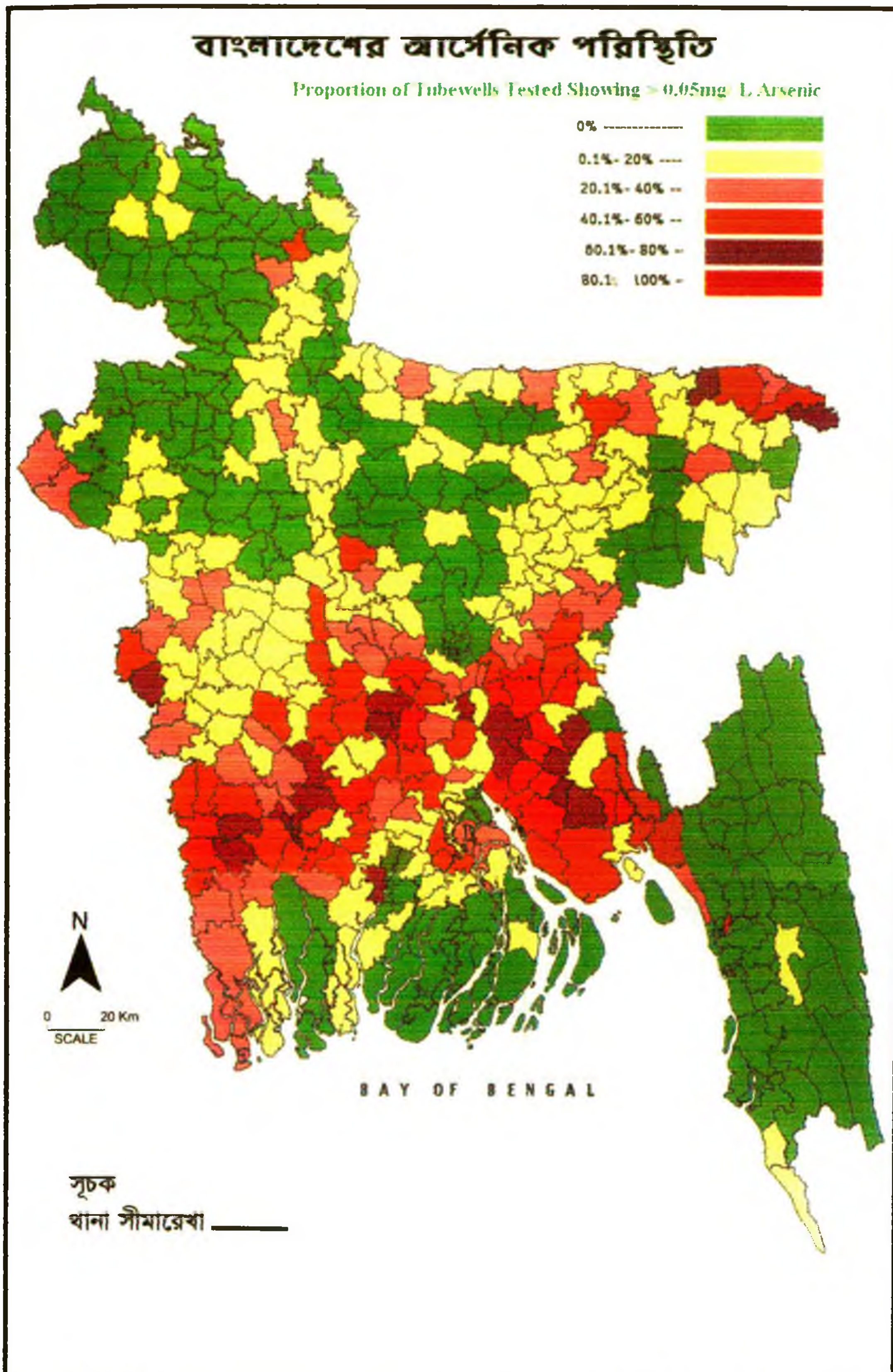

মানচিত্র ঃ ১.২

উৎস ঃ কে. ই. চৌধুরী, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

৬. আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের শিবচর পরিস্থিতি

বাংলাদেশের একজন পানি বিশেষজ্ঞ মরহুম আমজাদ হোসেন খান, ১৯৯৭ সালে দেখতে পেয়েছিলেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ পশ্চিম জেলাগুলোর পানিতে আর্সেনিক। এই আর্সেনিক দূষণের সূত্রপাত হয়েছিল বাংলাদেশ সীমান্তের ভারতীয় রাজ্য পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষ করে গঙ্গা ভাগরথী নদীর পূর্ব প্রান্তে, এরপর সেই আর্সেনিক ভূগর্ভস্থ পানিতে মিশে বাংলাদেশে প্রবেশ করে [কামরুল, ১৯৯৭]। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকার জেলাগুলো আর্সেনিক বিষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ হিসেবে আরো উল্লেখ করেন সীমান্তবর্তী এই দুই এলাকার তলানী এক এবং অভিন্ন, এদের থিতিয়ে পরার ইতিহাস ও ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ এক এবং অভিন্ন। জনাব খান তার গবেষণায় আরো উল্লেখ করেছেন ভারতের পশ্চিম বঙ্গের দূষিত এলাকার জলাধার এবং সেই এলাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত আমাদের পদ্মা নদী ও অন্যান্য নদীর জলাধার একই হাইড্রোলজিক্যালি যুক্ত। ফলে এসব নদী বাহিত ভারতীয় তলানী আমাদের দেশের নিম্নভূমি ও ভাটি অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে যে ভূ-ভাগ গঠন করেছে সেসব ভূ-ভাগের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক। এমনি একটি পলল গঠিত ভূ-ভাগের নাম শিবচর, যা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত।

পদ্মা নদীর প্রধান শাখাসহ, আড়িয়াল খাঁ, ময়নাকাটা এবং পদ্মার আরো কয়েকটি শাখা-প্রশাখা, উপশাখা এই থানাটির বুক ভেদ করে বয়ে চলেছে। এ অঞ্চলে প্রতি বছরই বন্যা হয় এবং অধিকাংশ নিম্নভূমি প্লাবিত হয়। তবে এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক বনভূমি তো নেই-ই অন্যান্য (মানুষের গড়া) বনভূমি মধ্যে রাস্তার ধারে কিছু গাছ-গাছালি এবং কিছু বাঁশঝার ছাড়া একক ভাবে তেমন কোন বিস্তৃত বনভূমি দেখা যায় না। এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ নিরাপদ পানির স্তর বেশ নিচে। ভূ-পৃষ্ঠের অল্প নিচে ভাল পানির স্তর নেই বললেই চলে। ভূ-অভ্যান্তরের ৪০-৫০ ফুট নিচে যে পানি পাওয়া যায় তার পরিমাণ অল্প। অর্থাৎ এই স্তরের পানি নলকুপের মাধ্যমে উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। আর এই স্তরে যে পানি পাওয়া যায় তা প্রচন্ড আয়রণ ও আর্সেনিক মিশ্রিত। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের এক জরিপে এ অঞ্চলের নলকূপের পানিতে ১.৫ থেকে ২ পি পি এম মাত্রায় আর্সেনিক পেয়েছে। [DCH-Report 2000]

ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল এ অঞ্চলের আর্সেনিক পরিস্থিতির উপরও গবেষণা চালিয়েছে এবং গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে প্রদত্ত অঞ্চলে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত অনেক রোগীও রয়েছে। প্রদত্ত গবেষণা জরিপে দেখা গেছে অত্র এলাকায় এই বিষে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছেই এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতি সংকটময়। এছাড়া শিবচরের প্রায় সবক'টি ইউনিয়নে আর্সেনিকের আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে উক্ত এলাকার জনস্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত যে সব রোগীদের অবস্থা বেশ ভয়ানক, তাদের ত্বক, নক, চুল, প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছে। তাতে অধিকাংশ রোগীর প্রসাবে, ৮.১২% রোগীর নখে, ২% রোগীর চুলে সর্বপরি ১০০% রোগীর ত্বকে আর্সেনিকের সন্ধান পেয়েছে। [কে. চৌধুর, ২০০০:১৫]

দেশের আর্সেনিক আক্রান্ত এসব এলাকা থেকে সংগৃহীত পানির নমুনায় দেখা গেছে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ আর্সেনিক রয়েছে পরীক্ষিত পানিতে। পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত লোকদের ২৮% ভাগের প্রস্রাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫০ শতাংশ বেশী আর্সেনিক রয়েছে, ৪৭% ভাগের নখে রয়েছে ৮ থেকে ২০ শতাংশ আর্সেনিক এবং ৯৮% ভাগের ত্বকে রয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫০০ শতাংশ বেশী আর্সেনিক। পানির নমুনায় প্রায় ৫০% নলকূপের পানিতে রয়েছে সহনীয় মাত্রার চেয়ে ১০০ থেকে ৯০০ শতাংশ বেশী আর্সেনিক। [কে. চৌধুরী, ২০০০:১৬]

আলোচ্য শিবচর থানাটি বেশ বড়, ১৮টি ইউনিয়ন রয়েছে এই থানায়। ১৮টি ইউনিয়নের অধিকাংশ নলকূপেই রয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিকের বিষ এবং উক্ত এলাকায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান ও মিলেছে প্রচুর। অপর পৃষ্ঠায় গবেষণা এলাকা শিবচরের আর্সেনিক দূষিত নলকূপ ও আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১.১ ঃ শিবচর থানার ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিক মুক্ত ও আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ

ইউনিয়নের নাম	মোট নলকূপ	কার্যকরী নলকূপ	অকার্যকরী নলকূপ	অগভীর নলকূপ	গভীর নলকূপ	আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ	আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ	আর্সেনিক দূষিত %
১. উমেদপুর	২৬০৮	২৫৯৫	১৩	২৫৬২	৪৬	৯২২	১৬৭৩	৬৪.৪৭
২. ভদ্রাসন	১১৩৪	১১২২	১২	১১১৫	১৯	৩৮৫	৭৩৭	৬৫.৬৯
৩. ভান্ডারী কান্দি	১০০৩	৯৮২	২১	৯৯৫	০৮	২৫৮	৭২৪	৭৩.৭৩
৪. বাঁশকান্দি	২০১৩	১৯৬১	৫২	১৯৯৩	২০	৬৫৩	১৩০৮	৬৬.৭০
৫. নিলখী	১১৭৮	১১৫১	২৭	১১৭৪	০৪	৪০৮	৭৪৩	৬৪.৫৫
৬. বহেরা তলা	২৪৪০	২৩৮৬	৫৪	২৩৭৯	৬১	৮১৯	১৫৬৭	৬৫.৬৭
৭. শিরওয়াইল	১৭৮৪	১৭২১	৬৩	১৭৪৮	৩৬	৭৪৮	৯৭৩	৫৬.৪৪
৮. দত্তপাড়া	২৫৮৩	২৫১৮	৬৫	২৫৬২	২১	১০৮	১৪২৯	৫৬.৭৫
৯. শিবচর পৌরসভা	১৮৭৮	১৮৭২	০৬	১১২২	৭৫৬	৮৩৬	১০৩৬	৫৫.৩৪
১০. দ্বিতীয়া খন্ড	১৩৩০	১৩০৮	২২	১৩২২	০৮	১০২৭	২৮১	২১.৪৮
১১. কুতুবপুর	১৮৫৫	১৮১২	৪৩	১৮৪৯	০৬	১৬৩৬	১৭৬	০৯.৭১
১২. কাদিরপুর	১৮০৬	১৭৬৫	৪১	১৭৮৬	২০	১৪৮৫	২৮০	১৫.৮৬
১৩. কাঁঠাল বাড়ি	১৬২৯	১৬০৭	২২	১৬২৫	০৪	১৫৩৪	৭৩	০৪.৫৪
১৪. বন্দরখোলা	১৮২৩	১৮১৬	০৭	১৮০৭	১৬	১১৪৫	৬৭১	৩৬.৯৫
১৫. চর জানাজাত	১০৮৩	১০৭৮	০৫	১০৮৩	০০	১০৫৫	২৩	০২.১৩
১৬. মাদবারের চর	২৫৫৮	২৫৩৫	২৩	২৫৪৪	১৪	১৭২১	৮১৪	৩২.১১
১৭. সন্ন্যাসীর চর	২৪৭৮	২৪৫৬	২২	২৪৬৮	১০	১২০৮	১১৪৮	৪৬.৭৪
১৮. পাঁচ্চর	২২৮২	২২২৭	৫৫	২২৪৬	৩৬	৯৬৬	১২৬১	৫৬.৬২
মোট	**৩৩৪৬৫**	**৩২৯১২**	**৫৫৩**	**৩২৩৮০**	**১০৮৫**	**১৬৯৫৯**	**১৫৯৫৩**	**৪৯.৪৩**

উৎস ঃ কে.হাসান, ২০০৩, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ১.২ ঃ ইউনিয়ন ভিত্তিক শিবচর থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ রোগী	মহিলা রোগী	মোট রোগী	শতকরা হার
১. উমেদপুর	২৭	১৪	৪১	১২.৮৯
২. ভদ্রাসন	০৬	০৪	১০	৩.১৪
৩. ভান্ডারী কান্দি	০৮	০৪	১২	৩.৭৭
৪. বাঁশকান্দি	১০	০৪	১৪	৪.৪০
৫. নিলখী	০২	০৪	০৬	১.৮৯
৬. বহেরাতলা	২৮	১৯	৪৭	১৪.৭৮
৭. শিরওয়াইল	০২	০৬	০৮	২.৫২
৮. দত্ত পাড়া	১৮	০৬	২৪	৭.৫৫
৯. শিবচর পৌরসভা	৭৫	২০	৯৫	২৯.৮৭
১০. দ্বিতীয়া খন্ড	১০	০৫	১৫	৪.৭২
১১. কুতুবপুর	০	০২	০২	০.৬৩
১২. কাদিরপুর	৩	০১	০৪	১.২৬
১৩. কাঁঠাল বাড়ি	০৪	০১	০৫	১.৫৭
১৪. বন্দরখোলা	০৫	০২	০৭	২.২০
১৫. চর জানাজাত	০	০	০	০.০০
১৬. মাদবরের চর	০৪	০৩	০৭	২.২০
১৭. সন্ন্যাসীরচর	০৩	০৩	০৬	১.৮৯
১৮. পাঁচ্চর	০৪	০৯	১৩	৪.০৯
মোট	**২০৯**	**১০৯**	**৩১৮**	**১০০.০০**

উৎস ঃ ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

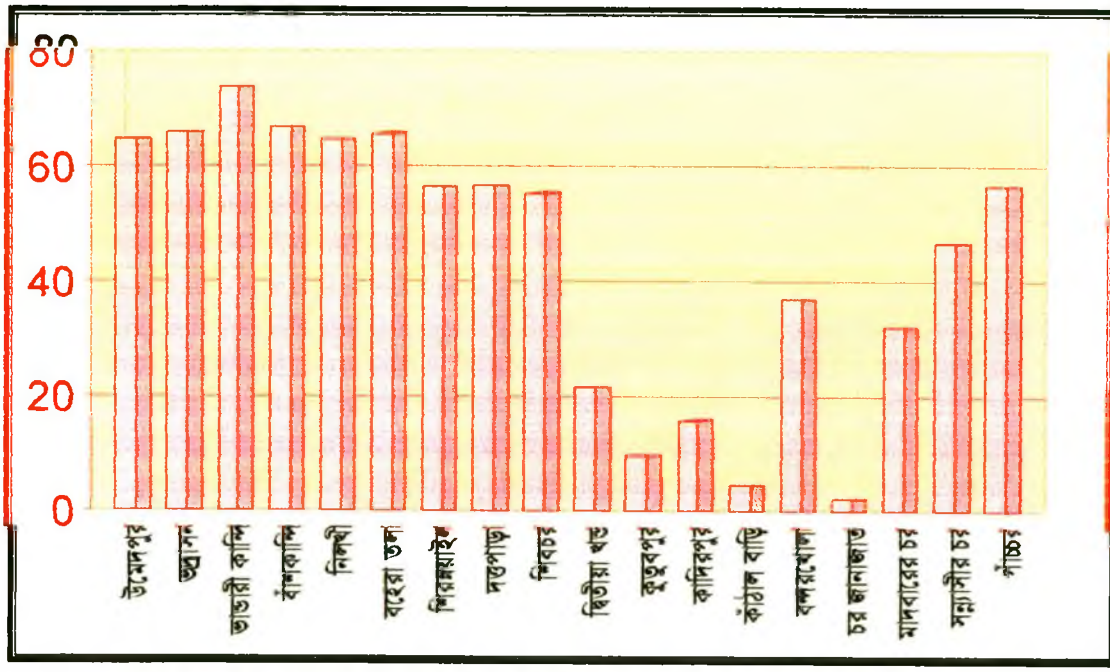

চিত্র ১৩ : শিবচর থানার ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ।

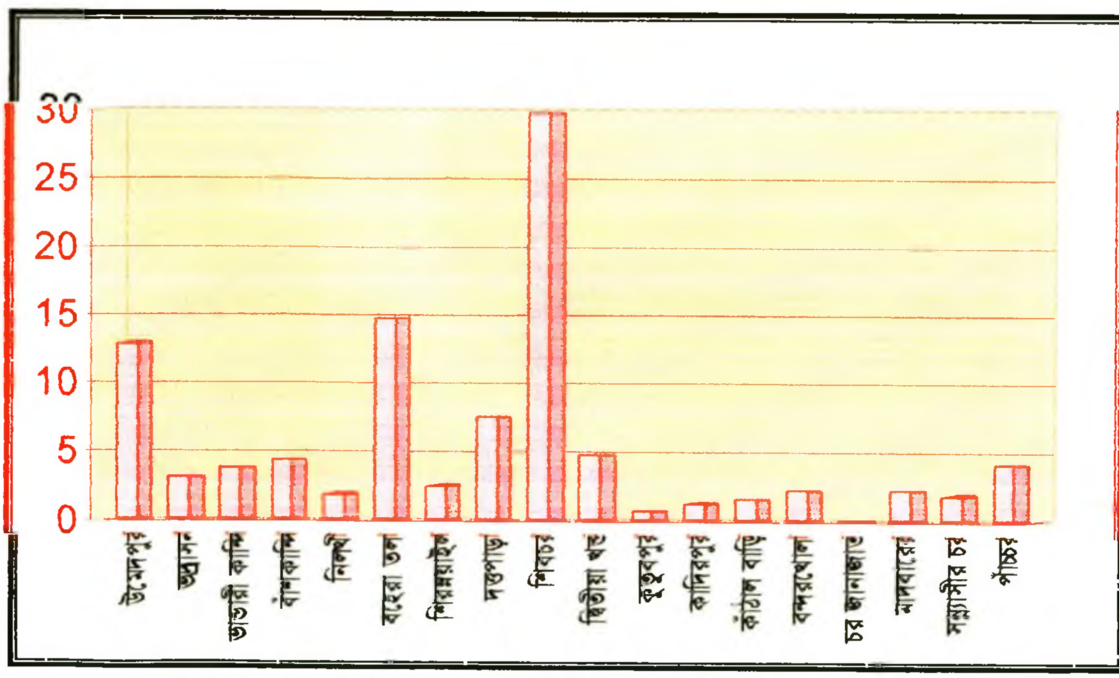

চিত্র ১.৪ : শিবচর থানার ইউনিয়ন ভিত্তিক আর্সেনিকোসিস রোগী।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল দুটিতে লক্ষ্যণীয় যে শিবচর থানার অধিকাংশ নলকূপের পানি আর্সেনিকে আক্রান্ত হলেও বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের নলকূপের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। এ সকল ইউনিয়নের প্রায় সবকটি টিউবয়েলের পানিই আর্সেনিক ১০০% দুষিত। অর্থাৎ অধিকাংশ গ্রামে ৮০% থেকে ৯০% টিউবয়েলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আছে।

সারণীতে আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী সনাক্ত করা হয়েছে শিবচর পৌরসভা এলাকায়। কিন্তু বেশী দূষণ যুক্ত নলকূপ পাওয়া গেছে ভান্ডারীকান্দি, বাশকান্দি ও উমেদপুর এলাকায়। এরূপ পরিস্থিতি হওয়ার মূলে অবশ্য কিছু কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন-পূর্বেই বলা হয়েছে এলাকাটি একটি নিম্নভূমি বন্যা প্লাবিত এলাকা হওয়ায় গ্রামে রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন তেমন একটা হয় নাই সেখানে নাগরিক সুযোগ সুবিধাও অনেক কম। ফলে অনেক স্বচ্ছল পরিবার আছে যারা একটু উন্নত জীবন-যাপন করতে চায় তারা শিবচর পৌর এলাকায় এসে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে। এজন্য শিবচর পৌর এলাকায় লোক বসতি অনেক বেশী। ফলে রোগীর সংখ্যা ও বেশী। কেননা অনেকে গ্রামে থাকাকালিন দীর্ঘ দিন আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করেছে এবং তখনই তারা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছে। অতএব তাদের গ্রামের নলকূপে আর্সেনিক ধরা পড়লেও বর্তমানে তারা বসবাস করেছে পৌরসভা এলাকায়। এভাবেই পৌরসভা এলাকায় রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে।

গবেষণা এলাকা শিবচরের আর্সেনিক পরিস্থিতি

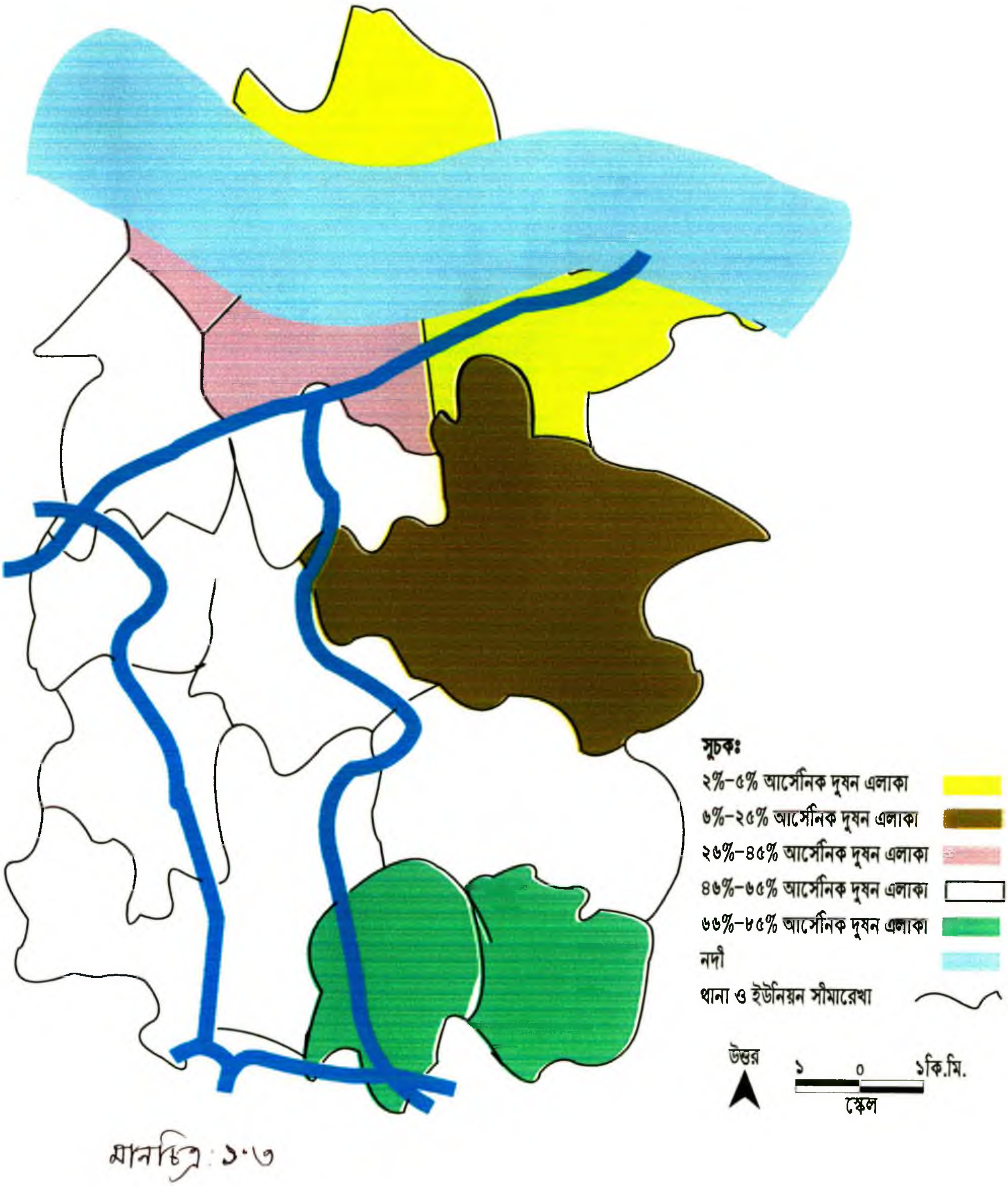

মানচিত্র : ১.৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. গবেষণা পদ্ধতি

মানুষ পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। তাই মানুষকে পরিবেশের বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, পরিবেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভিন্নতার সাথে খাপ খেয়ে চলতে হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতি ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে মানুষ। পরিবেশ ও স্থান ভেদে মানুষ যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা ছোট বা বড় যাই হোক না কেন প্রত্যেক জনগোষ্ঠী বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সেই সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বের করার প্রাণপন চেষ্টা করতে সচেষ্ট হয়। স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের নিমিত্তে ধারাবাহিক অনুসন্ধানকেই বলা হয় গবেষণা। গবেষণার বিষয় ও চিন্তাধারা অনুসারে সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাবার জন্য অনেকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যাকে গবেষণা পদ্ধতি বলা হয়। গবেষকগণ নিজেস্ব সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করতে পারে।

আমার গবেষণার বিষয় হলো **"মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক বিশ্লেষণ"**। যেহেতু এটি একটি গবেষণা সূত্রক কাজ সেহেতু একটি পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে এটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কোন গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং অন্যান্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আমার এই গবেষণা কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই সরাসরি প্রশ্নমালা জরিপ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

মানুষের জানার আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত করাই গবেষণার লক্ষ্য। কথাটি অন্যভাবে আর একটু বুঝিয়ে বলা যায়, আধুনিক সমাজে নানাবিধ আকাঙ্খা, অজানাকে জানার উদ্দেশ্যে কাজ করাই গবেষণার লক্ষ্য। তবে কাজ করার ক্ষত্রে কিছু ধারাবাহিক বিজ্ঞান ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি রয়েছে। তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্খিত প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করাই গবেষণার কাজ বা লক্ষ্য। তবে এর প্রধান লক্ষ্য হলো এমন কিছু লুকায়িত সত্যের আবিষ্কার করা যা এখন ও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই গবেষণার উদ্দেশ্য যদি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে গবেষণা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

ও এর কার্যধারা নির্ভুল হবে না। ফলে তা নির্দিষ্ট ধারায় কাঙ্খিত উদ্দেশ্য ও প্রকাশিত হবে না। সঙ্গতকারণেই **"মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূপরিবেশীক বিশ্লেষণ"** শিরোনামের আলোচ্য গবেষণা কর্মটি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ও সুষ্ঠু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পন্ন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও অন্যান্য উৎস হতে আমরা জেনে আসছি পানি, প্রাণী, মানুষ ও অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে আর্সেনিকের উপস্থিতি রয়েছে। এই আর্সেনিকের পরিমাণ মানুষের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত হলেই মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে আর্সেনিকোসিস নামক এক মরণ ব্যধিতে। খারাপ বা দূষিত পানি মাছ-মাংশ, বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও শাক-সবজির মাধ্যমে আর্সেনিক মানবদেহে প্রবেশ করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রাণী দেহের পুষ্টির জন্য এই আর্সেনিক একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যা না হলে মানব সহ সকল প্রাণী দেহের বর্ধন ও উর্বরতা ব্যাহত হত এবং মাতৃগর্ভে প্রাণের মৃত্যু ঘটত। আর্সেনিক নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকলে এটি স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে না। তবে মাত্রাতিরিক্ত হলেই তা মানুষের ত্বক, মূত্রথলি ফুসফুস, লিভার, কিডনির ক্যানসার ও পচন সৃষ্টি করে অবশেষে মৃত্যু ঘটায়। যেহেতু বিভিন্ন উপাদান হতে বিভিন্ন পন্থায় আর্সেনিক মানবদেহে প্রবেশ করে এবং আর্সেনিকোসিসে রূপান্তরিত হয়ে পরিণামে মৃত্যু ডেকে আনে। সেহেতু এই ভয়াবহ রোগের কারণ অনুসন্ধান করা আমার গবেষণার উদ্দেশ্য।

২। প্রকৃতি তার নিজেস্ব নিয়মে চলবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিকে বাঁধা প্রদানের ফলেই হোক আর ভূ-পরিবেশগত কারণেই হোক আমাদের দেশ আজ আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় প্রকৃতির এই অমম নিয়মের পাশাপাশি অবস্থান করে, কিভাবে মানুষ নিজেদেরকে রক্ষা করবে, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে? তার কিছু যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করার নিমিত্তেই আক্রান্ত রোগীদের উপর আমার গবেষণা।

৩। এ যাবৎকাল জেনে আসছি পানিই আর্সেনিকোসিস রোগের কারণ। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে একই পরিবারের একাধিক সদস্য একই পানি (আর্সেনিক দূষিত পানি) দীর্ঘদিন যাবৎ পান করার পর পরিবারের মাত্র একজন কি দুজন সদস্য আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যরা দিব্বি ভাল আছে অধিকন্তু আর্সেনিকোসিসের কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে নেই। সেক্ষেত্রে আমি অনুসন্ধান করতে চেয়েছি আর্সেনিকোসিস হওয়ার সহায়ক আরো একাধিক কারণ এবং আর্সেনিকোসিস প্রতিরোধের কিছু সুপারিশ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার গবেষণা।

Dhaka University Institutional Repository

৪। মানুষের আয়ের তারতম্যের কারণে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ও তারতম্য হয়। ফলে খাদ্য তথা পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রেও তারতম্য হয়। পুষ্টিগ্রহণের তারতম্যের জন্য মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বল, তাপ শক্তির তারতম্য হয়। সেক্ষেত্রে আর্সেনিকোসিস যেহেতু একটি রোগ, কাজেই খাদ্য বা ক্যালরী গ্রহণের সাথে এই রোগ হবার বা না হবার সম্পর্ক কতটুকু ? তা আমার গবেষণায় অনুসন্ধানের চেষ্টা করা।

৫। মানুষের স্বাস্থ্যের সুস্থতা বয়স কাঠামোর ফ্রেমে অনেকটা আবদ্ধ। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থাৎ ২৫ পার হওয়ার পর পরই আমাদের দেশে মানুষের বিভিন্ন ধরণের রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হবার প্রবণতা দেখা যায়। আর বার্ধক্য হলেতো কথাই নেই। এ সময় দুনিয়ার যত প্রকার রোগ আছে সবই একবার করে দশদিক হতে আক্রমণ করার চেষ্টা করে এবং করেও ফেলে। অনুরূপ আর্সেনিকোসিস রোগটি মানুষের বয়সের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত ? তা জানাও আমার গবেষণার অন্তর্ভূক্ত।

৬। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা তার স্বভাব। আর সমাজের দায়িত্ব কর্তব্য ও সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মেলা-মেশার স্বীকৃতি কে না চায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মানুষের কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে সমাজ না বুঝে তাদের প্রতি মুখ ফেরায়। কাজেই ঘাতক ব্যাধি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা ভূ-পরিবেশীক অবস্থার পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও মানসিক সহাবস্থান কেমন? তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাও আমার গবেষণার একটি উদ্দেশ্য।

৭। আমি আমার গবেষণায় আরো আলোকপাত করতে চেয়েছি, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজের সাথে কতটুকু তাল মিলিয়ে চলতে পারছে ? আদৌ পারছে কিনা ? সমাজই বা তাদেরকে কিভাবে গ্রহণ করছে? আদৌ গ্রহণ করছে কিনা ? এবং করলে কতটুকু করছে ? আর না করলে কি পরামর্শের মাধ্যমে গ্রহণ করানো যায় ? সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া আমার গবেষণার উদ্দেশ্য।

৮। 'বনের বাঘে খায় না; কিন্তু মনের বাঘে খায়।' গ্রাম বাংলার এই প্রবাদটি কতটা সত্য তা বিশ্লেষণের জন্য আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। তবে আমার ব্যক্তি জীবনে কথাটি ১০০% সত্য। কেননা বাহ্যিক যন্ত্রণা, আঘাতের চেয়ে মনের যন্ত্রণা ও আঘাত অনেক

Dhaka University Institutional Repository

বেশী ক্ষতি সাধন করে। আমাদের সমাজে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা মানসিক দিক থেকে কেমন আছে এবং কেমন থাকা দরকার? ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই আমার গবেষণা।

৩. তথ্য সূত্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূ-পরিবেশগত ভাবেই হোক আর পরিবেশে বাঁধা সৃষ্টির কারণেই হোক অথবা পরিবেশের অপব্যাবহারের ফলেই হোক বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আজ একটি ঘাতক বিষ যার নাম আর্সেনিক অতিরিক্ত মাত্রায় পাওয়া গেছে। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলার প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলার ৪১ লক্ষ নলকূপের পানি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৬০% নলকূপের পানিতে আর্সেনিক ভয়াবহ মাত্রায় রয়েছে। ঢাকার কমিউনিটি হাসপাতাল ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের সহযোগিতায় সম্প্রতি একটি জরিপ চালিয়ে দেখেছে যে দেশের ৬৪টি জেলায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ আর্সেনিকে হুমকির মধ্যে রয়েছে এবং প্রায় আড়াই কোটি মানুষ আর্সেনিকোসিস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এমনই আর্সেনিকের বিষে বিষাম্বিত একটি জনপদের নাম শিবচর উপজেলা। এই উপজেলার আঠারটি ইউনিয়নের ৩১৬২৯ টি ক্রিয়াশীল নলকূপের মধ্যে ১৫১৭০ টিতে আর্সেনিকের বিষ মাত্রাতিরিক্ত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে শিবচর পৌরসভাসহ বাঁশকান্দি, নিলখী, ভান্ডারীকান্দি, ভদ্রাসন, উমেদপুর, বহেরাতলা, শিরওয়াইল, দত্তপাড়া, পাঁচ্চর ইউনিয়নে গড়ে ৬৫% নলকূপের পানিতে অসহনীয় মাত্রায় আর্সেনিক ধরা পরেছে। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ইউনিসেফের সহযোগিতায় বাংলাদেশ 'গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা' নামক এন.জি.ও এর মাধ্যমে উক্ত উপজেলায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চালায়। এই অনুসন্ধানে বেড়িয়ে আসে আরো ভয়াবহ চিত্র তা হলো আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিসংখ্যান। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের সার্ভে মতে এই উপজেলায় প্রাথমিকভাবে মোট ২৮৩ জন রোগীর সন্ধান মেলে। তারা উক্ত রোগীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে এবং রোগীদের কিছু পরামর্শ ও ভিটামিন জাতীয় ট্যাবলেট বিতরণ করে। আমি আমার গবেষণার উদ্দেশ্যে উক্ত রোগীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করি এবং মাঠ পর্যায়ে তাদের নিকট হতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে প্রশ্নমালা জরিপ করি। এই জরিপ কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে আরো কিছু অতিরিক্ত রোগীর সন্ধান পাই মেলে যাদের অনেকের অবস্থা ভয়াবহ। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ফেরৎ দু-চারটি রোগীও পেয়েছি যাদের অবস্থা গ্যাংগ্রীণ ও ক্যান্সার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এখন তাদের মৃত্যু প্রহর গোনা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পরিবেশগত কোন একক সমস্যায় এত লোক একটি জনপদে আক্রান্ত হবার

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা সত্যি বিরল। এরূপ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি শিবচরকে আমার গবেষণা এলাকা নির্বাচন করি।

৪. তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

যে কোন গবষণা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং অন্যান্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আমার এই গবেসণা কার্যটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই সরাসরি প্রশ্নমালা জরিপ দ্বারা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যের জন্য মূলত আর্সেনিক নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ করেছে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন- ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, যাদবপুর বিঃ কলিকাতা আই সি ডি ডি আর বি, ঢাকা ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার, বিভিন্ন এনজিও যেমন গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাংলাদেশ, UPOSHON Bangladesh As Victim Rehabilitation Trust বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (FEJB) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের খাদ্যাভাস ও ক্যালোরী সংক্রান্ত তথ্যের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কিছু তথ্য ও আর্টিকেল সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত শিক্ষক তথা ডাক্তারদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও তাদের লেখা কিছু বই পুস্তক ও আর্টিকেল হতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছে।

প্রথমত প্রশ্নপত্র দ্বারা জরিপের মাধ্যমে কাজটি শুরু করি। এই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে আমার জরিপ কার্য সম্পাদনের সময়কাল ছিল ২০০৪-০৫ সাল। এক্ষেত্রে আমার গবেষণার সুপারভাইজার স্যার অধ্যাপক ড. রেজওয়ান হোসেন ভূইয়ার তত্ত্বাবধানে ও সার্বিক সহযোগিতায় কাজটি শুরু ও শেষ করেছি। আমার এই গবেষণাটি অনেকটা নমুনা ভিত্তিক। যেহেতু গোটা দেশ আজ আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসে জর্জরিত। সেহেতু আমার পক্ষে গোটা দেশের সকল রোগীর তথ্য সংগত করা সম্ভব হয়নি। তাই জরিপের ক্ষেত্রে নমুনায়নের মাধ্যমে মডেল হিসেবে শুধু শিবচর থানাটিকে নেওয়া হয়েছে। যে সব ঠিকানা নিয়ে আমি আমার গবেষণার ব্যবহারিক উপাদান আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীদের কাছে গিয়েছি এবং দৈচয়ন নমুনায়নের মাধ্যমে জরিপ কার্য তথা প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করেছি। মোট ৩১৮ টি

Dhaka University Institutional Repository

রোগীর ঠিকানার মধ্যে ৩০০ টি ঠিকানাকে কম্পিউটারে কোড করে SPSS প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করেছি।

৫. মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে

আর্সেনিকোসিস রোগের লক্ষণ যদিও নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে তবুও আমার গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে কিছু ধাপ ও সুস্পষ্ট কিছু চিহ্ন বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন-

- রোগীর ইতিহাস কমপক্ষে ৬ মাস বা তারও অধিক সময় ধরে রোগী আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে কিনা? তার ইতিহাস জানার চেষ্টা করেছি।
- ডাক্তারী পরীক্ষা আর্সেনিকোসিসের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য রোগীকে সূর্যের সরাসরি আলোয় না রেখে পরোক্ষ বা প্রতিফলিত আলোয়রেখে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- চাক্ষুষ পরীক্ষা রোগীর মেলানোসিস (শরীরে কালো ফোঁটা ফোঁটা দাগ) আছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য, সূর্যের আলো পড়ে না এমন জায়গায় রেখে রোগীর বুক, পিঠ, পেটও হাত-পায়ের তালু ভালভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে।
- **রোগীর লিউকো মেলানোসিসের** উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শরীরের সামনের ও পিছনের অংশ এবং দুই উরু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- রোগীর কেরাটোসিস বা হাইপার কেরাটোসিস এর লক্ষণ বোঝার জন্য রোগীর হাত ও পায়ের তালু শক্ত, খসখসে ও গুটি গুটি হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। যদি গুটি গুটি আচিলের মত লক্ষণ না পাওয়া যায় তাহলে হাত বুলিয়ে হাত ও পায়ের তালুর মাঝখানে বা প্রাপ্ত ভাগে খসখসে ভাব ও অসামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্সেনিকোসিসের লক্ষণসমূহ সাধারণত বুক-পিঠ ব্যতীত শরীরের ডান ও বাম উভয় পাশে থাকে। সেগুলোও ভালভাবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. তথ্য বিশ্লেষণ

এই গবেষণায় প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর সেগুলোকে বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক, ভূ-পরিবেশিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহকে Univariate এবং

Dhaka University Institutional Repository

Bivariate Table আকারে সাজানো হয়েছে। পরবর্তীতে এই Table গুলিকে বিভিন্ন মানচিত্রাংকণ কৌশলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কম্পিউটারের SPSS Software যার মাধ্যমে আমি গোটা প্রশ্নমালার প্রায় সকল তথ্যেরই percent distribution দেখাতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া অধিক প্রয়োজনীয় আরো কিছু তথ্যের ক্রোস টেবিল বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে Chi-square test.

শুধু তাই নয়, এই গবেষণার গুণগতমান বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাঠ পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে। আমার বিশ্বাস উপরোক্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি সমূহ এবং এছাড়া আর্সেনিকোসিস বিষয়ে লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও বই-পুস্তক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে। সর্বপরি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার প্রাপ্ত তথ্য গবেষণাটিকে অধিকতর সুদৃঢ় করেছে।

৭. গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম এই দেশে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দূর্যোগের পাশাপাশি বর্তমানে আরও একটি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা দিয়েছে। তাহলো বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে বিপদজনক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি। তাই এটিকে বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। এদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬১ জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক থাকায় দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী মানুষ আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শুধু তাই নয় দেশের প্রায় প্রতি হাজারে ১৬৬.৭ জন লোক উপযুপরি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছে। তাই এই ভয়াবহ অভিসাপ হতে মুক্তি পেতে বা মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের কি করণীয়, সে সংক্রান্ত কিছু সমাধান খুজে বের করার জন্য এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সমাজের সাথে এ দেশের আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কিভাবে সহ অবস্থান করছে তা জানার জন্য এবং কিভাবে আরো ভালভাবে থাকা যায়, তার জন্য কি করণীয় ইত্যাদি বিষয় উৎঘাটন করার জন্য গবেষণায় আমার এই আত্ম-নিবেদন।

আমার গবেষণা এলাকা মাদারীপুর জেলার শিবচর থানা। এই থানাটিকে আমার গবেষণার নমুনায়ন করার পেছনে কিছু যুক্তি ও কারণ রয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশের দক্ষিণ বঙ্গের একটি জেলা মাদারীপুর। এই জেলারই অন্তঃর্গত একটি থানা শিবচর। এই থানায় মোট লোক সংখ্যা হচ্ছে ৩০৬০৮২ জন এবং পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৫৮,০৮৫ টি। এই থানায় মোট অগভীর নলকূপের সংখ্যা ৩০২৭৬ টি। অর্থাৎ ৫৩% পরিবারে নিজেস্ব টিউবয়েল আছে। ২০০২ সালের ইউনিসেফ এর সহযোগীতায় 'বাংলাদেশ গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা' এই থানার প্রত্যেকটি টিউবয়েলের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে এবং দেখতে প্রায় ৬৫% টিউবয়েলের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আছে। এর মধ্যে কয়েকটি ইউনিয়নের অবস্থা খুবই শোচনীয় সেখানে ৭৫% টিউবয়েলে অগ্রহণীয় মাত্রায় আর্সেনিক আছে। ইউনিসেফের সহযোগীতায় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের অপর এক জরিপে এই থানার আর্সেনিকোসিস রোগী আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়। এই জরিপে অনেক রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে বেশ কিছু রোগীর অবস্থা আশঙ্খাজনক। এই রোগে দু/চার জন রোগী সনাক্ত করণের পরে মারাও গিয়েছে। এই থানায় প্রায় ৩১৮ জন আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে এবং এই রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ৫ বছরে রোগীর সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। উক্ত পরিস্থিতিতে এই থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও অবস্থানগত বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য উক্ত এলাকাটিকে নির্ধারণ করি।

৮. অধ্যায় পরিকল্পনা

পরিকল্পনা হলো যে কোন বিষয়ের পূর্ব প্রস্তুতি ও প্রস্তুতির ধারাবাহিকতা। আলোচ্য গবেষণা পত্রটি তৈরি করার ক্ষেত্রে জরিপকৃত এলাকা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে, সংগৃহীত উপাত্তকে উপযুক্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মানচিত্র, গ্রাফ ও অন্যান্য তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই গবেষণা প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য সমূহ সফলভাবে সিদ্ধ করার প্রয়াসে এর ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে প্রতিবেদনটিকে ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা পত্রটির উপর একটি সূচনা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে, জরিপকৃত এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে আলোচনা, পরিবেশের সাথে আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক ও গবেষণা এলাকাসহ বাংলাদেশ ও গোটা বিশ্বের আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের অবস্থা আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, গবেষণা পদ্ধতির সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়, যেমন গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং গবেষণার যৌক্তিকতা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, গবেষণা এলাকাটির উপর একটি সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে গবেষণা এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক ভূ-পরিবেশীক বিষয় ও আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, গবেষণার বিষয় ভিত্তিক ব্যাপার আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্সেনিক এবং এদের বিষক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায়, গবেষণার কেন্দ্র বিন্দু আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, আর্সেনিকোসিস রোগ সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং এর তীব্রতার মাত্রা, উপসর্গ, লক্ষণ, পর্যায় ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোকচিত্র সংযোজন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়, গবেষণার সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় রোগীদের খাদ্যাভাস এবং গ্রহণীয় কিলোক্যালোরীসহ অন্যান্য পুষ্টি সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তাদের বসতবাটি সহ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ও আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আরো কিছু বারতি আলোচনা হয়েছে রোগীদের পানীয় জলের ব্যবহার ও পানীয় জলের সচেতনতা পয়ঃনিষ্কাশন, সেনিটেশান ও সচেতনতা এবং সার্বিক স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর।

নবম অধ্যায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ।

দশম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানকল্পে কতিপয় সুপারিশমালা।

একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, গবেষণার সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত বক্তব্য ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী। সবশেষে পরিশিষ্টতে সংযুক্ত করা হয়েছে কিছু দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

৯. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হবার পর থেকে সে তার মা-বাবা ও অন্যান্যদের লালন-পালনে বেড়ে ওঠে। এক সময়ে সে থাকে পরিবার কেন্দ্রীক তারপর পরিবারের গন্ডি পেড়িয়ে সে চলে আসে সংঘবদ্ধ সমাজে, এমনিভাবে, গ্রাম, জেলা, অঞ্চল, দেশ সব কিছুই তার সংঘবদ্ধ সমাজের মধ্যে চলে আসে। মানুষ এই সংঘবদ্ধ সমাজে অবস্থান করলে ও তার সকল প্রয়োজন মেটানো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মানুষকে নির্ভর করতে হয় সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের উপর। অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির, বা জাতির জীবন চলার পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে যায়, অনুরূপ, মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

❑ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূ-পরিবেশিক বিশ্লেষণ ও তার গবেষণা বহুমুখী সীমাবদ্ধতা বিরাজমান। কেননা ভূ-পরিবেশ হলো প্রাকৃতিক। তাই এক্ষেত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন দয়া ও উদারতার উপর মানুষকে নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতি কখন ও থাকে শান্ত কখন বা অশান্ত। প্রকৃতি মানব পরিবেশের অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই মানব পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাছাড়া এরূপ গবেষণা অনেক সময়-সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। কাজেই প্রকৃতির উপর নির্ভরতা, পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, উপযুক্ত গবেষণাগার ও সাপোর্টিং বিভিন্ন উপাদান না থাকায় এই গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

❑ তুলনামূলক ভাল গবেষণার জন্য উন্নত দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যে সমস্ত উন্নত সুবিধাদী ভোগ করে থাকে। আলোচ্য গবেষণায় সে সমস্ত অত্যাধুনিক সুবিধাদী ও তথ্য উপেক্ষিত। আরো পরিতাপের বিষয় হলো এই গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার কিছু কমতি রয়েছে।

❑ যে কোন গবেষণা বর্ধিতভাবে করার জন্য আনুভূমিক ও উলম্ব উভয় প্রকার তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই গবেষণার তথ্য কেবল একটি এলাকা কেন্দ্রিক মাত্র ৩০০টি রোগীর নমুনা নিয়ে জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। কাজেই এই সমীক্ষায় প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌছা সম্ভব হয় নি। তথাপি মোটামুটি ভাবে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক অবস্থা জানতে সক্ষম হয়েছি।

❑ যেহেতু এই গবেষণা কেবলমাত্র একটি থানা ভিত্তিক এবং একটি থানার রোগীদের সম্পর্কে উক্ত বিষয়গুলো মোটামুটি ভাবে জানতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের দেশের অন্যান্য অনেক শহর ও

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ জনপদ রয়ে গেছে যেখানে অনেক আর্সেনিকোসিস রোগীও রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ আমার হয় নি। এক্ষেত্রে ও গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

- এটি একটি ব্যাপক গবেষণার বিষয়। উক্ত বিষয়ের উপর যে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে তাতে আরো অনেক বিষয় অধিক সংখ্যক প্রশ্ন সংযোজন করা যেত। ফলে আরো বেশী তথ্য উৎঘাটিত হতো। তাই সময় ও ব্যাপকতার সীমাবদ্ধতা এখানে রয়েছে।

- এই গবেসণার উপাত্ত গুলো দিয়ে যে সকল টেবিল তৈরী করা হয়েছে। তা থেকে আরো বেশী ক্রস টেবিল তৈরী করা যেত এবং বিভিন্ন প্রকার পরিসংখ্যানিক টেষ্ট করে তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা যেত। কিন্তু সময় ও অর্থের স্বল্পতায় এখানেও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

- এই গবেষণা কার্যটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য মাঠ পর্যায়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে এলাকাটি দূর্গম ও নিম্ন জলাভূমি এলাকা হওয়ায় রোগীদের বাড়ী বার বার গিয়ে পরিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ত সম্ভব হয়নি।

- এই গবেষণার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে তার তথ্য গ্রহণ ও প্রদান বেশ সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া বেশীর ভাগ রোগীই অশিক্ষিত ও অসচেতন। তাদেরকে বুঝিয়ে সঠিক তথ্য উৎঘাটনের জন্য যে চেষ্টা চালানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে রোগীরা কিছুটা বিরক্ত বোধও করেছে। অর্থাৎ আস্থা ও সহযোগীতার ক্ষেত্রে কিছু কমতি ছিল বিধায় এখানেও কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে।

- যে কোন সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে, মানসিক অনেক বিষয় থাকে যা প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে অনুমান নির্ভর লেখা গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা উক্ত গবেষণার আলোচিত আর্সেনিকোসিস রোগীরা পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন নয়।

- সর্বপরি এই গবেষণা প্রতিবেদনটি কম্পিউটারে কম্পোজ করার ক্ষেত্রে কিছু অসাবধানতা ও দীর্ঘ সময় নিয়ে বার বার (Proved) ভুল সংশোধন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে কম্পোজ জনিত, ভাষাগত ও শব্দগত কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে।

পরিশেষে আমি আশা করবো ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যারা আরো গবেষণা করবে তারা অবশ্যই গবেষণার পরিসর বৃদ্ধি করে, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করে উক্ত সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করতে সচেষ্ট হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

১.গবেষণার এলাকা পরিচিতি

সমুদ্র হতে উঠে আসা এক কালের দ্বীপময় ভূমি অজকের বাংলাদেশ। দেশের উত্তর পশ্চিম পাহাড়ী ভূমি ছাড়া অধিকাংশ ভূমিই নদীবাহিত পলল দ্বারা গড়া। তাই বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। দেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সুমাই গাড়ো পাহাড় গুলি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষা, কর্ণফুলি প্রভৃতি নদনদী এবং এদের অসংখ্যা শাখা প্রশাখা দেশের উত্তর পূর্ব হতে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর মুখী ধাবিত হয়েছে। ভূমির স্বাভাবিক ঢাল উত্তর হতে দক্ষিণে একটু নীচু বলে এরূপ হয়েছে। এই ঢালেরই দক্ষিণে অবস্থিত একটি জেলা মাদারীপুর। দেশের অর্থনীতি, জনসংখ্যা, যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই জেলারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপজেলা শিবচর। ১৮টি ইউনিয়ন ৪৬৭ টি গ্রাম ১০৮ মৌজা নিয়ে গঠিত এই উপজেলার প্রায় ৩,০৬,০৮২ জন লোকের বাস [B.P.S, 1994:2122]। এই উপজেলার প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, ময়নাকাটা বিল ও রয়েছে এই উপজেলায় বেশকটি তার মধ্যে মির্জার চর বিল, হাসমদি বিল, বড় কেশবপুর বিল উল্লেখযোগ্য ১৯৩০ সালে, শিবচর থানা প্রতিষ্ঠিত হলেও একে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৩ সালে। ঐতিহাসিক বৃটিশ বিরোধী ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়তউল্লাহ, ধর্ম সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া, শিক্ষাবিদ আব্দুর রহমান খান, প্রখ্যাত স্থপতি ফজলুর রহমান খান মোতাহার হোসেন চৌধুরী, খন্দকার আনোয়ারুল হক মেঘদুত এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শামসুল হুদা চৌধুরী, আবুল খায়ের চৌধুরী, বাদশা মিয়া, ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জন্ম গ্রহণ করেছেন এই উপজেলায়। এলাকাটি অন্যতম কৃষি প্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রবেশ ঘটাতে শহরের ছোঁয়াও এখানে রয়েছে। তবে আলো আধারের খেলার মত পৌর সভার বাইরে প্রচুর অশিক্ষিত ও অভাবী লোকও আছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ঐতিহাসিক পটভূমি

কথা কও, কথা কও

অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও ?

....

বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও।

ভাষা দাও তারে হে মনি অতীত, কথা কও কথা কও।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমার গবেষণা এলাকা মাদারীপুর জেলার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ থানা শিবচরের কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তবে প্রত্যেক এলাকা বা অঞ্চলের কিছু ইতিহাস ঐতিহ্য থাকে যা আমাদের জানা দরকার এবং হৃদয়ে লালন করা উচিত। কিন্তু সেই ইতিহাস লেখা না হলে কালের টানে স্মৃতির অতল গহিনে হারিয়ে যায়। তাই শিবচর সম্পর্কে সামান্য কিছু লোক গাথা, স্মৃতিপট এবং সম-সাময়িক কিছু তথ্য সংগ্রহ করে তা লেখার সামান্যতম প্রচেষ্টা চালাচ্ছি মাত্র।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের আগে মাদারীপুর তথা শিবচরের ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা, তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর কিছু ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ধ্বাংশবিশেষ বিদ্যমান। [আ. জ. মিয়া,১৯৯৪: ০৬] এ অঞ্চল এক সময় পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ নদী গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

প্রথম মতঃ কথিত আছে বর্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণে ভাঙ্গা থানার চান্দ্রা নামক স্থান হতে পূর্ব দক্ষিণের সমস্ত এলাকাই পদ্মা নদীতে বিলীন ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন এ অঞ্চলে ভূমি গঠন কাজ শুরু হয়। তখন চান্দ্রার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে পদ্মার বুকে একটা বিশাল চর জেগে ওঠে। কালক্রমে এই চরে আশপাশের অঞ্চল থেকে কিছু লোক এসে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের প্রয়োজনে সেখানে শুরু হয় বেচা-কেনা। এভাবে এই চরে কালক্রমে গঠিত হয় একটি হাট। এই হাটে নৌকা যোগে মাধ্যমে আসা-যাওয়া ছিল খুবই সুবিধা তাই এক সময় এটি একটি বড় হাটে পরিণত হয় এবং কালক্রমে সেটি গঞ্জে রূপান্তরিত হয়। এক পর্যায়ে এই হাট ফরিদপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পাট বেচাকেনার হাটে পরিণত হয়। তখন বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের অনেক অঞ্চল হতেই বড় বড় শিপ (Ship) বা জাহাজ নিয়ে পাট ক্রয়ের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মহাজনদের আগমন ঘটত। বড় বড় শীপের আগমন ঘটার কারণেই নাকি এ অঞ্চলের নাম করণ করা হয়েছে 'শিপের চর' হিসেবে। আর শিপের চর হতেই আজকের শিবচর নামকরণ হয়েছে। তবে এই মতের সাথে অনেকেরই রয়েছে দ্বিমত।

দ্বিতীয় মতঃ অনেকের মতে পদ্মার এই চরে প্রথম বসতি স্থাপন করতে আসে শিব রায় ও রামরায় ভাতৃদ্বয়। এক সময় অত্র এলাকার প্রায় সমগ্রটাই দখল করে নিয়েছিল এবং একক আধিপত্তও বিস্তার করেছিল এই ভাতৃদ্বয়। এভাবে শিব রায় ও রাম রায় অত্র এলাকার জমিদারীত্ব লাভ করেন। তাদের তালুকেই আশে-পাশের লোকজন কাজ করতে থাকে। এক সময় তারা দুই ভাইয়ের নামে পাশাপাশি দুটি চরের নামকরণও করেন। মূল চরের নাম দেয় বড় ভাইয়ের নামানুসারে শিব রামের চর এবং অন্য চরের নাম দেয় ছোট ভাইয়ের নামানুসারে রাম রায়ের চর। কালেরটানে শিব রায়ের চর নামটি পরিবর্তিত হয়ে শিবচর হয়েছে এবং রাম রায়ের চর পরিবর্তিত হয়ে রাম রায়ের কান্দি হয়েছে। এই দুই ভাইয়ের জমিদারিত্বের ধ্বংশাবশেষ অত্র এলাকায় এখনও বিদ্যমান আছে।

তৃতীয় মতঃ তবে আরো একটি নির্ভরযোগ্য মতবাদ হলো এই অঞ্চলে শিব সরকার নামে একজন ধর্ম যাজক বাস করত। অত্র এলাকায় সে স্রষ্টাভক্ত একনিষ্ট পুজারী হিসেবে খুবই পরিচিত ছিল। এক সময় তার নামানুসারেই এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছিল শিব সরকারের চর এবং তা থেকে শিবচর।

প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আগমন ও বিকাশের আগে হিন্দু ধর্মই ছিল প্রধান। এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় মতাবাদটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হিন্দুদের আধিপত্যই এই চরে প্রথম হতে শুরু হয়েছিল। পরবর্তিতে এই চরে অন্যান্য ধর্মের লোকজন এ চরে বসবাস শুরু করে।

ইসলাম ধর্ম প্রচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ অঞ্চলে পীর-দরবেশ ও আউলিয়াদেরও আগমন ঘটেছে এবং সমসাময়িক কালে এ এলাকায় আরো দু-চার জন হিন্দু জমিদারের ও আগমন ঘটেছে। এরা এ অঞ্চলে অত্যাচার ও শোষণের পাশাপাশি অনেক জনহিতকর কাজ ও করেছেন। তার মধ্যে রাজা রাম রায় বাজিতপুর যে রাম মন্দির স্থাপন করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। অবশ্য

পরবর্তীতে বেশ কয়েকজন মুসলমান জমিদারেরও আগমন ঘটেছে। তার মধ্যে জমিদার আইনদ্দিন হাওলাদার (উৎরাইল), জমিদার চৌধুরী শামসুদ্দিন আহম্মেদ (দত্তপাড়া) জমিদার চৌধুরী জৈনউদ্দিন আহমদ (মাদবরের চর) এবং জমিদার চৌধুরী আব্দুর রব (গোপালপুর) অন্যতম।

এই অঞ্চলের আদিবাসী কারা, কোথা থেকে তাদের আগমন ঘটেছিল এবং কোথায় চলে গেছে তা বলা কঠিন। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এ অঞ্চলের মুসলমান বনেদী পরিবারগুলো বহিরাগত। সৈয়দ, খন্দকার, চৌধুরী, খান, হাওলাদার, তালুকদার, মাদবর, সরদার, বেপারী, গোমস্তা এদের অন্তর্ভূক্ত। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ, সাহা, কায়স্ত, মালো ইত্যাদি হিন্দু সম্প্রদান এখানে ছিল এখনও আছে। তবে নিম্নবর্ণের হিন্দু নমশূদ্রদের সংখ্যা এ অঞ্চলে অনেক বেশী এবং জলাভূমি ও নিচু বিল অঞ্চলে এদের বসবাস। সম্ভবতঃ উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অত্যাচার ও শোষণের কারণে এরা এই নিচু বিল অঞ্চলকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, এ উপজেলার নদীর তীর বা চরাঞ্চলে মুসলমানদের আবাস ; যদিও সেখানে নদীর ভাঙ্গা গড়ার খেলা বিদ্যমান।

অপর পৃষ্ঠায় মাদারীপুর জেলা ও গবেষণা এলাকা শিবচরের অবস্থান মানচিত্র দেখানো হল

Dhaka University Institutional Repository

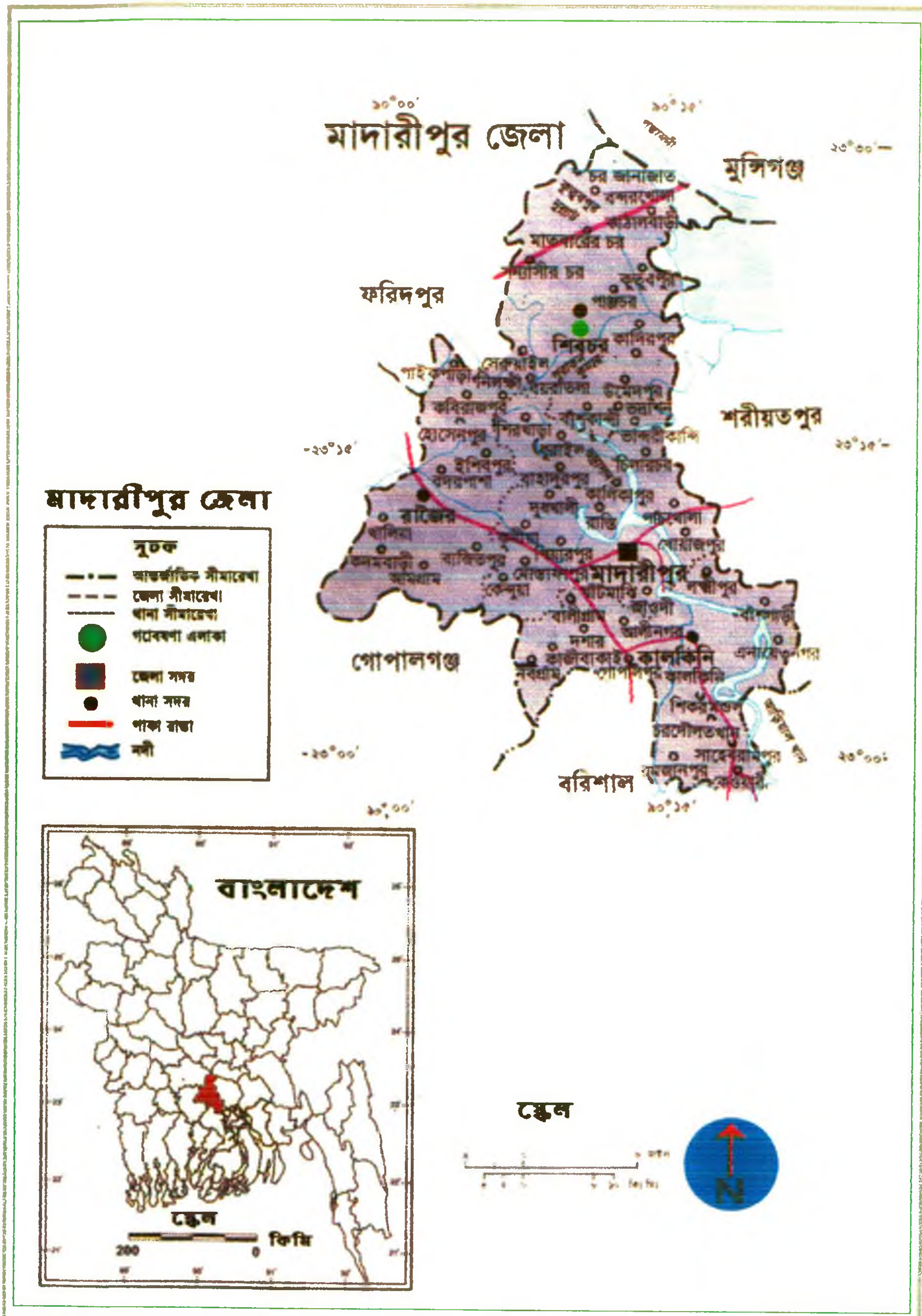

মানচিত্র ঃ ৩.১

Dhaka University Institutional Repository

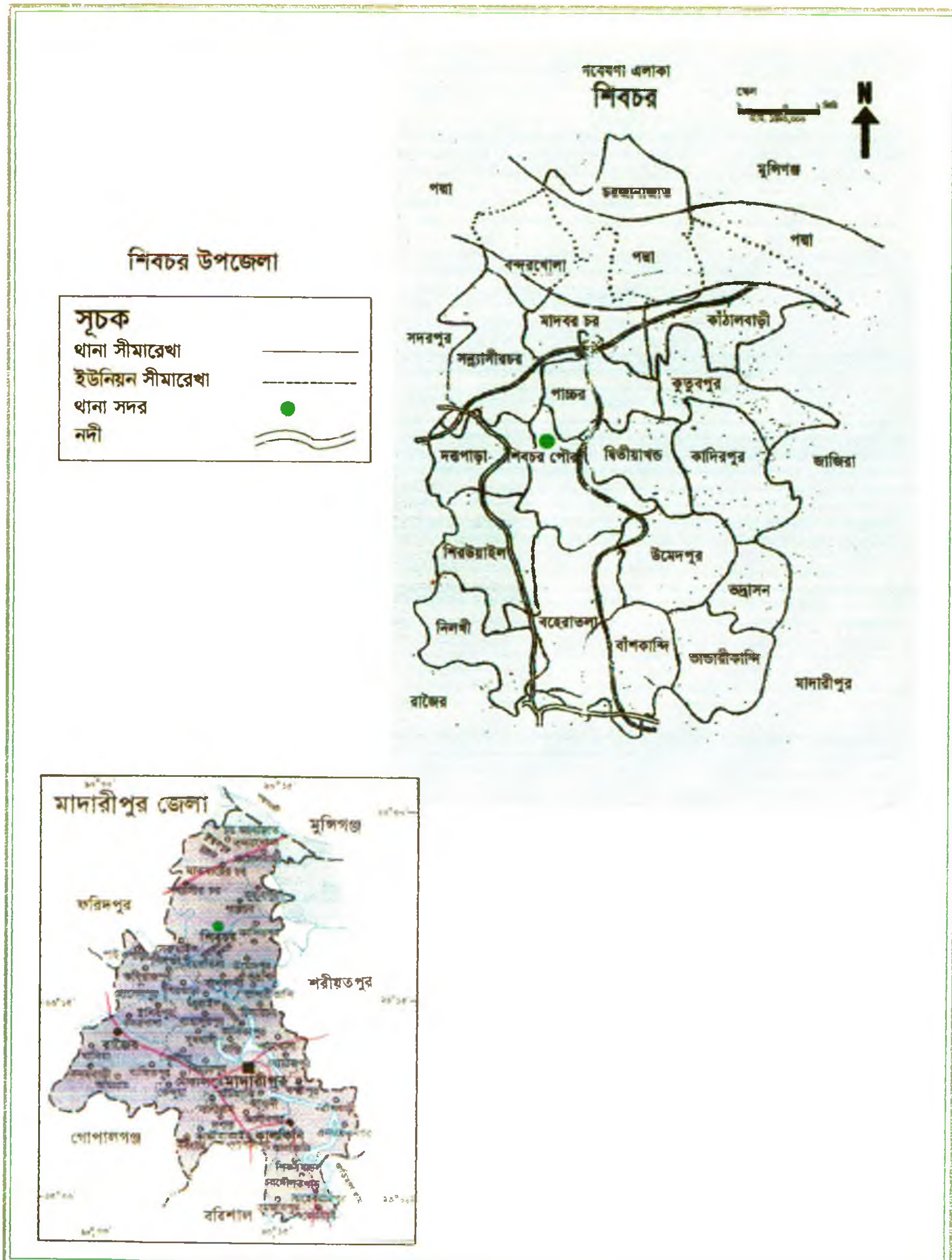

মানচিত্র ৩.২

Dhaka University Institutional Repository

৩. ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

৩.১.অবস্থান ও আয়তন ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাদারীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য একটি উপজেলা শিবচর। এটি ২৩°১৫′ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৩°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°০৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০°১৭′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শিবচর উপজেলার উত্তরে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং, শ্রীনগর থানা এবং ফরিদপুরের সদরপুর থানা অবস্থিত, দক্ষিণে মাদারীপুর সদর ও রাজৈর উপজেলা, পূর্বে শরিয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলা এবং পশ্চিমে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা অবস্থিত।

মাদারীপুর জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা শিবচর। নদী অঞ্চলসহ এ উপজেলার মোট আয়তন ৩২১.৮৮ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে নদীর আয়তন ৪৩.৭২ বর্গ কিলোমিটার।

৩.২.ভূ-প্রকৃতি ঃ ভূ-প্রকৃতি যে কোন দেশ তথা অঞ্চলের একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোন অঞ্চলের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর এই ভূ-প্রকৃতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশ্বের অন্যতম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। তদ্রূপ দেশের মধ্য-দক্ষিণ পদ্মার কোল ঘেযে অবস্থিত শিবচরের ভূ-প্রকৃতি ঐ অঞ্চলের কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য পরিবহন, যোগাযোগ এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

শিবচর এলাকা বাংলাদেশের ব-দ্বীপ সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বসবাস ও কৃষি কাজের জন্য এক আদর্শ নিম্ন সমভূমি। এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে পদ্মা, আরিয়াল খাঁ, ময়না কাটা প্রভৃতি নদী। এসব নদীর রয়েছে কিছু ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা, বর্ষা মৌসুমে এ অঞ্চল প্লাবিত হয়। ফলে নদী বিধৌত পলি মাটি দ্বারা এ অঞ্চল গঠিত। প্রত্যেক বছর পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ভূমিরূপ ভূ-গঠনে এ নদীগুলির ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে শিবচরের সমভূমি অত্যন্ত উর্বর। নদীর নিম্নগতির কারণে নদীগুলো প্রচন্ড আঁকা-বাঁকা এবং নদীর পার্শ্ব ক্ষয়ের কারণে ভাঙ্গা-গড়ার কাজ ও অত্যান্ত স্পষ্ট। এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি হ্রদ, নতুন নতুন চর, সর্পিল নদী বাক পলল পাখা, পলল কোন ছোট ছোট ব-দ্বীপ প্রভৃতি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এ অঞ্চলের মাটি সাধারণত বেলে দোয়াশ। তবে নদী সিকস্তি ও চরাঞ্চলে বেলে মাটির আধিক্য অত্যান্ত বেশী। এ অঞ্চলের আবাসযোগ্য ও চাষযোগ্য ভূ-গঠন খুব প্রাচীন নয়। সম্ভবত এক হাজার বছর ধরে এই ভূ-গঠন কাজ চলে আসছে। ভূ-গঠনের প্রকৃতি দেখে মনে হয় পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের তুলনায় পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভূ-ভাগ বেশী প্রাচীন। এর মধ্যে রয়েছে, উমেদ পুরের চান্দের চর, শেখপুর বাঁশকান্দি, দত্তপাড়া, পাচচর ও পৌর সভার অধিকাংশ এলাকা।

Dhaka University Institutional Repository

এই এলাকাগুলোতে আর্সেনিকের প্রবণতা ও খুব বেশী এবং আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যাও কম নয়। শিবচরের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও একেবারে পূর্বাঞ্চলের ভূ-ভাগ পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ এবং ময়নাকাটা ও এদের শাখা প্রশাখা দ্বারা ব্যাপক ভাঙ্গা-গড়ার কারণে একাধিক বার পূনঃগঠিত হয়েছে এখনও হচ্ছে। বস্তুতঃ এই নদীগুলোর লালনে পালনে গড়ে ওঠা এই থানার প্রাকৃতিক চিত্র মনোরম লিলায় লীলায়িত, ভাঙ্গা-গড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিকশিত এক বিস্ময়কর ঐতিহ্যের স্মারক। ভূ-প্রকৃতি নিয়ত ভাঙ্গা-গড়ায় এ থানার জনজীবণে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এখানকার মানুষ কখন ও সিংহ-শার্দুল-সংগ্রামী এবং কখনও শান্ত-সাম্য-সংযমী। কঠরতা আর কোমলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণে পল্লবিত এখানকার গণমানুষ।

৩.৩.গবেষণার এলাকার জলবায়ুঃ জলবায়ু বলতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট সময়ের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিশিরাংক, আর্দ্রতা, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির সম্বলিত বেশ কয়েক বছরের গড় আবহাওয়াকে বুঝায়। জলবায়ু দ্বারা বৃষ্টিপাত তাপমাত্রা ও প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো উদ্ভিদ ও ফসলের ধরণ নির্ধারণ করে। তাই ঋতু ভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফসল জন্মায়।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এই থানা ও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড় ঋতুর মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি মৌসুম জোড়ালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। তা হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত মৌসুম। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম ও প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুব উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুব কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষাসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে আমরা কাল বৈশাখী বলি। এ সময় কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টিপাত এ সময়ে হয়ে থাকে। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বর মাসে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারী মাসে। এ মৌসুম অত্যান্ত শুষ্ক ও শীতল। কখনও কখনও এই মৌসুমে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। শিবচরসহ সমগ্র বাংলাদেশীদের মধ্যে পিঠা-পায়েস ইত্যাদি খাওয়ার ধুম পরে এই মৌসুমে।

ক).তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ঃ তাপমাত্রার উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এ সময় গড় তাপমাত্রা থাকে ১৯°সে.। আবার বৃষ্টিপাতের উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ অঞ্চলে শীত কালে গড় বৃষ্টিপাত ৬৮ মি. মি. দীর্ঘমেয়াদী পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, এ থানায় বৎসরে শীত মৌসুমে ৪/৫ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে। বর্ষা মৌসুমে কোন কোন মাসে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫ মি.মি. এর কম বলে এ মাস গুলোকে শুষ্ক মাস বলে গণ্য করা হয়। নিম্নে এই থানার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা দেখানো হয়।

i) তাপমাত্রাঃ এই এলাকায় প্রতিবছর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখানকার মাসিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯° সে.

ii) বৃষ্টিপাতঃ এ অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শীতকালে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৮ মি. মি. যা ঐ সময়ের বাষ্পীভবনের চেয়ে অনেক কম। বৎসরের শীত মৌসুমে ৪/৫ মাস শুষ্ক থাকে। বর্ষা মৌসুমে কোন কোন সময় মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫ মি. মি. বলে এ মাসগুলোকে শুষ্ক মাস বলে। এ থানার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫.১৮ মি. মি.।

৩.৪. গবেষণা এলাকার মৃত্তিকা

গবেষণা এলাকা শিবচর মূলত নদীর গতির নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত। ফলে এটি নদী বিধৌত পললভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকার মাটিই পলিযুক্ত বেলে দোয়াশ মাটি।

ক) মৃত্তিকার বুনন ঃ পানি, বায়ু, শিলাচূর্ণ এবং খনিজ পদার্থের জটিল সংমিশ্রণে মৃত্তিকা গঠিত হয়। শিলা ও খনিজের অবস্থানের ভিত্তিতে মৃত্তিকার বুনন ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমার সমীক্ষা এলাকা শিবচরে সাধারণত চার ধরণের মৃত্তিকার বুনন পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া হলো।

খ) বেলে মাটি ঃ সাধারণত যে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী অর্থাৎ ৮০% বালি থাকে তাকে বেলে মাটি বলে। জরিপকৃত এলাকার মোট ভূ-ভাগের ১২.৫% এলাকা এই বেলে মাটি দ্বারা গঠিত। সাধারণত নদী গঠিত চর এলাকায় এই মাটি বেশী দেখা যায়। এই মাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। তাই এই মাটিতে ভাল ফসল হয় না। তবে চর এলাকায় এই বেলে মাটিতে বাদামের চাষ বেশ হয়ে থাকে।

গ) বেলে দোঁয়াশ ঃ যে মাটিতে বালি ও মাটির পরিমাণ প্রায় সমান তবে বালির পরিমাণ একটু বেশী থাকে তাকে বেলে দোঁয়াশ মাটি বলে। স্থানীয় ভাষায় এই মাটিকে পান্তা মাটি বলা হয়। শিবচরে এই মাটির প্রাধান্যই বেশী। সাধারণত নদী বিধৌত চর ও অন্যান্য নিম্নভূমি এলাকায় এই মাটির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শিবচরের মোট এলাকার ৬০.৪৭% এলাকার মাটি বেলে দোঁয়াশ। এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা মোটা-মুটি ভাল। শিবচরে বর্তমানে এই মৃত্তিকা এলাকায় পিয়াজ, ধান, পাট ও অন্যান্য রবিশস্যের চাষ করা হয়।

ঘ) দোঁ-আশ ঃ যে মাটিতে বালি ও মাটির পরিমাণ সমান থাকে তাকে দোঁয়াশ মাটি বলে। এই মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা বেশ ভাল। সাধারণত বসতি সংলগ্ন এলাকায় এই ধরনের মাটি

Dhaka University Institutional Repository

বেশী দেখা যায়। শিবচরের বাড়ি সংলগ্ন দোঁয়াশ মৃত্তিকা এলাকায় বেশী পানের বরজ ও বাঁশ চাষ দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজী ও এই মাটিতে বেশী চাষ হয়ে থাকে।

ঙ) কাদা দোঁয়াশ ঃ যে মাটিতে কাঁদা বা এটেল মাটির পরিমাণ বেশী থাকে তাকে কাঁদা দোঁয়াশ মৃত্তিকা বলে। এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশী। অর্থাৎ জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল না। এই মাটির বুনন খুবই মিহি। তাই বেশী সময় পানি ধরে রাখতে পারে। সাধারণত বিল এলাকায় এই মাটি বেশী দেখা যায়। শিবচরে এই ধরণের মৃত্তিকা এলাকা খুবই কম। কারণ শিবচরে তেমন কোন বিল নেই বললেই চলে। মাত্র ৭.০৩% এলাকায় মাটি কাদা দোয়াশ বা এটেল মাটি। এই মাটি বেশী ধানের চাষ করা হয়। বছরের বেশীর ভাগ সময় এই মাটিতে পানি জমে থাকে। তাই অন্যান্য ফসল হয় না।

৩.৫.গবেষণা এলাকার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা

জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা বলতে ভূমি বা মাটি হতে কত দ্রুত জল সরে যায় তাকে বোঝায় এই জল নিষ্কাশন মূলত নির্ভর করে। মৃত্তিকার বুনন, ভূমির ঢাল, মৃত্তিকার সংযুক্তি, ভূ-ভাগের উপর দিয়ে পানি সরবরাহের পরিমাণ ইত্যাদির উপর। আমার গবেষণা এলাকায় সাধারণত তিন ধরণের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা-

ক। সুষম বা ভাল জল নিষ্কাশন।

খ। মোটামুটি ভাল জল নিষ্কাশন।

গ। স্বল্প জল নিষ্কাশন।

ক। **সুষম বা ভাল জল নিষ্কাশন ঃ** যে সমস্ত এলাকায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত পানি সরে যায়, তাকে সুষম জল নিষ্কাশন বলে। শিবচরে সাধারণত বাড়ি সংলগ্ন দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ এবং বেলে মাটি এলাকায় এরূপ জল নিষ্কাশন হয়ে থাকে।

খ। **মোটামুটি ভাল জল নিষ্কাশন ঃ** যে সব ভূমিতে পানি দ্রুত অপসারিত হয় না আবার জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি হয় না এরূপ ভূমিতে মধ্যম জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখা যায়। সাধারণত কাদা দোঁয়াশ এবং ভূমির ঢাল যেখানে তুলনামূলক কম সেখানে এরূপ জল নিষ্কাশন দেখা যায়।

গ। **স্বল্প জল নিষ্কাশন ঃ** যে সকল ভূমি হতে পানি সহজে অপসারিত হয় না তা স্বল্প জল নিষ্কাশনের আওতাভুক্ত। সাধারণ কাঁদা যুক্ত এটেল মাটিতে এরূপ জল নিষ্কাশন হয়ে থাকে। শিবচরে এরূপ এলাকা খুবই কম থাকায় বার মাস জলাবদ্ধতা ও কম। সাধারণত এরূপ এলাকাতে আমন ধানের চাষ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬.গবেষণা এলাকার কৃষি

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কোন এলাকায় কৃষির বৈশিষ্ট্য বলতে সেই এলাকার জনগণ কর্তৃক কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সার, বীজ, কীটনাশক দৈহিক শ্রম, পশুপালন, ফসল উৎপাদন, সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, শস্য নির্বাচন, ভূমি আবর্তন, শস্যের উপযোগীতা প্রভৃতিকে বুঝায়। আমার সমীক্ষা এলাকা শিবচরের কৃষির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

ক) কৃষি জমি ঃ সমীক্ষা এলাকার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ২৩,৯৬৩ হেক্টর উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ৩,১৭,৮০০ জন। অথচ এই উপজেলায় কৃষি পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৫৭,২৩৬ টি সে অনুসারে পরিবার প্রতি মাথাপিছু জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৪২ হেক্টর প্রায়। ভূমিহীন কৃষি পরিবার রয়েছে ৬৬৩৪ টি প্রান্তিক কৃষি পরিবার ৩৩,৭৫৪ টি, ক্ষুদ্র কৃষি পরিবার ৯৯৩৩ টি, মাঝারী কৃষি পরিবার ৫৯০৮ টি এবং বড় কৃষি পরিবার রয়েছে মাত্র ১০০৭ টি। সমীক্ষা এলাকায় বেশীর ভাগ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী মাঝারী ও ক্ষুদ্র কৃষি পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া এই থানায় রয়েছে কিছু N.G.O ভিত্তিক কৃষি পরিবার।

খ) কৃষি যন্ত্রপাতি ঃ কৃষি যন্ত্রপাতি বলতে আমরা যে সমস্ত বিষয়াদী ব্যবহার করে কৃষি ফসল ফলানো হয় তাকে বুঝে থাকি। শিবচরের ফসল ফলানোর প্রধান উপকরণ হলো, পাওয়ার টিলার। হাল লাঙ্গল এই থানায় নেই বললেই চলে। সেচ ব্যবস্থায় সেলো টিউবওয়েল প্রধান। এছাড়া পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য স্থানীয় সেচ ব্যবস্থার প্রচল লক্ষণীয়।

গ) উৎপাদিত ফসল ঃ আমার গবেষণা এলাকার প্রধান ফসল ধান। এর মধ্যে ইরি ও আমন ধান সবচেয়ে ভাল জন্মে। পাট এ অঞ্চলের আর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। এছাড়া গম, পেয়াজ, রশুন, ধনিয়া বিভিন্ন প্রকার ডাটা শাক, সশা, পেপে, কচু সরিষা প্রভৃতি উৎপাদিত হয়।

ঘ) ফসল পদ্ধতি ঃ জরিপ এলাকার কৃষি জমিগুলো বেশীর ভাগই দুই ফসলি। এছাড়া এক ফসলী দুই-এর অধিক ও মিশ্র ফসলী কৃষি জমি ও এখানে লক্ষ্যণীয়। প্রায় ৬৫% জমি দুই ফসলী, একফসলী জমির পরিমাণ ২৪% তিন ফসলী জমি ৭% এবং বাকী ৪% জমি মিশ্র ও অন্যান্য চাষাবাদের আওতাভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৩.১ ঃ শিবচর থানার ক্রপিং প্যাটার্ন নিম্নরূপ।

ক)	বোরো	—	পতিত	—	পতিত	এক ফসলী
খ)	বোরো (স্থানীয়)	—	পতিত	—	পতিত	
গ)	পাট	—	পতিত	—	পতিত	
ক)	উফসী বোরো	—	পতিত	—	খেসারী	দুই ফসলী
খ)	সরিষা	—	পাট	—	পতিত	
গ)	পিয়াজ	—	পাট	—	পতিত	
ঘ)	গম	—	পাট	—	পতিত	
ঙ)	ধনিয়া	—	পাট	—	পতিত	
চ)	খেসারী	—	পাট	—	পতিত	
ছ)	বোরো (উফসী)	—	পতিত	—	মাসকালাই	
ক)	খেসারী	—	আমন	—	বোনা আমন	তিন ফসলী
খ)	পাট	—	পেয়াজ	—	শাক	

উৎস ঃ কৃষি জরিপ, ২০০৬ঃ শিবচর কৃষি অফিস।

ঙ).ফসল চাষ পদ্ধতি ঃ আমার গবেষণা এলাকায় যে সকল ফসল উৎপাদিত হয় তার মধ্যে বোরো ধান, পাট, খেসারী, কালাই ছাড়া অন্যান্য সকল ফসলই সেচের মাধ্যমে চাষ করা হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু পাট বোনার সময় সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

সেচের মাধ্যমে যে সকল ফসল ফলানো হয় তার মধ্যে খাদ্য জাতীয় ফসল বেশী, যেমন- বিভিন্ন ধরনের ইরি, ধান, শাক সবজী, পেয়াজ-রশুন, টমেটো, আলু ইত্যাদি। তবে এর অধিকাংশ সেচ ব্যবস্থায় পাওয়ার পাম্প ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে নদী, পুকুর বা খালের পানি পাম্পের সাহায্যে ব্যবহার করে সেচ কার্য চালানো হয়। আর ইরি ধান ফলানোর ক্ষেত্রে বেশীর ভাগই অগভীর সেলো মেশিনের সাহায্যে সেচ দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রেও কিছু কিছু পাওয়ার পাম্প ব্যবহার করা হয়। সেচের সাহায্যে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে হস্তচালিত সেচ ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। এর মধ্যে দোন উল্লেখযোগ্য।

ফসলের ভাল ফলন পাওয়ার জন্য অনেকেই জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে জৈব সারের ব্যবহার তেমন একটা নেই। বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গের হাত হতে ফসল রক্ষা করার জন্য অনেকেই বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন কীট নাশক ব্যবহার করে।

৩.৭.গবেষণা এলাকার বনভূমি / উদ্দিজ্জ

গবেষণা এলাকা শিবচরে তেমন কোন বনভূমি নাই যার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকারী বা বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে কোন বনভূমি গড়ে ওঠেনি। তবে অনেকেই ব্যক্তি মালিকানায় এক বা দুই একর করে জমিতে বিভিন্ন প্রকার গাছের বাগান সাজিয়েছে। এসব বাগানে রয়েছে মেহগনি, কড়াই, চাম্বল, ইউক্যালিপটাস আম-কাঠাল পেয়ারা ও অন্যান্য ফল ও কাঠের গাছ। অনেকেই আবার বাঁশের বাগান ও গড়ে তুলেছে। এরূপ বাঁশ বাগানে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বাঁশ বাগানের আর এক জনের জমি থাকায় সেও বাঁশ বাগান করেছে। এরূপ পাশাপাশি অনেক ব্যক্তির অনেকগুলি বাঁশ বাগান লক্ষ্য করা যায়। যার মোট আয়তন ৫ থেকে ১০ একরেরও অধিক হবে। এছাড়া প্রত্যেক বসতি ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন রকম গাছ-গাছালী যা উপর হতে দেখতে অনেকটা বনের মতই। আরও রয়েছে রাস্তা ও নদীর ধারে হরেক রকম গাছ সম্বলিত বনের সমাহার। বসত বাড়ি ঘিরে যে সমস্ত গাছ-পালা দেখা যায় তার মধ্যে আম, কাঠাল, পেয়ারা, পেঁপে, জলপাই, কলা ইত্যাদি প্রধান। আর রাস্তার পাশে যে সমস্ত গাছ-পালা দেখা যায় তার মধ্যে বেশী হলো কাঠের গাঠ যেমন- রেইন ট্রি, কড়াই, শিল কড়াই, মেহগনি ইত্যাদি। এছাড়া রাস্তার পাশে অনেক বাঁশ ঝারও দেখা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সাধারণ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ এই নদী বিধৌত শিবচর।

৩.৮.গবেষণা এলাকার নদনদী / নদী ব্যবস্থা

নদী মাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। বলা চলে নদীগুলোই এ দেশের প্রাণ কেননা এই নদীগুলোই পলি দ্বারা এ দেশের মাটিকে করেছে উর্বর। তাই ফুলে, ফলে ও সবুজে ভরা সুশোভিত এই দেশ। বাংলাদেশ ভাটির দেশ নামেও পরিচিত। আর ভাটির দেশের ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত মাদারীপুর জেলার একটি থানার নাম শিবচর। পদ্মা নদীর বৃদ্ধ গতিতে অবস্থিত শিবচর থানাটি। নদীর শেষ গাতির ফলে ভাঙ্গা-গড়ার খেলাও এখানে বেশী হয়। অর্থাৎ ভূমির ক্ষয় ও গঠন কাজ এখানে অনবরত চলছে। শিবচরের বুক চিরে বয়ে গেছে পদ্মা নদী এবং এর কয়েকটি শাখা নদী। এই থানার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে আড়িয়াল খাঁ ও এর বেশ কয়েকটি শাখা নদী এবং থানা সদরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মার অন্যতম আর একটি শাখা নদী যার নাম ময়না কাটা। আর উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা নিজেই। চর্তুদিকে নদী দ্বারা বেষ্টিত এই থানাটিতে বর্ষা আসলে পানির অঞ্জলী দেয়। প্রতি বছরই প্লাবিত হয় এই থানার অধিকাংশ স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন বছর বন্যা কবলিতও হয়। এই অঞ্চলের মানুষ বন্যার প্লাবণকে ভয় পায় না। কেননা প্রত্যেক বছরই বাড়ীতে বা ঘরের উঠানে বন্যার পানি ওঠা যেন স্বাভাবিক ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

৪. গবেষণা এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা

শিবচর উপজেলা বাংলাদেশের দক্ষিণে মাদারীপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত সর্ববৃহৎ উপজেলা। এটি পদ্মার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীর এই অবস্থানে যমুনার মিলিত স্রোত, পানি প্রবাহকে আরো প্রসারিত করেছে। তবে নদীর নিম্ন গতির ফলে নদী বুকে অসংখ্য চর সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মা নদীর প্রায় মাঝখানে সৃষ্ট এমনই একটি চরের নাম 'চর জানাজাত' এবং এটি শিবচর থানারই অন্তর্ভূক্ত। এরূপ অনেকগুলি নতুন ও পুরাতন চর রয়েছে এই উপজেলায়। পদ্মা নদীর একটি অন্যতম শাখা নদী হলো আড়িয়াল খাঁ। এই নদীটিও প্রবাহিত হয়েছে শিবচর উপজেলার পশ্চিম ও পূর্ব দিক দিয়ে। এটি নদীর নিম্ন গতির শাখা নদী হওয়ায় এই নদীতে অসংখ্য বাঁক ও বাঁকের চর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নদী ভাঙ্গনের তান্ডব এই উপজেলায় ক্রিয়াশীল। এই উপজেলার ভূ-ত্বকের উপরিভাগ নদী প্লাবি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। তবে বিল এলাকায় যথেষ্ট কাদামাটি ও বিদ্যমান। আর পদ্মা পারের চরগুলো বেশীর ভাগই বালি এবং বালিযুক্ত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই উপজেলায় এখনও ভূমি গঠন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। মূলতঃ শিবচরের বেশীর ভাগ ভূমিই সক্রিয় সমভূমির অন্তঃর্গত। এই সক্রিয় সমভূমি পর্যায়ক্রমে উঁচু ভূমির সাথে সমান ভাবে উন্নীত হয়েছে।

শিবচর উপজেলার অবস্থান ও মৃত্তিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইহা মধ্য হলোসিন যুগে সৃষ্টি হওয়া চান্দিনা পলল ভূমির অন্তর্গত। যে চান্দিনা পলল ভূমির অবস্থান উত্তরে, পদ্মা ও দক্ষিণে মেঘনা নদী ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত। এই চান্দিনা পলল ভূমির গঠন হলদে-বাদামী আংশিক অক্সিজেন যুক্ত অথবা ধুসর বালুকাময় এবং কাদা মিশ্রিত মাটি দ্বারা। অর্থাৎ এই পলল ভূমি নদী গঠিত পলল ভূমির চেয়েও বেশী সুদৃঢ়। তবে ইহার উপরিভাগ পলল গঠিত ক্রিয়াশীল সমভূমির সাথে ধারাবাহিকভাবে সম উন্নতিতে মিশে গিয়েছে। এই পলল ভূমির গঠন ক্রিয়া মধ্য হলসীন যুগে বন্ধ হয়েছে বলে যে ধারণা করা হয়। তা শিবচর উপজেলার অধিকাংশ এলাকার ভূরূপ গঠনের সাথে সম্পৃক্ত। চান্দিনা পলল ভূমি দুটি ভাজে বিভক্ত, যথা- উপরের ভাজ ও নিম্ন ভাজ। নদী তরঙ্গে গঠিত ভূমির উপরের ভাজে দেখা যায় যে প্রায় ৩ মিটার পর্যন্ত কাদাযুক্ত পলিমাটি এবং নিম্নভাজে ৩০ মিটার পর্যন্ত ধুসর অভ্রপূর্ণ বালু মিশ্রিত যার তলদেশের সাথে আংশিক বা পাতলা কয়লার আবরণ রয়েছে। আরও জানা যায় যে এর নিম্নভাগে কালো অভ্রপূর্ণ বালু এবং ভূগর্ভস্থ পানি কিছুটা

লুনা। এই ভাগের নীচে পুনরায় বালুকা পূর্ণ স্তর রয়েছে যার জন্ম বা গঠন সময় আমাদের কাছে অজানা।

শিবচর উপজেলার উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে পদ্মা নদীর অবস্থান। এ দিকেই কিছু ব-দ্বীপ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ একটি ব-দ্বীপ 'চর জানাজাত' ইউনিয়ন এটি পদ্মার মাঝখানে অবস্থিত এবং এর চার দিকই পানি দ্বারা বেষ্টিত। এই অঞ্চলের উপরের অংশ হলুদ বাদামী এবং অভ্রযুক্ত বালুকা ও কাদা বিদ্যমান। আনভূমিক ভাবে কোথাও কোথাও শুধু বালি এবং কাদা পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলের ভূ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় এখানেও পর্যায়ক্রমিক তিনটি স্তর রয়েছে। উপরের স্তর, যার গভীরতা ৮০ মিটারের মত। দ্বিতীয় স্তর- যার গভীরতা ১০০ থেকে ১৩০ মিটার এবং শেষ স্ত র বা নিচের স্তর যার গভীরতা কম পক্ষে ২৫০ মিটার পর্যন্ত। তবে কোথাও কোথাও এই গভীরতা ৩৫০ মিটার পর্যন্তও রয়েছে। (DPHE / BGS / MMI, 1999) তবে এই স্তরগুলো বালু এবং কাদার স্তর দ্বারা আলাদা। এর নিচের স্তরটিকে ধারণা করা হয়েছে ডুপি টোলা ফরমেশান বলে। কিন্তু এর পরিসংখ্যানিক গ্রাফে তেমন ভাল কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি। এর উপরি ভাগের দুটি অংশ ঃ যেমন ক্রিয়াশীল পলিময় সমভূমি এবং চান্দিনা ফরমেশনের মধ্যে ভূ-তাত্ত্বিক গঠনে তেমন কোন পার্থক্য ও সম্পর্ক বোঝা যায় না।

৫. গবেষণা এলাকার জনসংখ্যা

আমার গবেষণা এলাকা নদী বিধৌত শিবচর, বাংলাদেশের দক্ষিণ বঙ্গে অবস্থিত মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত। শিবচর থানার মোট আয়তন ৩২১.৯৯ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে নদী এলাকা রয়েছে ৪৩.৭২ বর্গ কিলোমিটার। নদী মাতৃক শিবচর থানাটি ১৮টি ইউনিয়ন, ১০৮টি মৌজা এবং ৫২৫ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এটি মাদারীপুর জেলার অন্যতম জনবহুল থানা। এই থানার মোট জনসংখ্যা ৩,১৭,৮০০ জন। এর মধ্যে পুরুষ রয়েছে ১,৬০,৩৬০ জন এবং মহিলা রয়েছে ১,৫৭,৪৪০ জন। অর্থাৎ থানার নারী পুরুষ অনুপাত হল ১০০ ঃ ১০১.৮৫ জন এর মধ্যে কর্মক্ষম অর্থাৎ ১৮ বছরের উপরে বয়স এমন জনসংখ্যার পরিমাণ ১,৬৬,৯৮০ জন। এবং শিক্ষার হার ৩১.৬০% ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা সেনসাসে দেখা যায় যে শিবচরের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩,০৬,৮৪৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১,৫৭,৫০২ জন এবং মহিলা ১,৪৮,৫৮০ জন। অর্থাৎ নারী পুরুষ অনুপাত ছিল ১০০ ঃ ১০৬ জন। ১৯৮১ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, মোট ২,৬৮,৯৪৯ জন সংখ্যার মধ্যে ১,৩৪,৮৭০ জন পুরুষ এবং ১,৩৪,০৭৯ জন মহিলা। এখানে নারী পুরুষ অনুপাত ১০০ ঃ ১০০.৫৯ জন। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী প্রায় সমান সমান। ১৯৯১ সারে নারী বৃদ্ধির হার প্রতি ১০ বছরে ৪.৯৫ জন এবং শতকরা বার্ষিক বৃদ্ধিতে হয় ০.৪৮ জন। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালে ১০ বছরে শিবচরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩.৮১% এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৩০%।

১৯৯১-২০০১ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১২.১৩% এবং বার্ষিক বৃদ্ধি ১.২১%। ১৯৯১ সালে শিবচরে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫১ জন। ১৯৮১ সালে ছিল ৮৩৬ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ বছরে ১৩.৭৬% এবং বার্ষিক বৃদ্ধি ১.৩০% জন ১৯৯১-২০০১ এবং ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৭৯% এবং বার্ষিক বৃদ্ধি ১.৩৬%। বর্তমান অর্থাৎ ২০০১ সালে শিবচরের জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৮৭ জন। গ্রামীণ এবং শহুরে জনসংখ্যার দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৯১ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যা ছিল ২,৯০,৮৪৩ জন এবং শহুরে জনসংখ্যা ছিল ১৫,২৩৯ জন। এই সংখ্যা ১৯৮১ তে ছিল গ্রামীণ ২,৬২,২৮৪ জন এবং শহুরে ৬,৬৬৫ জন। এক্ষেত্রে দেখা যায় শহুরে জনসংখ্যার ভির বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিকতার ছোয়া লাগানোর জন্যই শহুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১০ বছরের শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮,৫৭৪ জন যার শতকরা হার ১০ বছরে ১২৮.৬৪ এবং বার্ষিক বৃদ্ধি ৮.৬২%। [B.P.S, 1994: 21,44]

শিবচর থানার জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক শিক্ষা। চর এলাকা হওয়ার কারণে প্রতি বছর আড়িয়াল খা নদী ও পদ্মার ভাঙ্গনে অনেক ঘর বাড়ী নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। কৃষি কাজ ও তেমন একটা করা যায় না বন্যার পানির কারণে। তাই জীবন সংগ্রামী এ অঞ্চলের জনগণ সর্বস্ব বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে অনেক পূর্ব হতেই। সেই ধারা বাহিকতায় বর্তমানে অনেক লোক বিদেশ থাকে। বিশেষ করে পাকিস্তান, ইটালী, গ্রীস, স্পেন, জার্মান, মধ্য প্রাচ্যের সৌদি আরব, কুয়েত এছাড়া মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে শিবচরের প্রচুর লোক কর্মসংস্থান করে নিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই এখানে শিক্ষার হার তেমন ভাল না। উচ্চ শিক্ষিতের পরিমাণ খুবই কম। সাধারণত এস, এস,সি এবং এইচ, এস,সি পাস ছেলে মেয়ের সংখ্যা অধিক। এ অঞ্চলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা শুরু করে প্রায় অধিকাংশ জনগণই। কিন্তু ঝড়ে যায় বেশীর ভাগ। যাওবা থাকে তার মধ্যে এস,এস,সি এবং এইচ,এস,সি এর পর ঝড়ে যায়। এই থানায় ১৯৮১ সালে শিক্ষার হার ছিল ১৬.৬%। ১৯৯১ সালে হয়েছিল ২৬.৬% যা ২০০১ সালে হয়েছে ৩১.৬%। অর্থাৎ শিক্ষার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। থানায় অনেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা থাকায় শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য এই থানায় মোট ৫টি মহাবিদ্যালয়, ৩০ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১১৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৮টি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০টি মাদ্রাসা, ৬টি কিন্ডার গার্টেন, ১১টি সেটেলাইট স্কুল ও ১৩টি এন জি ও স্কুল রয়েছে। শিবচরের ৫টি কলেজের মধ্যে ১টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। যার নাম নুরুল আমিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, এটিই শিবচরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কলেজ। এছাড়া আরো দুটি ডিগ্রী কলেজ ও ৩টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. গবেষণা এলাকার বসতি ও ঘরবাড়ি

ঘরবাড়ির অবস্থা বা ধরণ বিশ্লেষণে দেখা যায় শিবচর থানার প্রায় সকল ঘর-বাড়িই একই ভাবে প্রভূত্ব করেছে বা প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও এই থানার গ্রামীণ ও শহরের ঘর-বাড়ির অবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। শিবচর থানায় মোট ৫৭৩৭৫ টি ঘরবাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ ঘর বাড়ি ৫৪৩৯১ টি এবং শহুরে ঘরবাড়ি ২৯৮৪টি। মোট ঘর বাড়ির মধ্যে ২৪৯২৬ টি ঘরবাড়ি খর ও বাঁশ দ্বারা তৈরী, ৩২২২৮ টি ঘর ইট এবং আই. সি টিনের সীট দ্বারা তৈরী। অর্থাৎ ঘরের মূল বেদী বা ডোয়া পোতা মেঝে ইটের তৈরী এবং বেড়া উপরের ছাউনী টিন দ্বারা তৈরী। এছাড়া বাদবাকী সিমেন্ট বা পোড়া ইট অর্থাৎ পাকাবাড়ীর সংখ্যা ২২১ টি। তবে বর্তমানে পাকা বাড়ির সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্থিক স্বচ্ছলতাই এর মূল কারণ। কেননা শিবচরে প্রচুর প্রবাসীর বসবাস।

আমরা যদি গ্রামীণ ও শহরের ঘরবাড়ির ধরণ দেখতে চাই তাহলে দেখা যাবে মোট ৫৭৩৭৫ টি ঘর বাড়ীর মধ্যে গ্রামে রয়েছে ৫৪৩৯১ টি ঘর বাড়ি। এর মধ্যে খর বাঁশের তৈরী ২৪০১৭ টি ঘর। সেমি পাকা ডোয়াসহ বেধী ও পাকা মেঝে ৩০২৪৫ টি বাড়ির এবং সিমেন্টের বা পাকা ঘর রয়েছে ১২৯ টি। শহরের ২৯৮৪ টি বাড়ির মধ্যে ৯০৯ টি বাড়ী খর বাঁশের, ১৯৮৩ টি সেমি পাকা এবং ৯২টি পাকা বাড়ী আছে।

সারণী ৩.২ ঃ শিবচরের গ্রাম ও শহরের ঘর-বাড়ি তৈরীর প্রধান উপাদান

ঘর বাড়ির অবস্থান	ঘর বাড়ী তৈরীর উপাদান			
	মোট	খর ও বাঁশ	সি, আই সীট	সিমেন্ট / পাকা
গ্রামীণ	১০০	৪৪.১৫	৫৫.৬১	০.২৪
শহর	১০০	৩০.৪৬	৬৬.৪৬	০.০৮
মোট	১০০	৪৩.৪৪	৫৬.১৭	০.৩৯

উৎস ঃ [B.P.S, 1994:23]

উপরের টেবিলে ঘরবাড়ি তৈরীর বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে ঘর বাড়িকে যে ভাগ করা হয়েছে তাতে ঘর বাড়ির অবস্থান এবং কি ধরণের উপাদান দ্বারা তৈরী তা দেখানো হয়েছে। উপরোক্ত সারণীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে শিবচর থানায় বসতবাড়ির বেশীর ভাগই ইট এবং সি, আই সীস (Tiles / C.I. Sheet) দ্বারা তৈরী (56.17%) গ্রামীণ বসত বাড়ি তৈরী উপাদানের ক্ষেত্রে প্রায় একই চিত্র। গ্রামে প্রায় ৫৫.৬১% ঘরবাড়ি ইট এবং সি, আই সীটের তৈরী। শহরে এর পরিমাণ আরও বেশী ৬৬.৪৬% অপর দিকে শহুরে শুধু সিমেন্ট বা ইটের ঘর বাড়ির পরিমাণও বেশী ৩.০৮%, যেখানে গ্রামে মাত্র ০.২৮%। সাধারণত যে সব ঘর বাড়ির ভিটি পাকা। অর্থাৎ ইট

Dhaka University Institutional Repository

সিমেন্ট দ্বারা তৈরী এবং বেড়া ও উপরের ছাউনি টিনের সেগুকেই সারণীতে C. I. Sheet ধরা হয়েছে।

শিবচর থানায় মোট ঘরবাড়ির সংখ্যা হলো ৫৮,০৮৫ টি। ঘরবাড়ির বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৯৮.৭৮% ঘরবাড়ি হলো বসতবাড়ি ০.২০% হলো প্রতিষ্ঠানিক ঘরবাড়ি এবং ১.০৩% হলো অন্যান্য ঘরবাড়ি। পরিবারের সদস্যের ভিত্তিতে দেখা যায় গড়ে প্রত্যেক খানায় সদস্য সংখ্যা ৫.২ জন। আর গ্রামীণ এলাকায় পরিবার গুলো একটু বড় আকার লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য ৫.৩ জন এবং শহর এলাকার পরিবারগুলো একটু ছোট দেখা যায়, যেখানে প্রতি পরিবারে সদস্য হলো ৫ জনের মত। [B.P.S, 1994: 24]

৭. পানি ব্যবহার ও পয়ঃনিষ্কাশন

এই থানায় যে জনসংখ্যা / পরিবার আছে তার মধ্যে৯৫.৭৭% পরিবার টিউবয়েলের পানি ব্যবহার ও পান করে, ০.০৩% পরিবার ট্যাপের পানি ব্যবহার করে, ০.৫৯% পরিবার পাতকুয়ার (ইন্দারা) পানি ব্যবহার করে, ১.৮২% পরিবার পুকুরের পানিব্যবহার করে এবং ১.৭৮% পরিবার নদী-নালার পানি ব্যবহার করে। [B.P.S, 1994: 24]

শিবচর থানার ২১.৯০% পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। এর মধ্যে শহর এলাকায় ১৮.৮৭% পরিবার এবং গ্রাম এলাকায় মাত্র ৩.০৩% পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। মোট পরিবারের ৮৮.৬৪% এবং এর মধ্যে গ্রাম এলাকায় ৪৯.২০% পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে না এবং শহর এলাকার প্রায় ৭৮.৪৫% পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে না। [B.P.S, 1994: 23]

৮. বিদ্যুতায়ন

১৯৯১ সালের জরিপ মতে গ্রাম এলাকার মাত্র সাতটি ইউনিয়ন পি.ডি.বি এর বিদ্যুতায়নের অন্তর্ভূক্ত ছিল। উক্ত ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে ২.৩০% পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। কিন্তু এই সংযোগ বর্তমানে অনেক বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. পেশা

এই থানার ৬৬.২৫% পরিবার নিজের কৃষি জমি আছে এবং ৩৩.৭৫% পরিবারের নিজেস্ব কোন কৃষি জমি নাই। নিজেস্ব মালিকানায় ৫০.৪৭% পরিবার শহর এলাকায় এবং ৬৭.১১% পরিবার গ্রাম এলাকায় কৃষি কাজ করে। এই থানার ৭৩.১৩% পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ৪৭.৭৪% পরিবারের প্রধান আয় কৃষির উৎস থেকে, ১.২৭% পরিবারের প্রধান আয় পশু পালন থেকে, ০.১৪% পরিবারের প্রধান আয় মৎস্য শিকার ও মৎস্য চাষ থেকে এবং ২৩.৯৮% পরিবারের প্রধান আয় দিন মজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবি পেশা থেকে। এছাড়া বাকি ২৬.৮৭% পরিবারগুলোর প্রধান আয় চাকুরী ও অকৃষি খাত থেকে। যেমন- ৯.৩৩% ব্যবসায়ী, ৩.৯৪% চাকুরীজীবি, ২.৪৯% দিন মজুর। থানার শহর এলাকার বেশীর ভাগ পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হলো ব্যবসা। শহর এলাকার প্রায় ২৪.৫৩% লোক ব্যবসায়ী, ১২.৭৭% লোক চাকরীজীবি ৩.৭৯% লোক বিভিন্ন ধরণের অকৃষি কাজ করে এবং এই এলাকায় ৪৩.০২% লোক কৃষি কাজ করে। [B.P.S, 1994: 23]

১০. শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯৯১ সালের জরিপ অনুসারে দেখা যায় ৭ বছরের উপরে শিক্ষার হার ছিল ২৬.৯০%। এর মধ্যে ৩৪.১০% পুরুষ এবং ১৯.৪০% মহিলা। গ্রামীণ শিক্ষার হার খুবই কম। শহর এলাকায় পুরুষ মহিলা মিলে ৪৩.৫০%। এর মধ্যে ৬১.১০% পুরুষ এবং ৩৫.৬০% মহিলা যা গ্রাম এলাকার চেয়ে ২৬.০% বেশী। শিবচরে সবচেয়ে বেশী শিক্ষার হার বাঁশকান্দি ইউনিয়নে ৩৭.২০% এবং সবচেয়ে কম চর জানাজাত ইউনিয়নে ১৬.৪০%। [B.P.S, 1994: 24]

১১. অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

এই থানার জনসংখ্যার বয়ঃকাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৩৬.৭১% জনসংখ্যা ১০ বছরের নিচে। এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৪.৮৫%ই কোন কাজ করতে পারে না। ১.০৬% লোক কাজের আশায় থাকে। এই থানার ৪০.০৮% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গৃহের কাজের সাথে জড়িত থাকে। ৪৪.০১% লোক পরিবারের আয় উপার্জনের উপর কাজ করে। এর মধ্যে ২৯.৩৭% কৃষি কাজ করে ০.৫৮% শিল্প কারখানায় ০.৩৭% লোক কনস্ট্রাকশন / ঠিকাদারী কাজ ০.৪৯% লোক পরিবহন-যাতায়াতের সাথে সম্পৃক্ত, ব্যবসায়ী ৭.৭৮%, নিজেস্ব চাকরীর সাথে জরিত ০.৫৯% এবং অন্যান্য কাজের সাথে জরিত ৭.৮৪%। উল্লেখ্য শুধুমাত্র থানা হেড কোয়াটারই শহরাঞ্চল (Urban) এলাকা হিসেবে আক্ষায়িত করা হয়েছে। তবে এর সাথে ৩টি মৌজার ১১.১২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা শহর এলাকার অন্তর্ভূক্ত। [B.P.S, 1994: 24]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় শিবচর থানার অবস্থান একটি মনোরম নদী বিধৌত ছাঁয়া ঢাকা, পাখি ডাকা পরিবেশে। একটু নিচু এলাকায় থানাটির অবস্থানের ফলে প্রতি বছরই বন্যা শিবচর বাসির মন ছুঁয়ে যায়। থানাটির মোট আয়তন ৩২১.৮৮ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩০৬,০৮২ জন (১৯৯১)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫১ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ১.৩০% শিক্ষার হার মাত্র ২৬.৯%। মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৯৮% শহর বা পৌর এলাকায় বসবাস করে। বাকী ৯৫.০২% লোক গ্রামে বসবাস করে। শিবচর থানায় মোট পরিবারের সংখ্যা ৫৮,০৮৫ টি এবং অধিকাংশ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। অবশ্য গ্রাম এলাকায় এই সদস্য সংখ্যা একটু বেশী এবং শহর এলাকায় কম। জনসংখ্যা, শিক্ষান্তর পরিবারের আকার উক্তরূপ হওয়া সত্ত্বেও এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল। এই এলাকার ৪৪.০১% লোক পুরোপুরিভাবে পরিবারের আয় উপার্জন কাজের সাথে জড়িত। এখানে ২৯.৩৭% লোক কৃষি কাজ করলেও অন্যান্যরা বিদেশে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। প্রায় ৭.৮৪% লোক বিদেশে বিশেষ করে গ্রীস, ইটালী, স্পেন, জার্মান, জাপান, সৌদি, দক্ষিণ কোরিয়া উল্লেখযোগ্য এসব দেশে কর্মসংস্থান হওয়ার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অনুপ্রবেশ ঘটে অত্র এলাকায়। ফলে বেশীর ভাগ পরিবারেরই অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল এবং অত্র এলাকায় জিনিস পত্রের দামও বেশী। তথাপি বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার, অজ্ঞতা , ধর্মীয় অন্ধত্ব ইত্যাদির কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

১. আর্সেনিক ও আর্সেনিকের বিষক্রিয়া

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ বর্তমান একটা বিশ্ব সমস্যা। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এর কার্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিক ভাবেই আর্সেনিকের বিষ দ্বারা বিষাম্বিত; কারণ তারা যে ভূ-গর্ভস্থ পানি পান করে তাতে প্রকৃতিগত ভাবেই অজৈব আর্সেনিক মিশ্রিত। বর্তমানে আর্সেনিকের বিষ খুব পরিচিত একটি নাম। অতি সম্প্রতি এই বিষ বাংলাদেশের পরিবেশ সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ও ধ্বংশের ক্ষেত্রে এই সমস্যা পূর্বের যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়কেই হার মানায়।

বাংলাদেশের মানুষ ১৯৪০ সাল হতে টিউবওয়েল বা চাপকল ব্যবহার করে আসছে। অথচ মাত্র ২০ বছর পূর্বে মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত পানি সম্পর্কে জানতে পেরেছে। অতিরিক্ত টিউবওয়েলের পানির স্বতন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে কবে কখন, কোথায় আর্সেনিক ধরা পড়েছে তা সঠিক ও সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। সম্ভবত বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বিষ ধরা পড়েছে ১৯৬০ সালে। অতপর ১৯৭৮ সালে আর্সেনিক ধরা পড়ার এই বিষয়টার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমাদের দেশে প্রথম আর্সেনিককোসিস রোগী সনাক্তকরণ করা হয় ১৯৯৩ সালে। যার নাম আব্দুল মতিন, বাড়ী চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজারামপুর গ্রামে। ১৯৯০ সালে পানিবাহিত এই মরণব্যাধি আরো অনেক জেলা/জায়গায় সৃষ্টিগোচর হয়। সর্বপরি ১৯৯৪ সালে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা যান উত্তর বঙ্গের বিরামপুর থানার বাসনগর গ্রামের অধিবাসি অলক সরকার। এই ঘটনার পর হতেই বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিক আক্রান্ত পানি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে যখন যশোর জেলার ঝিকর গাছা থানার সুমাতা গ্রামে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায় তখন থেকে বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের **'পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং'** বিভাগ নবাবগঞ্জ জেলার বার ঘরিয়া ইউনিয়নে প্রথম কাজের অনুমোদন করে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার গোটা দেশের আর্সেনিক অবস্থা জানার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেয়। প্রাথমিকভাবে এই কমিটির নাম ছিল The Committee for reviewing the situation of arsenic toxication in ground water পরবর্তীতে এই কমিটির চূড়ান্ত নামকরণ করা হয় 'Arsenic Committee' নামে। বাংলাদেশ সরকারের **'পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং'** ১৯৯৪ সালেই মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল আর্সেনিক সমস্যার উৎঘাটন ও সমাধানকল্পে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করে। এদের মধ্যে- National Institute of preventive and Social Medicine (NIPSOM), Agriculture Advisory Society, Asia Arsenic Network এবং Dhaka Community Hospital অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশের Community Hospital, Jadavpur University of Calkatta, United Nation Development Programme (UNDP) এবং Ministry of Public Health এক যোগে এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২. আর্সেনিক

আর্সেনিক একটি মৌলিক পদার্থ যা ভৌতভাবে ধাতু হলেও রাসায়নিকভাবে ধাতু ও অধাতু উভয়ের মত আচরণ করে। তাই একে অপধাতু বা ধাতুকল্প বলা হয়ে থাকে। মূলতঃ আর্সেনিক স্ফটিকাকার একটি ধাতব মৌল, যা ভঙ্গুর এবং ফিকে ধুসর বা সাদা রঙের হতে পারে। পিরিয়ডিক চার্টে আর্সেনিকের অবস্থান ৫ নম্বর গ্রুপে, এর রাসায়নিক সংকেত 'As'। যার আণবিক সংখ্যা ৩৩ এবং আণবিক ভরসংখ্যা ৭৪.৯২১৬। আর্সেনিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৭৩। [ডা. এম.এম. হক, ২০০২:০৯]

প্রকৃতিতে আর্সেনিক যুক্ত মৌল হিসেবে সাধারণত পাওয়া যায় না। এটি সর্বদাই রাসায়নিকভাবে কোন না কোন মৌল বস্তুর সঙ্গে যৌগরূপে বিরাজ করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার এটি খুবই সক্রিয় একটি মৌলিক পদার্থ যা সহজেই অন্য পদার্থের সাথে বন্ধন তৈরী করতে পারে। ইহা একদিকে অক্সিজেন, ক্লোরিণ, গন্ধক, কার্বণ,হাইড্রোজেন। অন্যদিকে সীসা, পারদ, সোনা ও লোহার সঙ্গে যৌগরূপে অবস্থান করে। আর্সেনিক প্রধানত অক্সাইড, হাইড্রেট, সালফাইড, আর্সেনাইট এবং আর্সেনেট যৌগ হিসেবে থাকে। এসব যৌগ সোনা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা ইত্যাদি ধাতুর সাথে সহবস্থান করে। [এম.এস. আলম, ২০০০:০৮]

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে বায়োস্ফিয়ারে শিলা গঠনের ৮টি প্রধান মৌল হল যথা ঃ (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Smg)। এছাড়া আরও কিছু মৌল রয়েছে যার নাম ট্রাঙ্গ মৌল। ট্রাঙ্গ মৌল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হলো, "যে মৌল প্রাকৃতিক পদার্থে শতকরা ০১% ভাগেরও কম মাত্রায় থাকে তাকে ট্রাঙ্গ মৌল বলে বিবেচনা করা হয়। আবার প্রাণ রসায়ন ও ভেষজ রসায়ন গবেষণায় সে সব মৌলকে ট্র্যাস মৌল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যে সব মৌল সাধারণভাবে উদ্ভিদ ও

প্রাণীকলায় শতকরা ০.০১% ভাগের কম পরিমাণে থাকে [Adriano, 1986, Coded by H.K. Das, 2000:01]। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলাদেশে আর্সেনিক নামক গ্রন্থে ট্র্যান্স মৌল বলতে সেটাকেই বোঝানো হয়েছে, যা প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব অল্প পরিমাণে থাকে এবং অধিক পরিমাণে স্তুপীকৃত হয়ে জীবদেহে ক্ষতি সাধন করে। বাস্তবিক পক্ষে ট্র্যান্স মৌলের সমার্থ শব্দ হিসেবে "ট্র্যান্সমেটাল", "হেভীমেটাল", মাইক্রো নিউট্রিমেন্ট, মাইক্রোমৌল, "গৌণমৌল", ট্র্যান্স ইন-অর্গানিক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হেভীমেটাল হলো সে সব পদার্থ যার ঘনত্ব ৫-এর বেশী থাকে। [H.K. Das, 2000:02]

যেহেতু আর্সেনিক প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট একটি স্বাদ ও গন্ধহীন ভঙ্গুর ধাতুকল্প এবং অত্যান্ত বিষাক্ত একটি পদার্থ, সেহেতু ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু, মাটি পানি ও প্রাণীদেহে অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। আমাদের দেহে ও সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক আছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে আর্সেনিকের ব্যবহার ও বিষাক্ততার বিভিন্ন কল্পকাহিনী ও উপাখ্যান রয়েছে। 'আর্সেনিক' শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে মৃত্যুর জোরালো উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বর্তমানে পৌরাণিক ও রহস্যজনক শব্দটির প্রতিশব্দ হলো 'বিষ'। আর্সেনিক যৌগের মধ্যে বিষাক্ততার দিক থেকে স্বাদহীন ও গন্ধহীন আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইডকে বিষের রাজা হিসেবে অভিহিত করা হয়। [Azcue and Nriagu, 1994, Coded by H.K. Das, 2000: 02]

জীব মন্ডলের সর্বত্র আর্সেনিকের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীন কালে আর্সেনিক ঔষধ ও বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। গ্রাম বাংলায় আর্সেনিক সেঁকো বিষ হিসাবে পরিচিত। মারাত্মক বিষ হিসাবে আর্সেনিকের ব্যবহার বহুকাল আগে থেকেই মানুষ জানত। ফ্রান্সের বিশ্ববিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে এই বিষ প্রয়োগ করেই হত্যা করেছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরেজরা সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ানকে নির্বাসন দেয়। সেখানে ১৮২১ সালে ৫ মে তার মৃত্যুর পর ঘোষণা করা হয়েছিল সম্রাট নেপোলিয়ান পাকস্থলীর ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন অভিযোগ উঠেছিল ইংরেজরা দীর্ঘদিন এই মৃদ বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে (Slow Poisoning) তাকে হত্যা করেছে। ইংরেজরা প্রথমে এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও অনেক দিন পর সংগ্রহশালার রক্ষিত নেপোলিয়ানের চুল পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিল যে তাকে বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হয়েছিল এবং বিষটির নাম আর্সেনিক 'নেপোলিয়ানের চুলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ১৩ গুণ বেশী। [এম.এস. আলম,২০০১:০৮]

পৃথিবীতে ১৫০ টির মত আর্সেনিক যৌগের উপস্থিতির কথা যানা যায়। তবে মূলত তিনটি খনিজ পদার্থকে আর্সেনিকের আকার হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ আর্সেনিকের পরিমাণ এদের মধ্যে যেমন বেশী তেমনই এগুলো সহজলভ্য। এই তিনটি খনিজ হচ্ছে, রিয়ালগার (Realger) বা আর্সেনিক ডাই সালফার (AS_2S_2), অরপিমেন্ট (Orpiment) বা আর্সেনিক ট্রাইসালফার (AS_2S_3) এবং আর্সেনোপাইরাইট বা আয়রণ আর্সেনিক সালফাইড (FeAS)। এই তিন ধরনের আর্সেনিক খনিজের ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, সব গুলোতেই রসুনের গন্ধের মতো একটা গন্ধ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের উৎস হিসাবে ভূগর্ভে থাকা আর্সেনোপাইরাইট জারিত হয়ে পানিতে আর্সেনিক দ্রবীভূত হওয়ার পর এই পানিতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। আর্সেনিককে বাতাসে পোড়ালে রসুনের মত গন্ধ পাওয়া যায় এবং আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইডের (AS_2O_3) ঘন সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়। [আর্সেনিক সমস্যা, নেটওয়ার্কিং সেমিনার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০১]

রাসায়নিক ভাবে আর্সেনিক যৌগগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে, অজৈব আর্সেনিক এবং জৈব আর্সেনিক। অজৈব আর্সেনিকের যৌগগুলো আবার দুই ধরণের হতে পারে। যেমন ত্রিযোজী (Trivalent) আর্সেনিক এবং পঞ্চযোজী (Pentavalent) আর্সেনিক। অজৈব আর্সেনিক যৌগ জৈব আর্সেনিকের চেয়ে অনেক বেশী বিষাক্ত। আবার পঞ্চযোজী আর্সেনিক ত্রিযোজী আর্সেনিকের চেয়ে অন্ততঃ ৬০ গুণ কম বিষাক্ত। ত্রিযোজী আর্সেনিক যৌগগুলো আর্সেনাইট (Arsenite) এবং পঞ্চযোজীগুলো আর্সেনেট (Arserbte) নামে পরিচিত। পানিতে সাধারণত আর্সেনাইট, আর্সেনেট, মনোমিথাইল আর্সেনিক এসিড, ডাই মিথাইল আর্সেনিক এসিড এই চারটি যৌগ থাকে। তবে ভূগর্ভস্থ পানিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে আর্সেনাইট ও আর্সেনেট। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার ভূগর্ভস্থ পানিতে এই দুটি যৌগের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে। আর্সেনিক যৌগ পানিতে দ্রব্যনীয় নয়। জাবিত হয়ে তা পানিতে মিশে। [এম.এস. আলম,২০০১:০৮]

প্রকৃতিতে আর্সেনিকের রয়েছে অসংখ্য উৎস। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে পর্যাপ্ততার মান দন্ডে আর্সেনিকের অবস্থান হচ্ছে বিশতম। বাতাস, মাটি, পানিসহ প্রকৃতির প্রতিটি মাধ্যমেই কমবেশী আর্সেনিক আছে। মাটি তে সর্ব সময়েই কমবেশী কিছু না কিছু আর্সেনিক থাকে। ভূগর্ভের শিলাস্তরের সাথে মিশে থাকে আর্সেনিকের বিভিন্ন খনিজ। সাধারণ অবস্থায় পানিতেও সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক থাকে। প্রাকৃতিক জলাধারে প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মাইক্রো গ্রাম আর্সেনিক থাকে। এছাড়াও বেশীর ভাগ ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ-মাংশে সামান্য

পরিমাণ আর্সেনিক থাকে। অর্থাৎ মানুষ প্রতি দিন বাতাস, পানি ও খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে কিছু না কিছু আর্সেনিক গ্রহণ করছে। তবে পরিমাণ কম থাকায় স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে গৃহীত আর্সেনিক শরীরের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে মানুষ যে আর্সেনিক গ্রহণ করে প্রকৃতির দিক থেকে তা জৈব। যার বিষাক্ততা অজৈব আর্সেনিক থেকে অনেক কম। আপাতদৃষ্টিতে কোন অসুবিধা ছাড়াই মানুষ সাধারণত প্রতিদিন তার শরীরের প্রতিকেজি ওজনের বিপরীতে ১৫০ মাইক্রো গ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক সহ্য করতে সক্ষম। তবে স্পর্শকাতর মানুষ কেজি প্রতি দিনে ২০ মাইক্রোগ্রামেই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। [এম.এস. আলম,২০০১:০৯]

৩. ভূ-তাত্ত্বিক পরিবেশে আর্সেনিক

মৌল হিসেবে নয় বরং বিভিন্ন মৌলের (যেমন- আয়রন, কপার, কোবাল্ট, লেড, জিঙ্ক, গোল্ড, সিলভার, ইউরেনিয়া ইত্যাদির) যৌগ হিসেবে আর্সেনিক প্রকৃতিতে পরিবেশের বিভিন্ন মাধ্যমে (যেমন- বায়ু, মাটি, পানিতে) অবস্থান করে। আর্সেনিক প্রকৃতিতে আগ্নেয় শিলা এবং খনিজ আকরিকের সাথে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতিতে সাধারণত দু'ধরণের আর্সেনিক বিরাজ করছে। তা হলো-

১। জৈব আর্সেনিক ও

২। অজৈব আর্সেনিক।

অজৈব আর্সেনিক জৈব আর্সেনিকের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর। পানিতে প্রধানত আর্সেনিকের অজৈব রূপ পাওয়া যায় যা ত্রিযোজী (আর্সেনাইট) বা পঞ্চযোজী (আর্সেনেট) হতে পারে। ত্রিযোজী আর্সেনাইট, পঞ্চযোজী আর্সেনেটের চেয়ে প্রায় ৬০ গুণ বেশী ক্ষতিকর। [ডা. এম.এম. হক, ২০০২:০৯,১০]

বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকে উ লম্ব গভীরতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত তিনটি স্মরে ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এই বিভাজনের প্রকৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইউ.এন.ডি.পি, ১৯৮২ কর্তৃক জলস্তর বিভাজন ঃ

১। উপরি জলস্তর (Upper aquifers / Composite aquifers)

২। প্রধান জলস্তর (Main aquifers) এবং

৩। গভীর জলস্তর (Deep aquifers)

বি.জি.এস এবং ডি.পি.এইচ.ই, ২০০১ কর্তৃক জলস্তর বিভাজন ঃ

১। অগভীর উপরিস্তর (Upper Shallow)

২। অগভীর নিম্নস্তর (Lower Shallow) এবং

৩। গভীর জলস্তর (Deep aquifers)

আগার ওয়াল ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক জলস্তর বিভাজন ঃ

১। প্রথম জলস্তর (1st aquifers / type-1-2)

২। দ্বিতীয় জলস্তর (2nd aquifers / type-3) এবং

৩। তৃতীয় জলস্তর (3rd aquifers / type-4)

কিন্তু বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা গেছে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি, পানির গভীরতায় নয় বরং ভূ-স্তরের বিভিন্ন চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। অঞ্চল ভেদে একই ভূ-স্তরের গভীরতায় তারতম্যও রয়েছে। এজন্য গভীরতার চেয়ে ভূ-ত্বকের চরিত্র অনুযায়ী ভূ-স্তরের বিভাজন অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জী অনুযায়ী বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের একটি আদর্শ শ্রেণী বিভাজন দেখানো হয়েছে। যা আর্সেনিকের উপস্থিতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন-

১। **লেট প্লায়েস্টোসিন / হলোসিন স্তর (Late Plistocene Holocone aquifers)ঃ**

→ হলোসিন উপরিস্তর (Upper Holocone aquifers)

→ হলোসিন মধ্যস্তর (Middle Holocone aquifers)

→ হলোসিন নিম্নস্তর (Lower Holocene aquifers)

২। **প্লিও-প্লায়োস্টাসিন স্তর (Plio-Pliestocene aquifers) ঃ**

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে আর্সেনিকের উপস্থিতি যে সকল নলকূপে বেশী তাদের অধিকাংশই হলোসিন উপরিস্তর ও হলোসিন মধ্যস্তর থেকে পানি তুলছে। এসব স্তর অপেক্ষাকৃত নবীন। কিন্তু প্রাথমিক ও আদি অধঃক্ষিপ্ত স্তরের পানি ঘেরা, ফলে তা আর্সেনিক আক্রান্ত নয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরবরাহের জন্য উত্তোলিত পানির অধিকাংশই তোলা হয় গভীর প্লিও প্লায়েস্টোলিন বা আদি অধঃক্ষিপ্ত স্তর হতে যাতে আর্সেনিকের উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনধিক। অতএব ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ভেদে বলা যায় হলোসিন উপরিস্তর ও মধ্যস্তরের পানি আর্সেনিক আক্রান্ত। কিন্তু হলোসিন নিম্নস্তর ও প্লিও প্লায়েস্টোসিন বা আদি জলস্তরের পানি আর্সেনিক মুক্ত। [এম.এম. হক, ২০০২:১১,১২]

Dhaka University Institutional Repository

৪. পানিতে আর্সেনিক দূষণের প্রক্রিয়া

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের দূষণ ঘটার কারণ এখানো ও স্পষ্ট নয়। তবে এটুকু নিশ্চিত, এই আর্সেনিকের উৎস অবশ্যই ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-অভ্যন্তর এবং মনে করা হয় যে একটি বিশেষ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভূ-গর্ভের মৃত্তিকা কণায় সংশ্লিষ্ট আর্সেনিক তার সংস্পর্শে থাকা তরলে মিশে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবী জুড়ে মাটিতে কিছু পরিমাণ আর্সেনিক বিদ্যমান। আমাদের দেশে এই মাত্রা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক, তেমনটা বলা যাবে না, আবার না বললেও ভুল হবে। এছাড়া ভূ-গর্ভের মাটিতে থাকা মোট আর্সেনিকের ঘনত্বের সাথে তার সংস্পর্শে থাকা পানির আর্সেনিক ঘণত্ব সমন্তরাল বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই ধারণা করা হচ্ছে ঐ মাটির ভূ-গর্ভস্থ পরিবেশগত অবস্থা ও উপাদানের গুণগত তারতম্যের উপর নির্ভর করছে পানিতে কতটুকু আর্সেনিক পাওয়া যাবে। আর্সেনিক উপাদান সমূহ কোন কোন পরিবেশে (বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়াও) জারণ-বিজারণ, অধঃক্ষেপণ দ্রবণায়ন, সংযোজন বিয়োজন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে পারি। এসব প্রক্রিয়া, কোন পরিবেশে আর্সেনিকের স্থাণান্তর অথবা একত্রিত হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে বিভিন্ন পরিবেশ আর্সেনিকের মাত্রার তারতম্য ঘটে।

পানিতে আর্সেনিক দূষণের সম্ভাব্য কারণ হিসাবে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, কৃষি, শিল্প, পানীয় জল ও গৃহস্থলীর কাজে অতি মাত্রায় পানি উত্তোলনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্ত র দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। যার ফলে মাটির কণার ক্ষুদ্র গহ্বরগুলোতে যে ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হচ্ছে সেই স্থান দখল করছে বায়ু। বায়ু প্রবেশের ফলে সঞ্চিত আর্সেনিক যুক্ত আকরিক বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে আর্সেনিককে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। [ডা. এম.এম. হক, ২০০২:১২]

পশ্চিম বঙ্গের বিশেষজ্ঞগণ সেখানকার ভূ-গর্ভস্থ মাটির নমুনা সংগ্রহ করে এবং প্রাপ্ত উপাদান বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, মাটির ১৫-৮০ মিটার গভীরে ভূ-স্তরের ফাঁকে ফাঁকে আর্সেনিক যুক্ত খনিজ পদার্থ রয়েছে। তাদের মতে ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক পরিমাণে উত্তোলনের ফলে ভূ-স্তরের মাঝে ঢুকে পড়া বায়ুর অক্সিজেন আর্সেনিককে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ঠেলে দিয়ে আমাদের অগভীর নলকুপকে বিষিয়ে তুলছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে “Oxidation Process” বা “জারণ পদ্ধতি”। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ অক্সিজেনের আধিক্যের পরিবর্তে অক্সিজেনহীনতাকেই ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক মিশে যাওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের এবং বি.জি.এস. এর ব্রিটিশ গবেষকগণ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, মাটির কণার গায়ে লেগে থাকা আয়রণ অক্সি হাইড্রক্সাইড এর আবরণের উপর আর্সেনিক যুক্ত থাকে। তাদের মতে আয়রণ অক্সি-হাইড্রক্সাইড অক্সিজেনের অতিরিক্ত ঘাটতির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিজারিত হবার ফলে দ্রবীভূত হয়ে আর্সেনিককে পানিতে মিশিয়ে দেয়। এই পদ্ধতিটি "Reduction Process" বা বিজারণ পদ্ধতি নামে পরিচিত।

সাধারণত ভূ-গর্ভস্থ মাটির কণার ফাঁকে ফাঁকে অক্সিজেন এমনিতেই কম থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের মাটিতে বিভিন্ন দূষণ দ্বারা জৈবিক প্রক্রিয়া বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং এছাড়াও অনন্য বিভিন্ন কারণে মাটির নিচের পরিবেশ আরো অক্সিজেনহীন হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত কারণে মাটির কণার সাথে লেগে থাকা আয়রণ অক্সি-হাইড্রক্সাইড বিজারিত হয়ে পানিতে মিশে যাচ্ছে এবং একই সাথে আয়রণ অক্সি-হাইড্রক্সাইড এর আবরণের সাথে যুক্ত আর্সেনিককেও পানিতে ঠেলে দিচ্ছে।

এছাড়াও কিছু সীমানাহীন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর রয়েছে যাদের ঘিরে আছে আর্সেনিক মিশ্রিত বিভিন্ন উপাদান। সেখানে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া চলতে পারে। প্রাকৃতিক বিভিন্ন পরিবর্তনের দ্বারা এই আর্সেনিক মিশ্রিত উপাদানগুলো এসব পানির স্তরের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সীমানাহীন এই সব ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হতে ক্রমাগত পানি সরিয়ে নেওয়ার কারণে পঞ্চযোজী আর্সেনিক যৌগগুলো মুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরে তা বিজারিত হয়ে ত্রিযোজী আর্সেনিক যৌগে পরিণত হয়। অতঃপর পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মিশে যায়। ফলে পানি আর্সেনিক দূষিত হয়ে পড়ে। আমাদের দেশ গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত বলে। আর্সেনিক দূষণের উপরোক্ত সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়াই দায়ী হতে পারে।

৫. মানব দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া

আর্সেনিককোসিস মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের উপর বিভিন্নভাবে কুপ্রভাব ফেলে। অধিক মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণে ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে বেশিরভাগ রোগীই মেলানোসিসে ভুগে। আর্সেনিকোসিসের শেষ ধাপ ক্যান্সার। বাংলাদেশে আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হতে পারে দু'ধরণের, একটি তাৎক্ষণিক এবং অপরটি দীর্ঘমেয়াদী। তাৎক্ষণিক আর্সেনিক বিষক্রিয়া হয় মূলত খাদ্যপথে বা শ্বাস পথের মাধ্যমে শরীরে অতিরিক্ত আর্সেনিক কোন না কোন ভাবে প্রবেশ করলে। নির্দিষ্ট কিছু আর্সেনিক যৌগ রয়েছে যা বেশ বিষাক্ত। কোনভাবে এই সব বিষাক্ত যৌগ অধিক পরিমাণে গিলে ফেলা হলে বা কোন গ্যাসের মাধ্যমে শ্বাসতন্ত্রে প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিক আর্সেনিক বিষক্রিয়া শুরু হয়। তাৎক্ষণিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গ সমূহের মধ্যে রয়েছে তীব্র বমি ও পাতলা পায়খানা, খিচুনি, মুখমন্ডলে পানি আসা, হৃদযন্ত্রে গোলোযোগ হওয়া ইত্যাদি। দেখা গেছে ৭০-১৮০ মিলিগ্রাম ত্রিযোজী

Dhaka University Institutional Repository

আর্সেনিক অক্সাইড খেলে মানুষ মারা যায়। তাৎক্ষণিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ আর্সেনিক গ্রহণের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা দিতে পারে, যদি গৃহীত আর্সেনিক যৌগ কোন দ্রবণের মধ্যে থাকে। অথবা এই বিষক্রিয়ার লক্ষণ কয়েক ঘন্টা পরেও দেখা দিতে পারে যদি তা কঠিন হয় বা কোন খাদ্যের সাথে গ্রহণ করা হয়। [ডা. এম.এম.হক, ২০০২:১৭]

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ওষুধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্সেনিকের কুপ্রভাব অতি প্রাচীন। আর্সেনিকের তীব্র বিষক্রিয়ার জন্য, এটি নরহত্যায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো। আধুনিককালে অনেক সময় 'আর্সেনিক' শব্দটি বিষের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর্সেনিকের বিভিন্ন বাহ্যিক অবস্থা যেমন, গ্যাস, দ্রবণ বা পাউডার অণুর আকার ও পরিমাণের উপর এর বিষাক্ততা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া আর্সেনিকের তীব্রতা নির্ভর করে বিভিন্ন কোষে আর্সেনিক শোষণের হার, নিঃসরণের হার, অপদ্রব্য উপস্থিতির পরিমাণ, বিষাক্ত যৌগে রাসায়নিক উপকরণের প্রকৃতি এবং আক্রান্ত রোগীর শরীরের পূর্ব অবস্থার উপর। [এস.এস. আলম, ২০০১:১৭]

সারণী- ৪.১ ঃ তাৎক্ষণিক (Acute) ও দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) আর্সেনিক বিষাক্তার ক্লিনিকোপ্যাথোলজিক্যাল ফলাফলের তালিকা

অঙ্গীয়	তাৎক্ষণিক	দীর্ঘস্থায়ী
চর্মগত	ক্যাপিলারি ফ্লাশ, ডার্মাটিটিস সম্পর্ক, ফলিকিউলিটিস, চুল উঠা, নখে দাগ (এলডিচ-মেসলাইন্স)	মেলানোসিস, বোয়েন্স রোগ, মুখে ইডিমা, হাতের তালুতে হাইপারকেরাটোসিস, কিউটেনাস ম্যালিগনসিস, হাইপারপিগমেন্টেশন ডেসকোয়ামেশন।
স্নায়ুগত	হাইপারপাইরেক্সিয়া, কনভলশন, টেমার, সংজ্ঞাহীন, ডিসওরিয়েন্টেশন	এনসেফালোপ্যাথি, মাথাব্যথা, পেরিফেরাল, পলিনিউরোপ্যাথি, ইক্সোনাল ডিজেনারেশন।
গলনালী	তলপেটে ব্যথা, ডিস্ফাজিয়া, বমি, রক্তময় বা চাল ধোয়া পানির মতো পাতলা পায়খানা, মল ও নিঃশ্বাসে রসুনের গন্ধ, শ্লেষ্মা ত্যাগ, যকৃত ফুলে যাওয়া।	বমি-বমি ভাব, বমি, অ্যানোরেক্সিয়া, ডায়রিয়া, ওজন হ্রাস, হেপাটোমেগালি, জন্সিস, প্যানক্রিয়েটিটিস, সিরোসিস।
বৃক্কগত	টিউবিউলার ও গ্লোমেরিউলার ক্ষয়, ওলিগুরিয়া, ইউরেমিয়া।	নেফ্রিটিক রোগ, প্রোটিনিউরিয়া।

পর. পৃ. দ্র.

রক্তগত	থ্রমবোসাইটোপেনিয়া, রক্তশূন্যতা।	রক্তশূন্যতা, মেরুমজ্জা ও শ্বেতরক্ত কণিকা বিনষ্ট লুকোপেনিয়া, হজম ক্রিয়া হ্রাস, থ্রমবোসাইটোপেনিয়া, কেরিওরেক্সিয়া, বেসোফিলিক ট্রিপলিং।
হৃদ সংক্রান্ত	এস টি স্তর অস্বাভাবিক, কিউ টি বর্ধিত, ভেন্টিকুলার ফাইব্রিলেশন।	অ্যারিথমিয়াস, পেরিকার্ডিটিস, অ্যাক্রোসায়ানোসিস, গ্যাংগ্রেন (ব্লাক ফুড রোগ)।
শ্বসন সংক্রান্ত	পালমোনারি ইডিমা, এ আর ডি এস, ব্রাঙ্কিয়ান নিমোনিয়া, টেকোব্রোংকাইটিস।	সর্দি, পালমোনারি ফিব্রোসিস, ফুসফুস ক্যান্সার।

উৎস ঃ Gorby, 1994, Coded by H. K. Das, 2000:198

শরীরে আর্সেনিক প্রবেশের পর আর্সেনিকের ধরন ও গ্রহণের সময়-কাল-মাত্রার সম্পর্কের উপর এর রাসায়নিক বহিঃপ্রকাশ নির্ভর করে। সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম পরিমাণের আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড মারাত্মক জীবননাশক বিষ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। মানবদেহে ২০ মিলিগ্রাম আর্সেনিকের অনুপ্রবেশ জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ ও ঝুঁকিপূর্ণ। তবে ১০ মিলিগ্রাম আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভের নজির রয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে যে আর্সেনিক বিষক্রিয়া তা সংক্রমনের প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে তাদের রোগ সনাক্ত করা হয়। চিকিৎসাগত দিক থেকেও রোগীদের লক্ষণগুলি সনাক্ত করা কঠিন। বর্তমানে যেভাবে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করা হচ্ছে তা তাদের ত্বকের গুটি বা ফুসকুড়ি দেখে এবং তাদের আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহারের ইতিহাস জেনে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের রোগ সনাক্ত করার জ্ঞান স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেও সীমিত। যেহেতু এ ধরণের রোগ এদেশে একেবারেই নতুন, সেজন্য সমাজকর্মীদেরও ধারণার অভাব রয়েছে।

আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করলে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হবে এবং তা বেদনাদায়ক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আর্সেনিকের ঘাতক ক্ষমতার কারণে একে বলা হয় বিষের রাজা। এই বিষের সর্বোচ্চ মরণমাত্রা ১২৫ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ একবারে এই পরিমাণ আর্সেনিক গ্রহণ করলে তীব্র বিষক্রিয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। পারদের তুলনায় আর্সেনিকের বিষাক্ততা ৪ গুণ বেশি [এম.এস. আলম, ২০০১:১০]। যদিও তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, আলাস্কা, চিলি,

মেক্সিকো, চীন, মঙ্গোলিয়া, ঘানা, হাঙ্গেরীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু গঙ্গা অববাহিকার ভাটি অঞ্চলেই সম্ভবত আর্সেনিকের উচ্চমাত্রায় উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।

মানুষের দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়া নির্ভর করে কতদিন যাবৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে তার উপর। আর দীর্ঘমেয়াদী আর্সেনিক বিষক্রিয়াকে আর্সেনিকোসিস বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে কোন ব্যক্তি আর্সেনিক দূষিত পানি বা অন্য কোন উপাদানের সাথে আর্সেনিক বারে বারে গ্রহণ করতে থাকলে তিনি আর্সেনিকোসিস রোগের শিকার হবেন।

শরীরের আর্সেনিক গ্রহণের মাত্রা বা পরিমাণ থেকে এর বিষক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১। তীব্র বিষক্রিয়া।

২। মাঝারি বিষক্রিয়া এবং

৩। ধারাবাহিক ব্যবহারজনিত বিষক্রিয়া।

১) তীব্র বিষক্রিয়া ঃ তীব্র আর্সেনিক বিষক্রিয়া সাধারণত হত্যা, আত্মহত্যা জনিত উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মরণমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩০ মিলিগ্রাম এবং এই পরিমাণ আর্সেনিক গ্রহণের ১২ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আর্সেনিক গ্রহণের আধ ঘন্টার মধ্যেই আর্সেনিকের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে। তীব্র বিষক্রিয়ার প্রথমে বমি বমি ভাব হতে পারে। গলায় পাকস্থলিতে অসম্ভব জ্বালাপোড়া শুরু হয়। হাত, পায়ের মাংস পেশীতে খিচুনি ধরে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এরপর তীব্র পানির পিপাসা তৈরী হয় এবং রোগী বমি করতে থাকে। ঘন ঘন পায়খানা শুরু হয়। প্রথমে পায়খানার বর্ণ থাকে কালো ও রক্তমিশ্রিত। পরে তা বর্ণহীন গন্ধহীন হয়ে পড়ে এবং পানির আকারে বের হতে থাকে। এরপর আস্তে আস্তে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

২) মাঝারি বিষক্রিয়া ঃ অল্প অল্প আর্সেনিক নির্দিষ্ট বিরতিতে গ্রহণ করলে মাঝারি ধরণের বিষক্রিয়া ঘটে থাকে। এ ধরণের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে যেসব উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে রয়েছে বদহজম, কফ, গলায় শিরশির ভাবে, বমি, তলপেট ব্যথাসহ পায়খানার বেগ ইত্যাদি। রোগীরা এক্ষেত্রে বিষন্নতার ভোগে এবং ক্রমান্বয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। পায়খানায় রক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যেতে থাকে। স্নায়ুপ্রদাহ শুরু হয়, মাংসপেশীতে খিচুনি তৈরী হয়। রোগীরা অস্থির হয়ে পড়ে। ঘুমুতে পারে না এবং শেষাবধি মৃত্যুবরণ করে।

৩) ধারাবাহিক ব্যবহারজনিত বিষক্রিয়া ঃ সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক গ্রহণের পরিমানের ওপর ভিত্তি করে ক্রমিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৬ মাস থেকে ২ বছর বা তারও অধিক সময় লাগে। আর্সেনিক প্রধানত জড়ো হয় যকৃত, কিডনি, হৃদপিন্ড ও ফুসফুসে। পেশী এবং স্নায়ুর টিস্যুতেও আর্সেনিকের সামান্য উপস্থিতি বিদ্যমান। এছাড়া চুল, নখ ও ত্বকে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক সঞ্চিত হতে পারে। অন্তসত্ত্বা নারীদের ক্ষেত্রে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় গর্ভেই সন্তানের মৃত্যু হতে পারে। অর্সেনিকের বিষক্রিয়ার লক্ষণ মানবদেহে কিভাবে প্রকাশ পাবে তা দেশে দেশে বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ ত্বকেই বেশি দেখা যায়। কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

আর্সেনিক বিষ স্বাস্থ্যের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। এ বিষাক্রমণে যে রোগ হয় তাকে বলে আর্সেনিকোসিস। এ রোগাক্রমণের ধাপগুলো হলো লিউকো মেলানোসিস, কেরাটোসিস, হাইপারকেরাটোসিস, কনজাংটিভাইটিস, গ্যাংগ্রিন ও ক্যান্সার। বাংলাদেশে অনেক লোক আর্সেনিকোসিস রোগে ভুগছে। এই রোগের অজ্ঞতাবশত গ্রাম বাংলার আর্সেনিকোসিস রোগীদেরকে অনেক সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর্সেনিকোসিস রোগাক্রান্ত মেয়েরা অধিক পরিমাণে সামাজিক কুপ্রভাবের শিকার। আর্সেনিকোসিস দুরারোগ্য ব্যাধি ও ছোঁয়াচে রোগ ভেবে অনেক বিবাহিতা মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং অনেক যুব-যুবতীকে বিবাহ থেকে বিরত থাকারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আর্সেনিকোসিস যে ছোঁয়াচে রোগ নয়; শুধু আর্সেনিকমুক্ত পানি পান ও পুষ্টি ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খেলেই এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এ বিষয়টি অনেকেরই অজানা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

১. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয়

যাদের নিয়ে আমার এই গবেষণা কার্যের বুৎপত্তি এবং যারা এই দীর্ঘ আলোচনা সমালোচনার মধ্যমনি তারা হচ্ছেন মাদারীপুর জেলার, শিবচর থানাধীন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী। কারণ এদেরকে নিয়েই আমার এই গবেষণা প্রতিবেদন । তাই এদের ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিচয় ব্যতীরেকে, বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা সৃষ্টি কতটুকু বৃদ্ধি করবে তাই বিবেচ্য। সুতরাং আমার এ গবেষণার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও একে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আমি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরছি আর এই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আমি এখানে যে সব বিষয় উপস্থাপন করেছি তা হলো শিবচর থানায় যারা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত তাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য তাদের পরিবারের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য এবং রোগীদের কিছু সামাজিক পরিচয়। যেমন- রোগীদের বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো, বৈবাহিক অবস্থা, পরিবারের ধরণ, আয়ের উৎস, প্রধান পেশা, ধর্মীয় পটভূমি, শিক্ষার স্তর ইত্যাদি।

২. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যা যে কোন দেশের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ জনসংখ্যার মাধ্যমেই কোন একটি দেশ বা এলাকার সার্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়। কাজেই আমার গবেষণা এলাকা শিবচরের তথা আক্রান্তকারী রোগীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক। জনগণের জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়, বসতি ইত্যাদির সমন্বিত রূপ প্রকাশ করে সে এলাকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। গবেষণা এলাকা শিবচর মূলতঃ একটি নদী ভাঙ্গনের করাল গ্রাসের শিকার, বন্যা কবলিত পশ্চাদপদ এলাকা। ব্যাপক অশিক্ষা ও কুসংস্কার এখানে বিরাজমান। এখানকার সার্বিক জনসংখ্যা ও আক্রান্তকারী জনসংখ্যার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ৩০ বছরের বেশী বয়স্ক লোক আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত যাদের বেশীর ভাগই পুরুষ। আবার শিশু বা অল্প বয়সী রোগীর সংখ্যার খুবই কম। আমার জরিপ নমুনায়ন অনুযায়ী আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

২.১. বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো

কোন একটি বিষয়ের সঠিক সূচী হলো বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো তাই গবেষণার ক্ষেত্রে বয়লিঙ্গ কাঠামো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত আবশ্যিক। বয়লিঙ্গ কাঠামো বলতে নির্দিষ্ট বয়স গ্রুপের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মোট সংখ্যার শতকরা হার বা অনুপাতকে বোঝায়। অর্থাৎ কোন একটি জনসংখ্যায়, কোন বয়স শ্রেণীতে কতজন নারী এবং কতজন পুরুষ রয়েছে তার শতকরা ও সংখ্যা তাত্ত্বিক কাঠামোকে বয়স কাঠামো বলে, আমার গবেষণা প্রতিবেদনে বয়ঃলিঙ্গ কাঠামোর যে উপাত্ত পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ।

সারণী ৫.১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো

বয়স শ্রেণী	পুরুষ		মহিলা	
	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা
১৮-২৫	১৬	৭.৬৬	১৪	১৫.৩৮
২৬-৩০	১৩	৬.২২	৬	৬.৫৯
৩১-৩৫	২৫	১১.৯৬	১৫	১৬.৪৮
৩৬-৪০	৩০	১৪.৩৫	১৫	১৬.৪৮
৪১-৪৫	৩০	১৪.৩৫	১০	১০.৯৯
৪৬-৫০	৪৪	২১.০৫	১৪	১৫.৩৮
৫১-৫৫	১৫	৭.১৮	৬	৬.৫৯
৫৬-৬০	১৯	৯.০৯	৭	৭.৬৯
৬১+	১৭	৮.১৩	৪	৪.৪০
মোট	**২০৯**	**৬৯.৭**	**৯১**	**৩০.৩**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫

আক্রান্ত রোগীদের বয়সের গড়, মধ্যক, প্রচুরক ও পরিমিত ব্যবধান নিম্নরূপ

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারী রোগীদের গড় বয়স	৪৩.০৭ বছর
আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারী রোগীদের মধ্যমান বয়স	৪৪.৫০ বছর
আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারী রোগীদের প্রচুরক বয়স	৫০.০০ বছর
আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারী রোগীদের পরিমিত ব্যবধা বয়স	১২.০৩ বছর

Dhaka University Institutional Repository

আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের বয়ঃলিঙ্গ কাঠামো স্তম্ভ লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

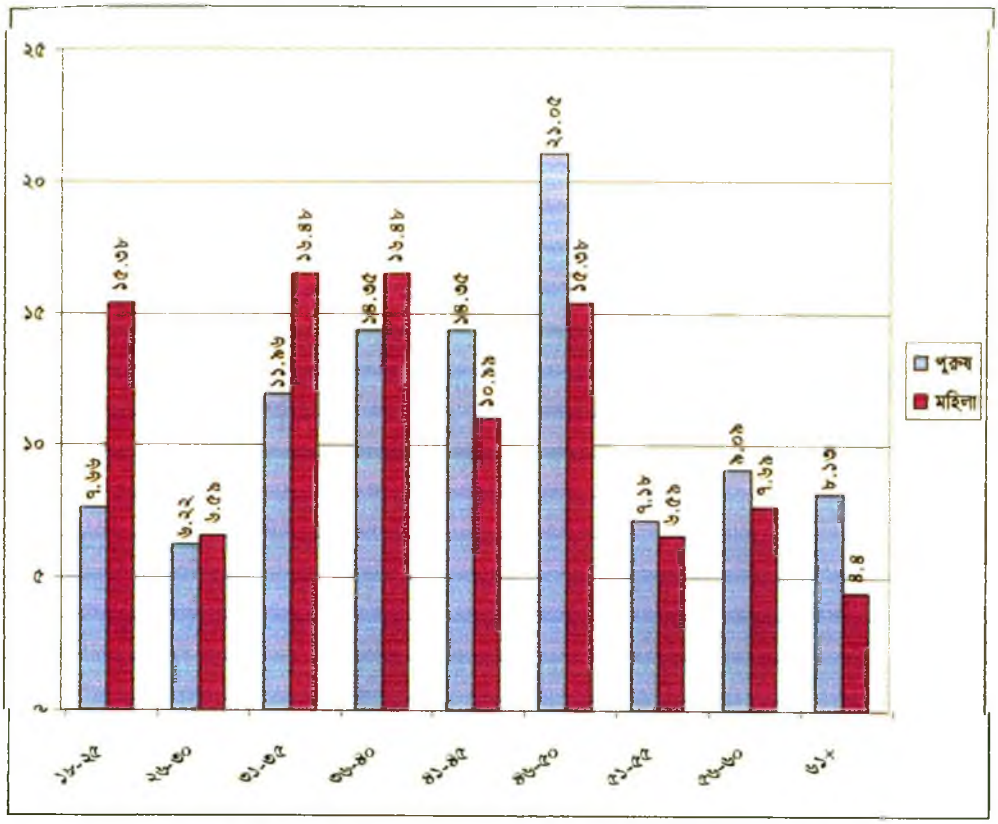

চিত্র ৫.১ ঃ আক্রান্ত রোগীদের বয়:লিঙ্গ কাঠামো

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৪৬-৫০ বছর বয়স লোকেরা বেশী আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত। যা মোট জরিপকৃত রোগীদের প্রায় ৩৬ শতাংশ। সবচেয়ে কম আক্রান্ত বয়স শ্রেণী হলো ২৬-৩০ ও ষাটোর্দ্ধ বয়সের নারী-পুরুষ। অর্থাৎ অতিরিক্ত ৩১-৫০ বছর বয়সীদের বেশী আক্রান্ত হবার প্রবণতা লক্ষণীয়। এরূপ হবার পেছনে কারণ হিসেবে দেখা গেছে অতিরিক্ত পরিশ্রম কিন্তু সেই অনুসারে খাদ্য গ্রহণ কম এবং পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, এবং আক্রান্ত।

জরিপে আরো ও লক্ষণীয় হলো মহিলাদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। অর্থাৎ ৬৯.৭% পুরুষ এবং ৩০.৩% মহিলা। এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে বলা যায় গবেষণা এলাকার মেয়েরা তুলনামূলক কম পরিশ্রমী। তাছাড়া তারা (মহিলা)। একই পরিবারে সদস্য হয়েও তাদের ক্যালোরী গ্রহণ মোটামুটি ভাল। তথ্যে আরো একটা বিষয় লক্ষণীয় পুরুষরা ৪৬-৫০ বয়স শ্রেণীতে

Dhaka University Institutional Repository

২১.০৫% আক্রান্ত, সেক্ষেত্রে মহিলারা ১৫.৩৮% আক্রান্ত। তবে ৩১-৪০ বয়স শ্রেণীতে মহিলারা সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত যার শতকরা হার ১৬.৪৮।

উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী রোগী পাওয়া গেছে ৫০ বছর বয়সী লোকদের মধ্যে। অর্থাৎ মোট ৩০০ জনের মধ্যে ৪৯ জনের বয়সই ৫০ বছর। আক্রান্তকারী রোগীদের গড় বয়স হচ্ছে ৪৩.০৭। কিন্তু রোগীদের বয়সের পরিমিত ব্যবধান হলো ১২.৯৩। অর্থাৎ গড় বয়স হতে অন্যান্য বয়স শ্রেণীর ব্যবধান ১২.৯৩ বছর।

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বয়সের সাথে আর্সেনিকোসিস রোগের তীব্রতা বা পর্যায়ের সম্পর্ক কতটুকু তা জানার জন্য আর্সেনিকোসিস রোগীদের বয়স ও তাদের রোগের তীব্রতার মধ্যে Chi-square পরীক্ষা করা হয়েছে। উহা নিম্নরূপ-

সারণী ৫.২ ঃ আক্রান্ত কারীদের বয়সের সাথে আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার সম্পর্ক

রোগীদের আর্সেনিকোসিসের পর্যায়	বয়স শ্রেণী									মোট
	১৮-২৫	২৬-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪০	৪১-৪৫	৪৬-৫০	৫১-৫৫	৫৬-৬০	৬১+	
প্রথম পর্যায় : ক্রনিক বা ধারাবাহিক বিষক্রিয়া	১৫	০৭	২৮	২১	২৩	৩৫	১৫	০৯	১৩	১৬৬
দ্বিতীয় পর্যায়: মাঝারি বিষক্রিয়া	১৪	১২	১১	২২	১৬	২০	০৫	১৭	০৮	১২৫
তৃতীয় পর্যায় : তীব্র বিষক্রিয়া	০১	০০	০১	০২	০১	০৩	০১	০০	০০	০৯
মোট	**৩০**	**১৯**	**৪০**	**৪৫**	**৪০**	**৫৮**	**২১**	**২৬**	**২১**	**৩০০**

Chi-square = 21.16; Degree of fredon= 16 ;Provability Value= 0.17

উৎস: মাঠ পর্যায়ে জরীপ, ২০০৫

আক্রান্ত কারীদের বয়স এবং তাদের আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার মধ্যে Chi-square পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে রোগীদের বয়সের পার্থক্যের সাথে তাদের আর্সেনিকোসিস হওয়ার বা তীব্রতার হওয়ার কোন সম্পর্ক বা সম্ভবনা নেই। কেননা Chi-square- এ সম্ভবনার গ্রহণীয় মান হলো ০.০৫। কিন্তু প্রদত্ত ক্ষেত্রে এই সম্পৃক্ততার মান এসেছে ০.১৭। ইহা কোন ক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়। এই সম্পৃক্ততা না থাকার পেছনে কিছু কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-

বয়স বাড়লো কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য ঠিকমত খেল অথবা তুলনামূলক কম মাত্রায় আর্সেনিকের বিষ গ্রহণ করল। সে ক্ষেত্রে একজন বেশী বয়সী লোক বেশী মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণকারী কম বয়সী লোক অপেক্ষা অল্প আক্রান্ত হতে পারে তাই বয়সের সাথে আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার মাত্রার তেমন একটা সম্পর্ক নেই।

আমাদের দেশের বিদ্যমান সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে এবং বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা অসচেতনতার কারণে দিনে দিনে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

আবার জরিপকৃত গবেষণা এলাকার মোট জনসংখ্যার নারী পুরুষের অনুপাতের সাথে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত নারী-পুরুষের অনুপাত দেখানো হলো ঃ

সারণী ৫.৩ ঃ শিবচরের মোট জনসংখ্যার নারী পুরুষ অনুপাত

জনসংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা হার	আক্রান্ত	শতকরা হার	জনসংখ্যা শতকরা হার
পুরুষ	১৫৭৫০২	৫১.৪৬	২০৯	৬৯.৬৭	০.১৩৩
মহিলা	১৪৮০৯৫	৪৮.৫৪	৯১	৩০.৩৩	০.০৬১
মোট	**৩০৬০৮২**	**১০০**	**৩০০**	**১০০**	**০.১৯৪**

উৎস ঃ Community Series: Madaripur and Field Survey, 2005.

সারণীতে লক্ষ্যণীয় গবেষণা এলাকার মোট জনসংখ্যার ০.১৯৪ মানুষ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। তার মধ্যে মোট পুরুষের ০.৩৩% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত এবং মোট মহিলাদের ০.০৬১% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। অর্থাৎ মোটের উপর তুলনা করলে, আক্রান্ত পুরুষ ঃ মোট পুরুষ= ৬৯.৬৭% ঃ ৫১.৪৬% এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত মহিলা ঃ মোট মহিলা = ৩০.৩৩% ঃ ৪৮.৫৪%। অর্থাৎ মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশী আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের এ তথ্য লক্ষণীয় হলো শিবচরের মোট পুরুষের মধ্যে ০.১৩৩ শতাংশ এবং মহিলাদের মধ্যে ০.০৬১ শতাংশ লোক ভয়াবহ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

গবেষণা এলাকার জরিপকৃত পরিবারগুলোর আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নিম্নরূপ চিত্র ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.৪ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার ও রোগীদের জনমিতিক চিত্র

পরিবারের সদস্য (রোগী)	পরিবার সংখ্যা	শতকরা হার	রোগীর সংখ্যা	শতকরা হার
এক জন রোগী	২৩৮	৮৮.৮১	২৩৮	৭৯.৩৩
দুই জন রোগী	২৮	১০.৪৫	৫৬	১৮.৬৭
তিন জন রোগী	২	০.৭৫	৬	০২.০০
মোট	**২৬৮ টি পরিবার**	**১০০.০০**	**৩০০ জন রোগী**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় শিবচরে মোট ২৬৮ টি পরিবারে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী আছে ৩০০ জন। যেখানে মোট পরিবারের সংখ্যা ৫৮০৮৫ টি। অর্থাৎ ০.৪৬ শতাংশ পরিবার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। এর মধ্যে ১ জন রোগী বিশিষ্ট পরিবার ২৩৮ টি, যা মোট আক্রান্ত পরিবারের ৮৮.৮১ শতাংশ। ২ জন করে লোক আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার ২৮টি বা ১০.৪৫% এবং ৩ জন করে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে ২৬৮ টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবারে বা ০.৭৫%।

৩. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বৈবাহিক অবস্থা

জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বৈবাহিক অবস্থা। জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থা বলতে অবিবাহিত, বিবাহিত, বিধবা ও তালাক প্রাপ্তদের অনুপাত কে বোঝায়। নমুনায়ন জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বৈবাহিক অবস্থা বেশ গুরুত্ব বহন করে। নিম্নে তালিকার মাধ্যমে এই বৈবাহিক অবস্থা দেখানো হলো ঃ

সারণী ৫.৫ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	রোগ সনাক্তের পূর্বে		রোগ সনাক্তের পরে		মোট রোগী	
	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা
অবিবাহিত	১৮	৬.০০	০০	০০	**১৮**	**৬.০০**
বিবাহিত	২৩১	৭৭.০০	৪৬	১৫.৩৩	**১২৩**	**৯২.৩৩**
তালাক প্রাপ্ত	০০	৮৩.০০	০৫	১.৬৭	**০৫**	**১.৬৭**
মোট	২৪৯	৮৩.০০	৫১	১৭.০০	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস: মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০০৫.

Dhaka University Institutional Repository

~~উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫~~।

উপরোক্ত সারণীতে রোগীদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৯২.৩ শতাংশ রোগীই বিবাহিত। ৬.০ শতাংশ রোগী অবিবাহিত এবং ১.৭ শতাংশ রোগী তালাক প্রাপ্ত। এই বিবাহিত রোগীদের ৭৭.০০% আর্সেনিকোসিস ধরা পড়ার আগেই বিয়ে হয়েছে এবং মাত্র ১৫.৩% রোগীদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে আর্সেনিকোসিস ধরা পড়ার পর। তবে বিয়ের পরও আর্সেনিকোসিসের কারণে এবং অন্যান্য সামাজিক কারণে ১.৮% রোগীদের তালাক প্রাপ্ত হয়েছে। বিষয়টা মোটেই সমাজের জন্য শোভনীয় নয়। এটি সমাজের কুসংস্কারের চরম পর্যায়ে পরে। এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সমাজ সংস্কার করতে হবে। এছাড়া সারণীতে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তাহলো জরিপকৃত বেশীর ভাগ রোগীর বয়সই বিবাহ অতিরিক্ত। সঙ্গত কারণেই আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণের পূর্বেই বিবাহিত। এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৪.৩.৪ পারিবারিক ধরণ

জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের আরো ও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিবারের ধরণ। অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যাই হলো পরিবারের ধরণ। পরিবারের ধরণের উপর পরিবারের আয়-ব্যয়, উপার্জনক্ষম লোক নির্ভরশীল লোক ইত্যাদি নির্ভর করে। নিম্নে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের ধরণ সংক্রান্ত একটি টেবিল দেওয়া হলো ঃ

সারণী ৫.৬ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবারের ধরণ

পরিবারের সদস্য	পরিবার সংখ্যা	শতকরা	জনসংখ্যা	শতকরা
১-২ জন বিশিষ্ট	১৮	০৬.৭২	৩৬	০২.৯০
৩-৪ জন বিশিষ্ট	১০৮	৪০.৩০	৩৮৩	৩০.৮৪
৫-৬ জন বিশিষ্ট	১২৩	৪৫.৮৯	৬৭৪	৫৪.২৬
৭+ জন বিশিষ্ট	১৯	০৭.০৯	১৪৯	১২.০০
মোট	**২৬৮**	**১০০.০০**	**১২৪২**	**১০০.০০**

প্রদত্ত জরিপের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে গবেষণা এলাকা শিবচর থানায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত বেশীর ভাগ রোগীদের পরিবার মাঝারী ও মাঝারী অপেক্ষা একটু বড়। ৫ থেকে ৬ জন

সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ১২৩ টি। যা মোট পরিবারের ৪৫.৮৯%। এর পরই আছে ৩ থেকে ৪ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবার যা মোট ১০৮টি এবং মোট পরিবারের ৪০.৩০%। সবচেয়ে কম সদস্য বিশিষ্ট পরিবার হলো ১-২ জন ও ৭ জনের ও বেশী সদস্যভূক্ত পরিবার। তবে ১ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার একেবারেই পাওয়া যায়নি। কিন্তু ১০ সদস্য বিশিষ্ট ২টি পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে মাত্র ১ জন করে সদস্য আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

উক্ত সারণীতে আরো ও লক্ষণীয় যে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত যে সব পরিবারে জরিপ করেছি। সে সব পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ১২৪২ জন। এর মধ্যে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী পেয়েছি ৩০০ জন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একই পণ্যে একই হাড়িতে খায় এমন সকল পরিবারের ২৪.১৫% সদস্য আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত এবং বাকীরা দিব্বি সুস্থ্য। কিন্তু তারাও ঝুকির মধ্যে। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা। কাজেই এই অবস্থার উপশোম বের করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

৫.৪. পরিবার প্রধান ও আক্রান্তকারীর পেশা বা আয়ের উৎস

যে কোন সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে, যাদের নিয়ে গবেষণা তাদের বিভিন্ন কাজ কর্ম তথা পেশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা পরিবার প্রধান এবং অন্যান্যদের পেশা ও আয়-রোজগারের উপর নির্ভর করে ঐ পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা। তেমনি আলোচ্য গবেষণায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পেশা ও তাদের পরিবার প্রধানে পেশা তথা আয় রোজগার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আয় রোজগার ভাল হলে পরিবার স্বচ্ছল হবে, পরিবার স্বচ্ছল হলে মানুষের জীবণ যাত্রার মান উন্নত হবে। জীবন যাত্রার মান উন্নত হলে মানুষেরখাবারের মান বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা পুষ্টিহীনতায় ভুগবে না। রোগ-ব্যধি কম হবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে। কাজেই পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নিম্নে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিবার প্রধানদের পেশা তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৫.৭ ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্তকারীদের প্রধান পেশা

পেশার ধরণ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষি কাজ	১০২	৩৪.০
কৃষি কাজ ও ভ্যান চালক	৩০	১০.০
ছোট ব্যাবসায়ী	২৭	০৯.০
মোটমুটি ব্যাবসায়ী	৪২	১৪.০
চাকুরীজীবি	১৭	৫.৭
গৃহিণী	৬৩	২১.০
ঝিয়ে কাজ / চাকরাণী	৪	০১.৩
দিন মজুর	১৫	৫.০
মোট	৩০০	১০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

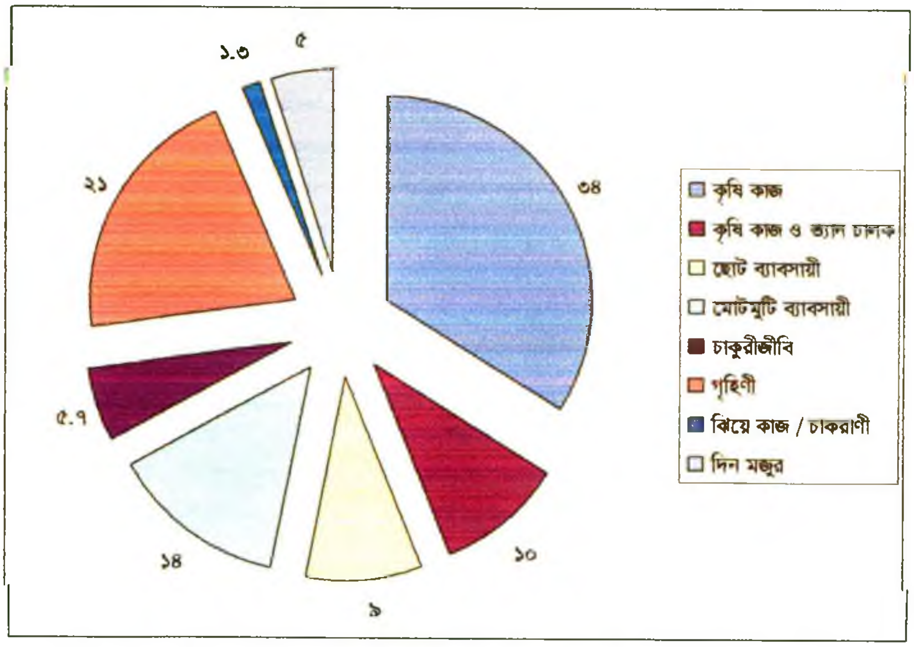

চিত্র

চিত্র ৫.২ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের প্রধান পেশা

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে বেশীর ভাগ লোকের পেশা মূলত প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পর্যায়ভূক্ত। অবশ্য অনেকে এরূপ একাধিক পেশার সাথে ও জড়িত। এরূপ ১০% রোগী আছে যাদের পেশা একাধিক। এরা কৃষি কাজ করে আবার সুযোগ পেলে ভ্যান চালায়। তবে এদের আয় খুব একটা বেশী নয়। জরিপকৃত তথ্যে রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ৩৪.০% রোগী কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং এদের মাসিক আয় ১০০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত। মহিলা রোগীদের মধ্যে বেশীর ভাগই গৃহিণী। মোট রোগীর প্রায় ২১.০০% গৃহিনী। যারা গৃহিণীর কাজে ব্যস্ত থাকে। এছাড়া ৪ জন মহিলা রোগী পাওয়া গেছে যারা বুয়া বা ঝিয়ের কাজের সাথে জড়িত। দিন মজুর কামলা দেওয়া পেশায় জড়িত রোগী পাওয়া গেছে মাত্র ১৫ জন বা ৫%। চাকরীজীবি পাওয়া গেছে মাত্র ১৭ জন ৫.৭%। ছোট ও মাঝারী পদের ব্যবসায়ী পাওয়া গেছে মোট ৬৯ জন। যা মোট রোগীর ২৩%। এদের আয় অন্যান্য পেশার লোকদের চেয়ে কিছু বেশী। অর্থাৎ এদের মাসিক আয় প্রায় ৫০০০-১০০০০ / ১৫০০০০ / ২০০০০ টাকা। অনেক রোগীই প্রতিদিন প্রচুর পরিশ্রম করে। কিন্তু সেই তুলনায় ভাল ও পুষ্টিকর খাবার খেতে সামর্থ হয় না। এরা সামাজিক কিছু বিষয়ে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও এদের পরিবার হতে রোগী-ব্যধি সারতে চায় না।

মানুষের পেশার সাথে আয় জড়িত। আর আয়ের সাথে সামাজিক অবস্থান তথা জীবন যাত্রার মান জড়িত। আর জীবন যাত্রার মানের সাথে মানুষের খাবার বৃদ্ধি, পুষ্টিগ্রহণ, শারীরিক সূস্থ্যতা ইত্যাদি জড়িত। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিবারের আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিম্নে আক্রান্তকারী রোগী তাদের পরিবারের মাসিক আয় সংক্রান্ত একটি সারণী প্রদত্ত হলো ঃ

সারণী ৫.৮ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী বা তাদের পরিবারের মাসিক আয়

আয়ের শ্রেণী	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
১৫০০-২০০০	৪০	১৩.৩৩
২০০১-৪০০০	১০৩	৩৪.৩৩
৪০০১-৬০০০	৮৯	২৯.৬৭
৬০০১-৮০০০	১৭	০৫.৬৭
৮০০১-১০০০০	৪৬	১৫.০৩
১০০০১+	০৫	০১.৬৭

Dhaka University Institutional Repository

আক্রান্ত রোগীদের আয়ের গড়=৫০৭২.৬৭ টাকা, আয়ের মধ্যক মান=৫০০০.০০ টাকা,
আয়ের প্রচুরক=৫০০০.০০ টাকা, পরিমিত ব্যবধান=৩০১৬.৭৩৮ টাকা,
সর্ব নিম্ন আয় হলো=১৫,০০০ টাকা, সবচেয়ে বেশী আয় হলো- ২০,০০০ টাকা

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

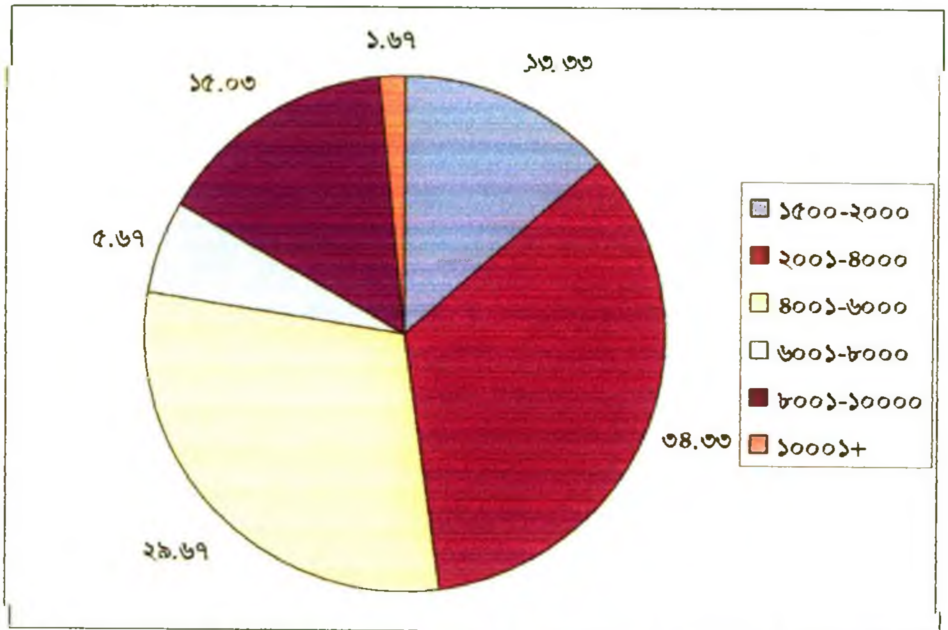

চিত্র ৫.৩ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী বা তাদের পরিবারের মাসিক আয়

উপরোক্ত সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা আয়ের সংখ্যা সর্বাধিক ৩৪.৩৩%। অর্থাৎ মাত্র ১.৬৭% রোগদের মাসিক আয় ১০০০০ টাকার বেশী এবং ৩৪.৩৩% রোগী যাদের মাসিক আয় ২০০০-৪০০০ টাকার মধ্যে ১০,০০০ টাকার উপরের আয়ের সংখ্যা অনেক কম যাদের গড় আয় ৫০৭২.৬৭ টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রোগী ৫০০০ টাকা আয় করে এবং এটি মধ্যম পর্যায়ের আয় ও বটে। রোগীদের গড় আয় হতে অন্যান্যদের আয়ের ব্যবধান হলো ৩৮১৬.৭৪ টাকা। ১ম ১৫০০-২০০০ টাকা আয়ের রোগীর সংখ্যা ৪০ জন। যা মোট রোগীর ১৩.৩৩% ভাগ। ৬০০০-৮০০০ টাকা আয়ের লোক সংখ্যা খুবই কম মাত্র ০৫%। অতএব আমরা বলতে পারি যে আয় রোজগার অনেকটা তার পেশা ও চরিত্রের উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয় আয়ের উপর ব্যয়ও নির্ভর করে। আর বেশী ব্যয় করার সমর্থ থাকলে খাদ্যের তাপ শক্তি বা কিলো-ক্যালোরি গ্রহণ ও বেশী হতে পারে। নিম্নে আয়ের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে তাপশক্তি বা কিলো- ক্যালোরি গ্রহণের মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা ? তা Chi-square পরীক্ষার মাধ্যমে দেখানো হল।

সারনী ৫.৯ ঃ আক্রান্ত রোগীদের আয়ের সাথে কিলো-ক্যালোরি গ্রহণের সম্পর্ক

আয়স্তর	রোগীদের কিলো-ক্যালোরি গ্রহণ					মোট
	১২০০-১৪০০	১৪০১-১৬০০	১৬০১-১৮০০	১৮০১-২০০০	২০০১+	
১৫০০-২০০০	১৭	১৪	০৯	০০	০০	৪০
২০০১-৪০০০	৩৩	৩৪	২৭	০৯	০০	১০৩
৪০০১-৬০০০	১৬	৩৮	৩৩	০১	০১	৮৯
৬০০১-৮০০০	০০	১৬	০০	০১	০০	১৭
৮০০১-১০,০০০	০০	২২	১৭	০৭	০০	৪৬
১০,০০১+	০১	০১	০৩	০০	০০	০৫
মোট	৬৭	১২৫	৮৯	১৮	০১	৩০০

Chi-square = 67; Degree of fredon= 20 ;Provability Value= 0.00

উৎস: মাঠ পর্যায়ে জরীপ, ২০০৫

উপরোক্ত সারনীর Chi-square পরীক্ষার মাধ্যমে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আয় ও তাদের দৈনিক গ্রহণীয় কিলো-ক্যালোরির মধ্যে যে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে তা উচ্চ মাত্রায় গ্রহণ কার যায়। কেননা Chi-square এ গ্রহণীয়তার মাত্রা = ০.০৫। কিন্তু প্রদত্ত সারনীতে সম্পৃক্ততার মান এসেছে ০.০০। এটি উচ্চ মাত্রায় গ্রহণীয়। অর্থ্যাৎ রোগীদের আয়ের সাথে কিলো-ক্যালোরি গ্রহণের মধ্যে উচ্চ মাত্রায় সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা যাদের আয় একটু বেশী তারা ভাল ও উন্নত মানের খানা খাদ্য খায়। কাজেই আয়ের সাথে ক্যালোরি গ্রহণের জোড়ালো সম্পর্ক বিদ্যমান।

৬. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ধর্মীয় পটভূমি

যে কোন একটি জনসমষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ সহ অন্যান্য আচার-আচরণেও কিছুটা তফাৎ রয়েছে। আর এই ভিন্নতা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ সেহেতু এখানে মোট জনসংখ্যার ৯০% ই মুসলিম। আমার গবেষণা জরিপের নমুনায় যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ।

সারণী ৫.১০ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ধর্মের ধরণ

ধর্মের ধরণ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
ইসলাম	২৩৯	৭৯.৭
হিন্দু	৬১	২০.৩
মোট	**৩০০**	**১০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

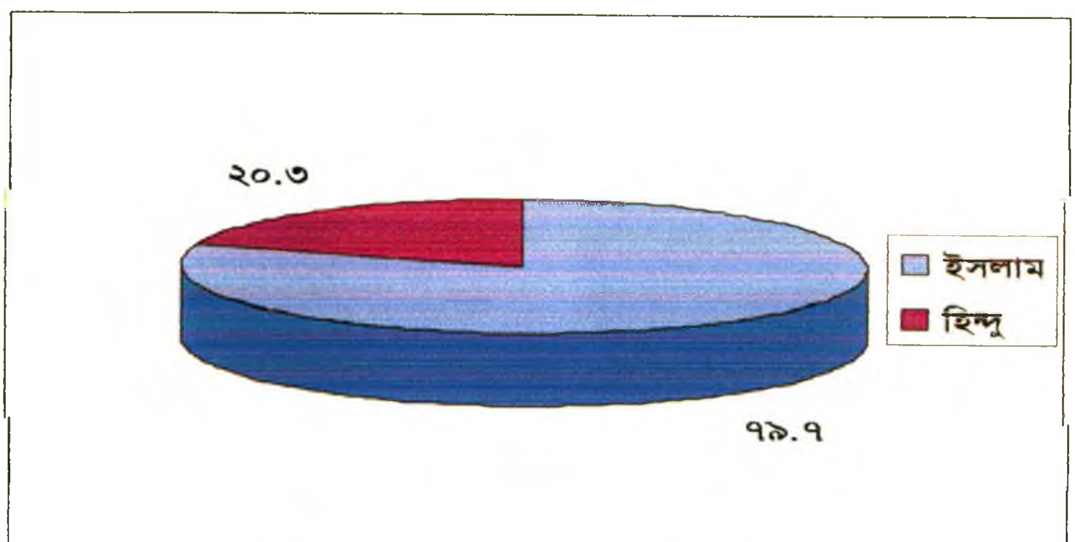

চিত্র ৫.৪ : আক্রাম্ত্মকারীদের ধর্মের ধরন

উপরিল্লিখিত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকা সত্ত্বেও এখানে মাত্র দুটি ধর্মের লোকের তথ্য পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের লোক ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের আর্সেনিকোসিস রোগী নমুনা জরিপে পাওয়া যায়নি।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে ইসলাম ধর্মে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অত্যধিক। যা মোট রোগীর ৭৯.৭% এবং হিন্দু ধর্মের রোগীর সংখ্যা খুবই কম, মাত্র ২০.৩%। অর্থাৎ মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের আর্সেনিকোসিসে কম আক্রান্ত হওয়ার বেশ কিছু কারণ ও রয়েছে। যেমন- এখানকার হিন্দুরা বেশী নিরামিশ ভোজী। অর্থাৎ শাক সবজী এরা বেশী খায়। ফলে তাদের শরীর ও তুলনামূলক ভাল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও সম্ভবত এদের বেশী। শুধু তাই নয় হিন্দুদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অনেকটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার চিত্র ও নমুনায়ন পাওয়া গেছে। সর্বোপরি গবেষনা এলাকার হিন্দুরা স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে বেশী সতর্ক।

৭. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার স্তর

শিক্ষা যে কোন জাতীয় উন্নয়নে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। এজন্য শিক্ষাকে জাতীর মেরুদন্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মেরুদন্ড না থাকলে মানুষ যেমন অচল। তেমনই শিক্ষা না থাকলে সেই জাতী অচল। এছাড়া শিক্ষার সাথে মানুষের আয় রোজগার জীবণ যাত্রার মান, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি জড়িত। এই গবেষণা কাজের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তা হলো

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত :রোগীদের শিক্ষার স্তর নিম্নরূপ ।

সারণী ৫.১১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার স্তর

শিক্ষার স্তর	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
অশিক্ষা	৭৫	২৫.০
শুধু নাম দস্তখত	৬৬	২২.০
প্রাথমিক	৮৪	২৮.০
মাধ্যমিক	৪৮	১৬.০
উচ্চ মাধ্যমিক	২৭	৯.০
মোট =	৩০০	১০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

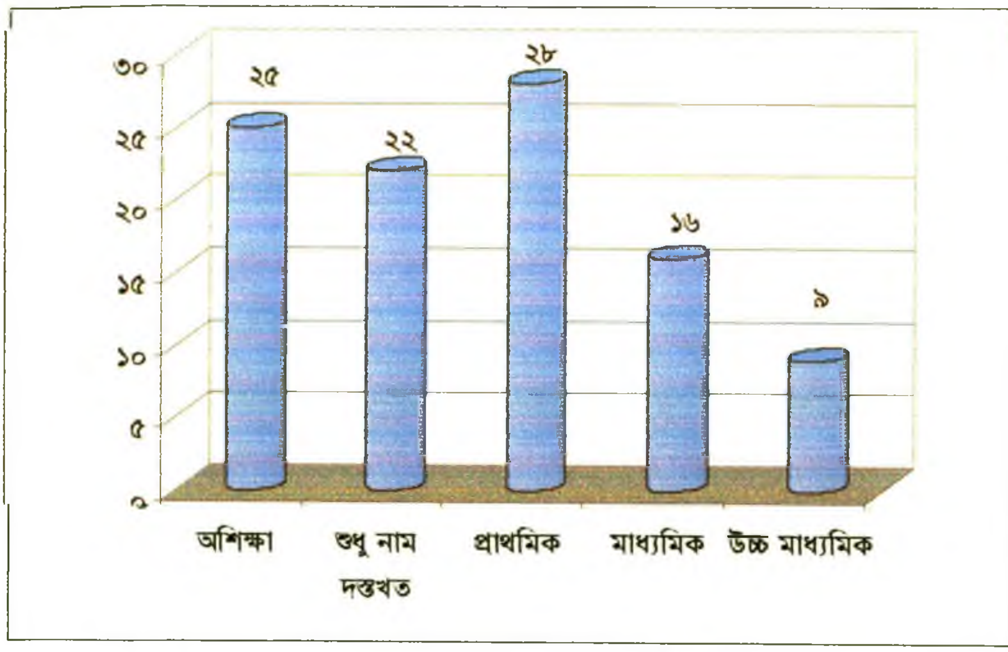

চিত্র ৫.৫ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার স্তর।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষার মান খুবই খারাপ। এখানে প্রায় ২৫% রোগী কোন লেখাপড়াই জানে না। ২২% রোগী শুধু মাত্র নাম দস্তখত দিতে পারে। অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর রোগীই মূলত অশিক্ষিত পর্যায়ভূক্ত। প্রাথমিক বা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে এবং পরবর্তিতে ঝড়ে গেছে এমন রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক যা মোট রোগীর শতকরা ২৮ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস এমন রোগীর সংখ্যা খুবই কম। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে এমন রোগীর সংখ্যা ৪৮ জন। এদের শতকরা হার ১৬% এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাস বা পড়ছে এদের শতকরা হার মাত্র ৯% অর্থাৎ অশিক্ষাও আর্সেনিকোসিস হওয়ার জন্য একটি সহায়ক কারণ।

৮. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। এদেশে অধিকাংশ লোকই দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কম। মাথাপিছু আয় কম বলে প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক অবস্থা বেশী ভাল না। গ্রামীণ জনপদের আর্থিক অবস্থা আরো ও শোচনীয়। কেননা আর্থিক অবস্থা বলতে আমরা বুঝে থাকি, কোন ব্যক্তি/বা পরিবার বা দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা উন্নত বা অনুন্নত। আর এটি মূলত জানা যায় কোন জনসমষ্টির আয়-ব্যায়ের হিসেব থেকে। অতএব বোঝা যাচ্ছে পারিবারিক আয় কোন একটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্দেশ করে থাকে। আর এই আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ঐ পরিবারের সদস্যদের জীবন যাত্রা, শিক্ষা-দিক্ষা রোগ-শোক, চিকিৎসা, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি। সংগত কারণেই এই গবেষণা প্রতিবেদনে শিবচর থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন; তা আলোচিত হয়েছে। যার কিছু তথ্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসিক আয়ের এই তথ্য হতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আক্রান্ত রোগীদের কোন

Dhaka University Institutional Repository

একটি পরিবারই আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল নয়। তবে দু-চারটি পরিবার রয়েছে যাদের পরিবার প্রধান ও অন্যান্যদের পেশা ব্যবসা। অর্থাৎ যাদের পরিবারের মাসিক আয় ২০,০০০/- টাকার মত। তাদের পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল। অবশ্য এই শ্রেণীর পরিবারকে মধ্যবিত্ত পরিবার বললে অযৌক্তিক হবে না। এছাড়া প্রায় সব পরিবারই আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল। যাদের পরিবারের মাসিক আয় ১৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা। এদেরকে নিম্নবিত্তের পরিবার বলা হয়। শিবচরে উচ্চ বিত্ত কোন পরিবারেই আর্সেনিকোসিস রোগী পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ পরিবারই দরীদ্রসীমার নীচে বাস করে। রোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে অধিকাংশ পরিবারে পুষ্টিহীনতার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি দরিদ্র পরিবারগুলোতে শিক্ষার অবস্থা ও ভাল নয়। এমতাবস্থায় দরিদ্র পরিবারগুলো নোংরা পরিবেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। অস্বাস্থকর পরিবেশের কারণে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যধি দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় কোন পরিবারের স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা সেই পরিবারকে উন্নত বা অনুন্নত জীবনযাত্রাকে প্রতিফলিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. আর্সেনিকোসিস রোগ সংক্রান্ত বিবরাবলী

আর্সেনিকোসিস সমস্যা বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ সমস্যা। প্রতি বছর প্রায় লক্ষাধিক লোক এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গবেষণা এলাকা শিবচরের নলকূপে যে হারে আর্সেনিক ধরা পড়ছে তাতে এই থানার রোগীর সংখ্যা প্রায় হাজারে পৌছিবে। পৃথিবীর অনেক দেশই বাংলাদেশের আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস সমস্যাকে রাশিয়ার চেরনোবিল বা ভারতের ভূ-পালের পারমাণবিক বিপর্যয়ের চেয়ে ভয়ানক বলে মনে করছেন। গবেষণা এলাকার প্রাথমিক জরিপে দেখা গেছে অনেক লোকের হাতে ও পায়ে ম্যালানোসিস নামক আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। এছাড়া লিউকো-ম্যালানোসিস, ক্যারাটোসিস, গ্যাংগ্রিন আরো অনেক প্রকার আর্সেনিকোসিস দ্বারা আক্রান্ত। এই দূষণ এবং বিপর্যয় মানব সৃষ্ট অথবা প্রকৃতি সৃষ্ট যাই হোক না কেন ? এই রোগের যথাযথ সনাক্তকরণ মূল্যায়ণ ও তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা আমাদের তথা সরকারের গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূপরিবেশীক অবস্থা আজ ব্যাপকহুমকির মুখোমুখি।

যেহেতু আর্সেনিকোসিস সমস্যা বাংলাদেশে রাশিয়ার চেরনোবিল সমস্যার চেয়েও ভয়াবহ এবং আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের এই সমস্যা ইতিহাসের বৃহত্তম দূর্যোগ বলে আখ্যায়িত। তারা বলেছেন এরুপ সমস্যা আমেরিকাতে ঘটলে ন্যাশনাল গাট ডাকা হত। অর্থাৎ বাংলাদেশের আর্সেনিকোসিস সমস্যা সত্যিকার অর্থেই একটি মেডিকেল ইমার্জেনসি।

১.১. আর্সেনিকোসিস

দীর্ঘমেয়াদী আর্সেনিক বিষক্রিয়া যাকে বলা হচ্ছে আর্সেনিকোসিস। অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে কোন ব্যক্তি আর্সেনিক দূষিত পানি পান বা অন্য কোন উপায়ে আর্সেনিকের বিষ বারে বারে গ্রহণ করতে থাকলে তিনি দীর্ঘমেয়াদী আর্সেনিক বিষক্রিয়ার শিকার হবেন এবং আর্সেনিকোসিস নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে এক পর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। দীর্ঘদিন ধরে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে শরীরে বিষক্রিয়া স্বরূপ যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে আর্সেনিকোসিস বলে। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস একটি দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা যেখানে একজন লোক দীর্ঘদিন (৬ মাস বা তারও অধিক সময়) ধরে নিরাপদ মাত্রার চেয়ে অধিক আর্সেনিক গ্রহণ করছে, ফলস্বরূপ তার ত্বকে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ ফুটে উঠে এবং সেই সাথে আভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়ে ক্যান্সার হতে পারে।
[ডা. এম.এম. হক, ২০০২ : ২৮]

১.২. আর্সেনিকোসিসকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাজনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি

আর্সেনিকোসিস যেহেতু একটি দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা তাই সময়ানুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ে এর উপসর্গ ও লক্ষণের বিভিন্নতা আছে। কিন্তু আর্সেনিকোসিসকে বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়-এ নির্দিষ্ট ভাবে বিভক্তি করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতামতের কারণে এই বিভক্তি আরও জটিল হয়েছে। কেউ একে বিভক্ত করেছেন (১) লক্ষণ পূর্ব আর্সেনিকোসিস (Preclinical / Subclinical) ও (২) লক্ষণ পরবর্তী (Clinical) আর্সেনিকোসিস-এ কেউ করেছেন (১) প্রাথমিক (Early) পর্যায় ও (২) পরবর্তী (Late) পর্যায়-এ; কেউ আবার একে (১) প্রথম পর্যায় (২) দ্বিতীয় পর্যায় ও (৩) তৃতীয় পর্যায় এভাবে।

২. বিভিন্ন পর্যায়ে আর্সেনিকোসিসের উপসর্গ ও লক্ষণ সমূহ [ডা. এম.এম. হক, ২০০২ : ২৮]

২.১. লক্ষণ পূর্ব পর্যায়

১) এই পর্যায়ে কোন শারিরীক উপসর্গ বা লক্ষণ থাকবেনা।

২) তবে রোগীর ৬ মাস বা তারও বেশি দিন ধরে নিরাপদ মাত্রার অধিক আর্সেনিক গ্রহণের ইতিহাস পাওয়া যাবে।

৩) কোষ কলায় (চুল, নখ ও ত্বকে) অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব।

২.২. লক্ষণ পরবর্তী পর্যায়

ক) প্রথম পর্যায় ঃ

১। ত্বকের বর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ত্বকে কালো ফোটা ফোটা দাগ দেখা যায় যাকে মেলানোসিস বলে। মেলানোসিস সাধারণত বুক, পিঠ, হাত ও পায়ের তালু, জিহ্বা ও দাঁতের মাড়িতে হয়ে থাকে। আলাদা আলাদা ভাবে শরীরের কিছু জায়গায় অথবা সারা শরীরে মেলানোসিস হতে পারে।

২। চামড়া, হাত ও পায়ের তালু শক্ত, খসখসে ও কিছুটা পুরু হয়ে যায়। একে কেরাটোসিস বলে।

৩। চোখের কনজাংটিভায় প্রদাহ দেখা দেয়।

৪। শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে খসখসে কাশি, ফুসফুসের প্রদাহ, শ্বাসনালীর প্রদাহ হতে পারে।

৫। সর্বোপরি শারীরিক দুর্বলতা ও ক্ষুধামন্দা হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

১। ত্বকে কালো কালো দাগের ভেতর সাদা সাদা ফোটা দেখা যায় যাকে লিউকোসেলানোসিস বলা হয়।

২। ত্বকের গুরুত্ব অস্বাভাবিক বেড়ে যায় আরও বেশি শক্ত ও খসখসে মনে হয়। হাত ও পায়ের তালুতে শক্ত শক্ত গুটি দেখা যায় যাকে নডিওলার হাইপার কেরাটোসিস বলে।

৩। পা ফুলে গিয়ে ইডেম হয়। এটি নন পিটিং ধরণের ইডেমা।

৪। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে জটিলতা দেখা দেয়। যেমন অবশতা, ঝিনঝিন করা বা তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া। কোন কোন মাংসপেশীতে ব্যাথা, দূর্বলতা এবং হাত পায়ে অবসন্নতা দেখা দেয়।

৫। যকৃতীয় জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেখানে যকৃতের স্থানে স্পর্শে বা চাপে ব্যাথা অনুভূত হয়। আকার বড় হতে পারে এবং জন্ডিস দেখা দিতে পারে।

৬। বৃক্কের জটিলতা হতে পারে।

গ) তৃতীয় বা জটিল পর্যায় ঃ

এই পর্যায়ে উপরোক্ত সকল উপসর্গ ও লক্ষণ আরো তীব্র, আরো জটিল আকার ধারণ করে। সেই সাথে প্রান্তীয় রক্তনালী আক্রান্ত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ বিশেষত হাত ও পায়ে পচন বা গ্যাংগ্রীন হতে পারে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশেষত ত্বক, মূত্রথলি, ফুসফুস, যকৃত, প্রোটেট ইত্যাদিতে ক্যান্সার হতে পারে, সম্প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণের সমন্বিত মতামতের ভিত্তিতে আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ ও উপসর্গ সমূহকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. ত্বকে প্রকাশ পাওয়া আর্সেনিকোসিসের প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গ

[ডা. এম.এম. হক, ২০০২ : ২৮]

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী সনাক্তকরণে প্রাথমিক ভাবে ত্বকে প্রকাশ পাওয়া লক্ষণ সমূহকে বিবেচনায় নিতে হবে, কেননা দেখা গেছে প্রায় সকল আর্সেনিকোসিস রোগীই ত্বকে বিভিন্ন লক্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং আমি ও ত্বকের সমস্যার সূত্র ধরে আর্সেনিকোসিস রোগীসনাক্ত করেছি। তাছাড়া ত্বকের লক্ষণ ব্যতীত যে সকল আর্সেনিকোসিস রোগী খুজে পেয়েছি তাদের ও অবশ্যম্ভাবী ত্বকে নানা লক্ষণ ও উপসর্গ ফুটে ওঠে। যেমন-

অ. পৃ. দ্র

Dhaka University Institutional Repository

ক) ত্বক ও ঝিল্লি (মিউকাস) পর্দার বর্ণ পরিবর্তন ঃ এক্ষেত্রে ত্বক অতিরিক্ত কালচে রূপ ধারণ করে (মেলানোসিস), ত্বকে কালো কালো দাগের ভেতর সাদা সাদা ফোটার মত দাগ দেখা যায় (লিউকো মেলানোসিস)।

খ) ত্বকের পুরুত্ব বৃদ্ধি ঃ এক্ষেত্রে চমড়া, হাত ও পায়ের তালু শক্ত, খসখসে ও কিছুটা পুরু হয়ে যায় (হাইপার কেরাটোসিস)।

৩.১. ত্বকে প্রকাশ পাওয়া মেলানোসিসের ধাপ সমূহ

ক) প্রাথমিক পর্যায় ঃ হাতের তালু, শরীর ও ঝিল্লি পর্দায় (যেমন দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা, মুখগহ্বরের ভেতরের আবরণ) ছড়ানো ছিটানো বা ফোটা ফোটা কালচে দাগ দেখা যেতে পারে।

খ) পরবর্তী পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় সেগুলো আরো গাঢ় হয় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পরে।

৩.২. লিউকোমেলানোসিস

ত্বকের কালো কালো দাগের ভেতর সাদাটে ফোটা ফোটা দাগ দেখা যায়, যা দেখতে ধুলিময় পথে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হলে যেমনটা দেখায় অনেকটা স্বরূপ। লিউকোমেলানোসিস মেলানোসিস সহযোগেই প্রকাশ পায়।

৩.৩. ত্বকে প্রকাশ পাওয়া হাইপোরকেরাটোসিসের ধাপ সমূহ

ত্বকের হাইপারকেবাটোসিস বা হাইপারফেরাটিনাইজেশন বলতে বোঝায়, চামড়া, হাত ও পায়ের তালু অস্বাভাবিক শুকনো, খসখসে ও পুরু হয়ে যাওয়া, সাধারণত শরীরের উভয় অর্ধাংশেই এই লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক) প্রাথমিক পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে স্পষ্ট দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন হয় না। তবে হাত ও পায়ের তালুতে সামান্য অণুভব করা যায় এমন এক ধরনের পুরু ও খসখসে ভাব।

খ) মাঝারি পর্যায় ঃ এই সময়ে হাত ও পায়ের তালুতে দৃশ্যমান এবং একই সাথে বিস্তৃত বা ছড়ানো ছিটানো পুরু ও খসখসে ভাব ভালভাবে অনুভব করা যায়।

গ) তীব্র পর্যায় ঃ এই পর্যায়ে হাত ও পায়ের তালু এবং শরীরের অন্যান্য অংশ ও আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে উক্ত স্থানগুলোতে বেশ কিছু উঁচু খসখসে দাগ ছাড়াও কিছু উঁচু গুটি গুটি অচিলের মত অবস্থা দেখা যায় যা গুচ্ছাকারে অথবা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

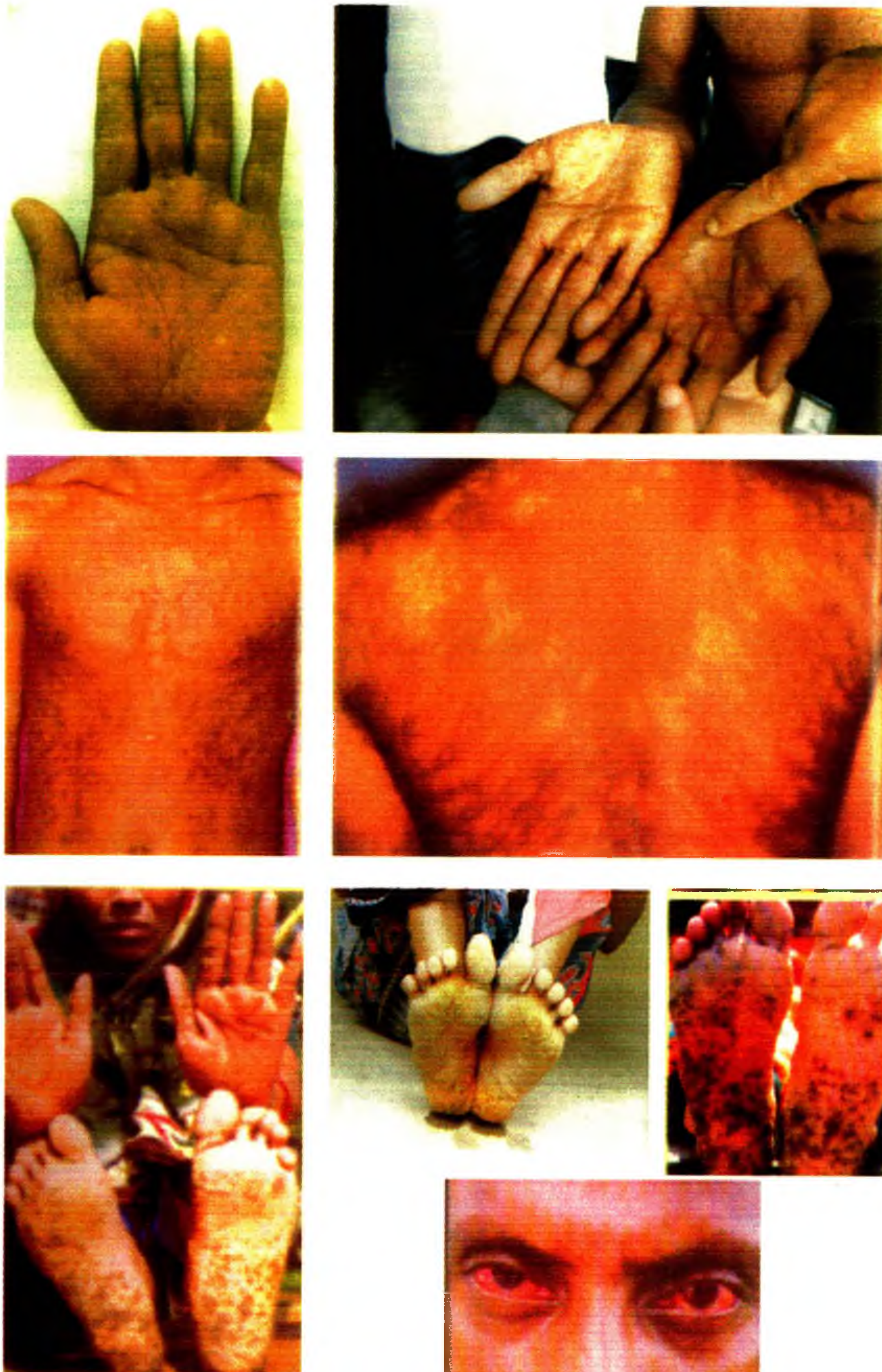

আলোকচিত্র ৬.১ ঃ আর্সেনিকোসিস রোগীদের সনাক্তকরণের ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

আলোক চিত্র ৬.২ ঃ গবেষণা এলাকার আর্সেনিকোসিস রোগীদের ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ত্বক ব্যতীত অন্যত্র দেখা দেওয়া প্রধান লক্ষণসমূহ [ডা.এম.এম.হক,২০০২: ২৮]

- শারীরিক দূর্বলতা।
- চোখের কনজাংটিভাইটিস প্রদাহ।
- শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা-যেমন দীর্ঘদিন কাশি, শ্বাসনালীতে প্রদাহ (ব্রংকাইটিস), হাঁপানি ইত্যাদি।
- প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা যেমন ঝিন ঝিন করা, অবশতা জ্বালাপোড়ার মত অনুভূতি ও ব্যথা হওয়া।

৫. মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণ ও চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে

[ডা.এম.এম.হক,২০০২: ২৮]

আর্সেনিকোসিস রোগের লক্ষণ যদিও নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে তবুও মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কিছু লক্ষণকে বিবেচনা করা হয়। যেমন-

- **রোগীর ইতিহাস (History)** ঃ কমপক্ষে ছয়মাস বা তারও অধিক সময় ধরে আর্সেনিক দূষিত পানি (১০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে) গ্রহনের ইতিহাস।
- **ডাক্তারী পরীক্ষা (Clinical Examination)** ঃ আর্সেনিকোসিসের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা লক্ষণ ও উপসর্গপূর্ণ ত্বককে সাধারণ আলোয় না দেখে পরোক্ষ বা প্রতিফলিত আলোয় রেখে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- **সূর্যালোক দ্বারা পরীক্ষা** ঃ মেলানোসিস আছে বা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য মূলত, সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না শরীরের এমন জায়গুলো যেমন বুকের মাঝ খানে, পেট, পিঠের সামনের ও পিছনের অংশ, হাতের তালু, পায়ের তালু ইত্যাদি ভাল ভাবে খতিয়ে দেখা।
- **লিউকোমেলানোসিস পরীক্ষা** ঃ লিউকোমেলানোসিস পর্যবেক্ষণের জন্য বা এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শরীরের সামনের ও পেছনের অংশ এবং উভয় উরু ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- **হাইপার কেরাটোসিস পরীক্ষা** ঃ হাইপার কেরাটোসিস পর্যবেক্ষণের জন্য হাত ও পায়ের তালুতে শক্ত খসখসে গুটি গুটি বা আচিলের মত কোন ক্ষত আছে কিনা তা

দেখতে হবে। যদি তেমন কিছু সৃষ্টি ও দৃশ্যমান না হয় তাহলে হাত ও পায়ের তালুতে হাত বুলিয়ে বিশেষ করে তালুর মাঝখানে ও প্রান্ত ভাগে কোন পুরু খসখসে ভাব বা অসামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা ভালভাবে দেখা।

- **মেলানোসিস-কেরাটোসিস পরীক্ষা ঃ** রোগীর শরীরে হয় মেলানোসিস (শরীরে কালো ফোঁটা ফোঁটা দাগ) নতুবা কেরাটোসিস (হাতের বা পায়ের তালু শক্ত, খসখসে হওয়া বা গুটিগুটি উঠা ইত্যাদি) অথবা একই সাথে উভয় লক্ষণেরউপস্থিতি আছে কিনা তা ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- ত্বক ব্যতীত শরীরের অন্যত্র দেখা লক্ষণ বা উপসর্গ পরীক্ষা করা।
- আর্সেনিকোসিস সম্পর্কিত অন্য কোন জটিলতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- আর্সেনিকোসিসের উক্ত লক্ষণ সমূহ সাধারণত রোগীর শরীরের ডান বাম উভয় পাশেই ভাল ভাবে দেখা।

৬. গবেষণা এলাকায় সনাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের পর্যায়

যেহেতু আর্সেনিকোসিস একটি দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা তাই সমায়ানুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ে এর বিভিন্ন লক্ষণ ফুটে ওঠে। পূর্বে উল্লেখিত আর্সেনিকোসিসের বিভিন্ন লক্ষণ ও উপসর্গের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে যে সকল রোগী চিহ্নিত করেছি সেগুলো মূলত নিম্নরূপ।

সারণী ৬.১ ঃ সনাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিস

আর্সেনিকোসিস	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
মেলানোসিস	৬২	২০.৬৭
কেরাটোসিস	৯৩	৩১.০০
কনজাংটিভাইটিস	৯	৩.০০
ব্রংকাইটিস জিহ্বার ক্ষত	২	০.৬৭
লিউকো মেলানোসিস	৫৮	১৯.৩৩
নডিওলার হাইপার কেরাটোসিস	৬৭	২২.৩৩
গ্যাংগ্রীণ	৯	৩.০০
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

নিম্নে সনাক্তকৃত রোগীদের বিভিন্ন রকম আর্সেনিকোসিস চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

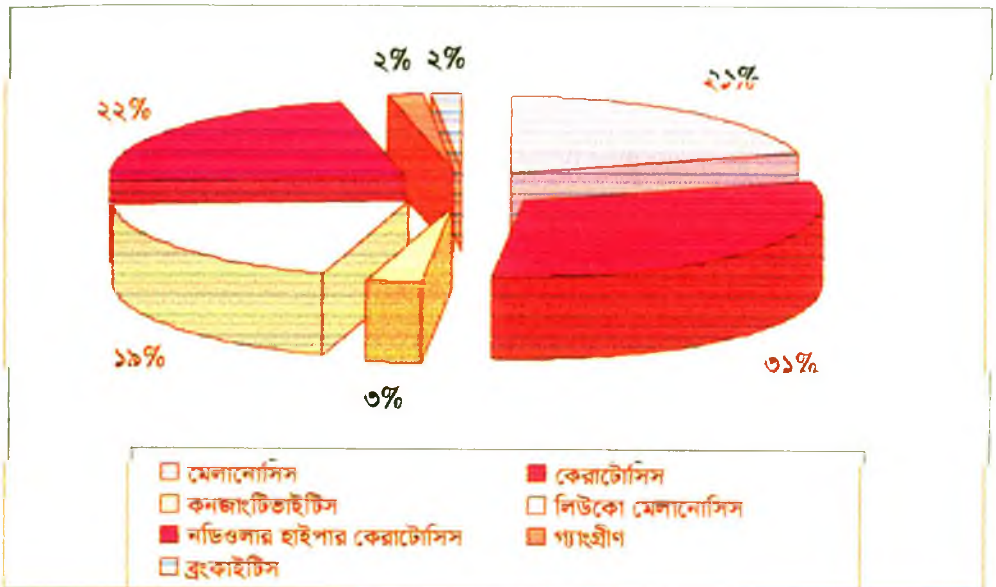

চিত্র ৬.১ ঃ সনাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিস

আর্সেনিকোসিসের উপরোক্ত নামগুলো রোগীদের বিভিন্ন উপসর্গের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে আমি রোগীর ঠিকানা জানার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে তথ্য সূত্র ব্যবহার করেছি। অর্থ্যাৎ ইউনিসেপের সহায়তায় ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতাল ও গন উন্নয়ন প্রচেষ্টা নামক এন.জি.ও. প্রাথমিক ভাবে শিবচর থানার আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করে। কিন্তু কি ধরণের আর্সেনিকোসিস হয়েছে তা তারা উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র তারা আর্সেনিকোসিস রোগী কি না তাই সনাক্ত করে তাদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। আমি উক্ত সূত্র ধরেই চিহ্নিত রোগীর কাছে গিয়েছি। তবে সকল ক্ষেত্রে আর্সেনিকোসিসের লক্ষণানুসারে সার্বিক রোগী খুঁজে পাইনি। সেক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে আমাকে আরো বেশী কষ্ট করে রোগী সনাক্ত করতে হয়েছে। রোগী সনাক্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন লক্ষণ ও উপসর্গের ভিত্তিতে যে সকল আর্সেনিকোসিস রোগী পেয়েছি তাই উক্ত টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে লক্ষণ পরবর্তী পর্যায়ের আর্সেনিকোসিসের মেলানোসিস পর্যায়ে রোগী পাওয়া গেছে ৩০০ জনের মধ্যে ৬২ জন। যাদের ত্বকের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে এবং ত্বকে কালো কালো ফোটা ফোটা দাগ দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ২১% রোগীর বুক, পিঠ, হাত-পায়ের তালু জিহ্বা ও দাতের মাড়িতে মেলানোসিসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। মেলানোসিস পর্যায়টি আরো ঘনিভূত ও গাঢ় হয়ে রোগীর শরীরের চামড়া, হাত ও পায়ের তালু শক্ত, খসখসে ও কিছুটা পুরু হয়ে আর্সেনিকোসিসের কেরাটোসিস পর্যায়ে গিয়েছে এরূপ রোগীর সংখ্যাই সর্বাধিক। মোট রোগীর ৩১% ই কেরাটোসিস আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। এরপর চোখ লাল বর্ণ হয়ে স্থায়ী জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়ে কনজাংটিভায় প্রদাহ নামক আর্সেনিকোসিস

হয়েছে এমন রোগী পাওয়া গেছে ৯ জন। অর্থাৎ ৩% রোগী আর্সেনিকোসিস এরূপ সমস্যায় ভূগছে।

ত্বকের কালো কালো দাগের ভেতর সাদাটে ফোটা, যাকে ধুলিময় পথে গুড়িগুড়ি বৃষ্টির ফোটা পড়লে যেরূপ দেখার তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এমন লক্ষণ সম্পৃক্ত লিউকোমেলানোসিস রোগী পাওয়া গেছে ১৯.৩৩%। আর্সেনিকোসিস রোগীদের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে নডিওলার হাইপার কেরাটোসিস জাতীয় রোগী। মোট ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ৬৭ জনই হল নডিও হাইপার কেরাটোসিস লক্ষণযুক্ত রোগী। যাদের ত্বকের পুরুত্ব অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। হাত ও পায়ের তালুতে শক্ত ও খসখসে গুটিগুটি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ এরূপ আক্রান্ত রোগীর পরিমাণ শতকরা ২২.৩৩ জন। গ্যাংগ্রীণ হলো আর্সেনিকোসিসের একটি মারাত্মক পর্যায়। এ পর্যায়ে রোগীর রক্ত আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে (হাত ও পায়ের নখসহ অন্যান্য স্থানে) পচন শুরু হয়। যা পরিণামে ক্যান্সারে রূপ নেয়। এরূপ পর্যায়ের রোগী পেয়েছি ৯ জন। যা শতকরা হিসেবে দাড়ায় ৩%। অর্থাৎ ৩% রোগী প্রায় মৃতুকোলে। এ পর্যায়ে আরোও এক প্রকার আর্সেনিকোসিস রোগীপাওয়া গেছে; যাকে বলা হয় ব্রংকাইটিস। এদের শ্বাসতন্ত্রে দীর্ঘস্থায়ী বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যেমন-দীর্ঘমেয়াদী কাশি, শ্বাসনালিতে প্রদাহ, হাঁপানী ইত্যাদি এরূপ রোগী পেয়েছি মাত্র ২ জন।যা শতকরা হিসেবে ০.৬৭%।

425546

৬.১. তীব্রতা অনুসারে সনাক্তকৃত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের পর্যায়

উপরোক্ত আর্সেনিকোসিস রোগীদেরকে যদি আমরা আর্সেনিকোসিসের তীব্রতা ও ঝুঁকি অনুসারে সাজাই তাহলে আর্সেনিকোসিসের তিনটি পর্যায় বা ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধাপ বা পর্যায়গুলো হলো-

ক। প্রথম পর্যায়।

খ। দ্বিতীয় বা মাঝারি পর্যায়।

গ। তৃতীয় বা জটিল বা তীব্র পর্যায়।

অপর পৃষ্ঠায়--আর্সেনিকোসিস রোগীদের আক্রান্তের ঝুঁকি অনুসারে আর্সেনিকোসিসের বিভিন্ন পর্যায়ভূক্ত একটি সারণী উল্লেখ করা হলো।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সারণী ৬.২ ঃ আর্সেনিকোসিসের তীব্রতানুসারে চিহ্নিত রোগীদের আর্সেনিকোসিস পর্যায়সমূহ

আর্সেনিকোসিসের পর্যায়	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
ক) প্রথম পর্যায় ঃ [মেলানোসিস, কেরাটোসিস কনজাংটিভাইটিস]	১৬৬	৫৫.৩৩
খ) দ্বিতীয় বা মাঝারি পর্যায়ঃ [লিউকোমেলানোসিস, নডিওলার হাইপার কেরাটোসিস, ব্রংকাইটিস, জিহ্ববার ক্ষত]	১২৫	৪১.৬৬
গ) তৃতীয় বা জটিল পর্যায় ঃ [গ্যাংগ্রীণ ও ক্যান্সার]	৯	৩.০০
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

নিম্নে আর্সেনিকোসিসের ঝুকি বা পর্যায় চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো

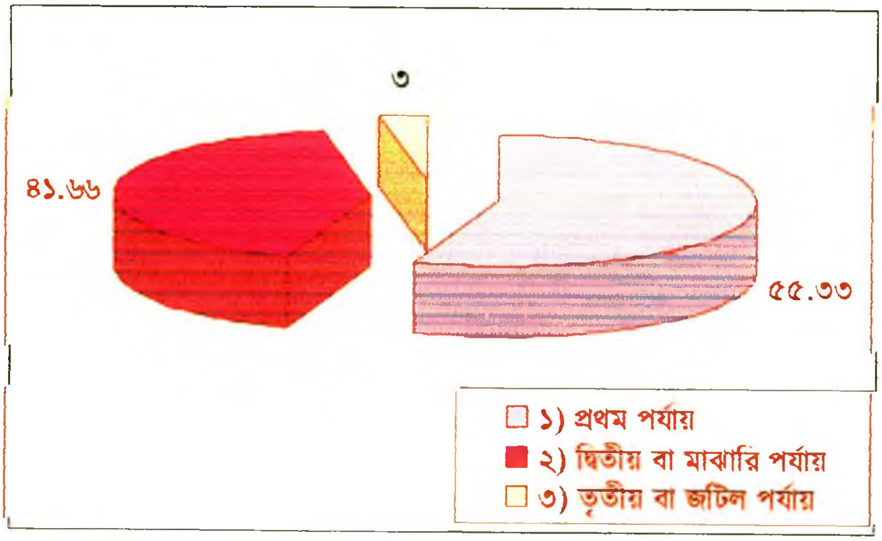

চিত্র ৬.২ ঃ তীব্রতানুসারে রোগীদের আর্সেনিকোসিসের পর্যায়সমূহ

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে আর্সেনিকোসিসের ১ম পর্যায়ে অর্থাৎ যাদের আর্সেনিকোসিসটা মেলানোসিস, কেরাটোসিস এবং কনজাংটিভাইটিস-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এরূপ রোগীর সন্ধান মিলেছে ১৬৪ জনের। অর্থাৎ শতকরা ৫৪.৬৭% রোগী। যারা

আর্সেনিকোসিসের প্রথম পর্যায়ের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ঝুঁকির মধ্যে আছে ১২৫ জন বা ৪১.৬৬% রোগী। যাদের আর্সেনিকোসিসটা লিউকোমেলানোসিস ও নডিওলার হাইপার কেরাটোসিস পর্যায়ে পৌছে গেছে। আর তৃতীয় পর্যায় বা ঝুঁকির শেষ পর্যায়ে পৌছে গেছে শিবচর থানার ৩.৬৭% রোগী। যাদের হাত ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে পচন শুরু হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো গ্যাংগ্রীণ পর্যায়ের ৩ জন রোগী আমার সনাক্তকরণের ও তথ্য সংগ্রহের ৩ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে। স্পটে গিয়ে ছবি তুলে আনার জন্য উক্ত রোগীদের বাড়িতে সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম কয়েকদিন আগে তাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতেচাইলে বৌশর ভাগ লোকই জানালো রোগীর হাতে পয়ের ঘা তথা শরীরের মধ্যেও নাকি ঘা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সেগুলো (ঘা) ক্যান্সারে রূপ নিয়ে আর্সেনিকে কেড়ে নিয়েছে শিবচরের তিনটি প্রাণ। যাদের বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ এর মধ্যে এবং এই তিনজনের ২ জন হল পুরুষ এবং ১ জন স্ত্রী লোক। আর্সেনিকোসিসের এই তীব্র ভয়াবহতা হতে আমাদের এখন হতেই সাবধান হতে হবে।

৭. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস সংক্রান্ত জ্ঞান এবং আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণে তাদের ভূমিকা

জীবমন্ডলের সর্বত্র আর্সেনিকের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীনকালে আর্সেনিক ঔষধ ও বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। আমাদের দেশে গ্রাম বাংলায় আর্সেনিক সেকো বিষ হিসেবেও পরিচিত। King of poison হিসেবে আর্সেনিকের ব্যবহার বহুকাল আগে হতেই মানুষ জানত। দীর্ঘদিন ধরে এই বিষের প্রতিক্রিয়া হয় বলে একে Slow Poisioning ও বলা হয়ে থাকে। আর ইংরেজরা এই মৃদু বিষ প্রয়োগেই হত্যা করেছিল ফ্রান্সের বিশ্ববিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে।

বাংলাদেশে এই King of Poison এর উৎস হলো ভূ-গর্ভস্থ পানি। কিন্তু ৭০ ও ৮০ দশকে এই নলকুপের পানিকে নিরাপদ পানি হিসেবে ধরা হতো। ১৯৯৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় কিছু অগভীর নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণীত হয় এবং প্রথম আর্সেনিকোসিস রোগীর সন্ধান ও মেলে একই জেলার রাজারামপুর গ্রামে আব্দুল মতিনের সমস্ত শরীর ও হাতে পায়ে।

১৯৯৩ সাল আজ হতে প্রায় ১৩ বছর পূর্বের কথা এবং ১৯৯৭ সালে পানি বিশেষজ্ঞ আমজাদ হোসেন তার গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণের কথা বলেছেন। ২০০০ সাল হতেই বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে

এবং আর্সেনিক যুক্ত পানি পান হতে বিরত থাকতে হবে এরূপ অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে দেশ বাসীকে জানানো হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আমার গবেষণা এলাকার সনাক্তকৃত আর্সেনিকোসিস রোগীরা আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিসের নাম শুনেছে মাত্র বছর তিনেক আগে। তাদের (রোগীদের) নিজেদের শরীরে ভয়াবহ পর্যায়ে আসেনিকোসিসের লক্ষণ রয়েছে এটাও তারা নিজেরা সনাক্ত করতে পারে নাই। আর্সেনিকোসিস রোগ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আক্রান্ত রোগীদের ভূমিকা সংক্রান্ত একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

সারণী ৬.৩ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ ধরা পরার সময়কাল

সময়কাল (বছর)	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
২ বছর পূর্বে (২০০৩ সাল)	৩২	১০.৬৭
৩ বছর পূর্বে (২০০২ সাল)	১৪১	৪৭.০০
৪ বছর পূর্বে (২০০১ সাল)	১০৭	৩৫.৬৭
৫ বছর পূর্বে (২০০০ সাল)	২০	৬.৬৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

নিম্নে বিষয়টি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

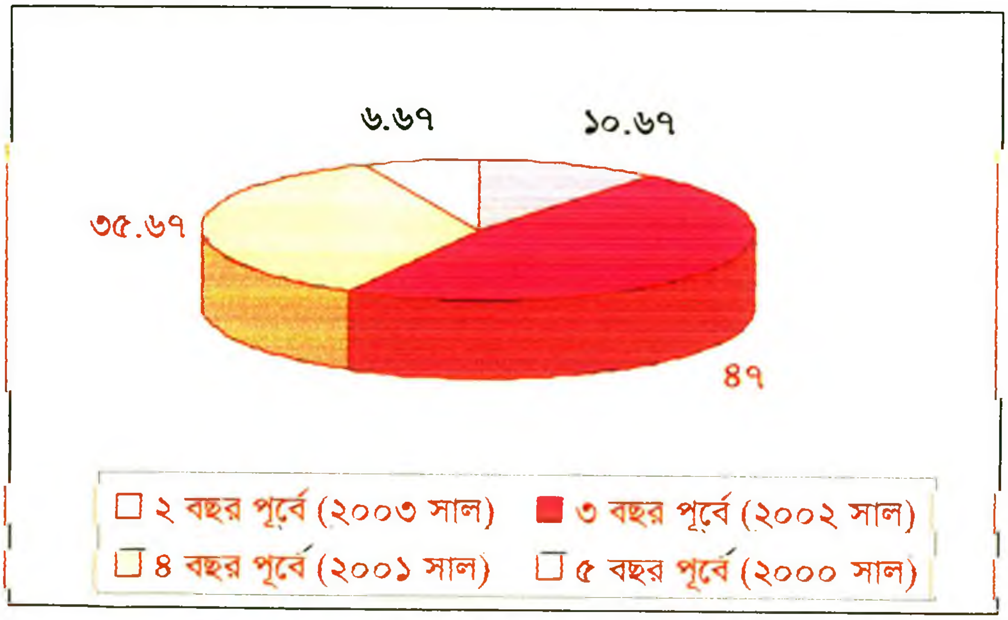

চিত্র ৬.৩ ঃ রোগীদের আর্সেনিকোসিসের নাম যানার সময়কাল

সারণী ৬.৪ ঃ আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আক্রান্ত রোগীদের ভূমিকা

সনাক্তকরণ ভূমিকা	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
নিজেই	৪৮	১৬.০০
অপরাপর লোক	২৫২	৮৪.০০
মোট	৩০০	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

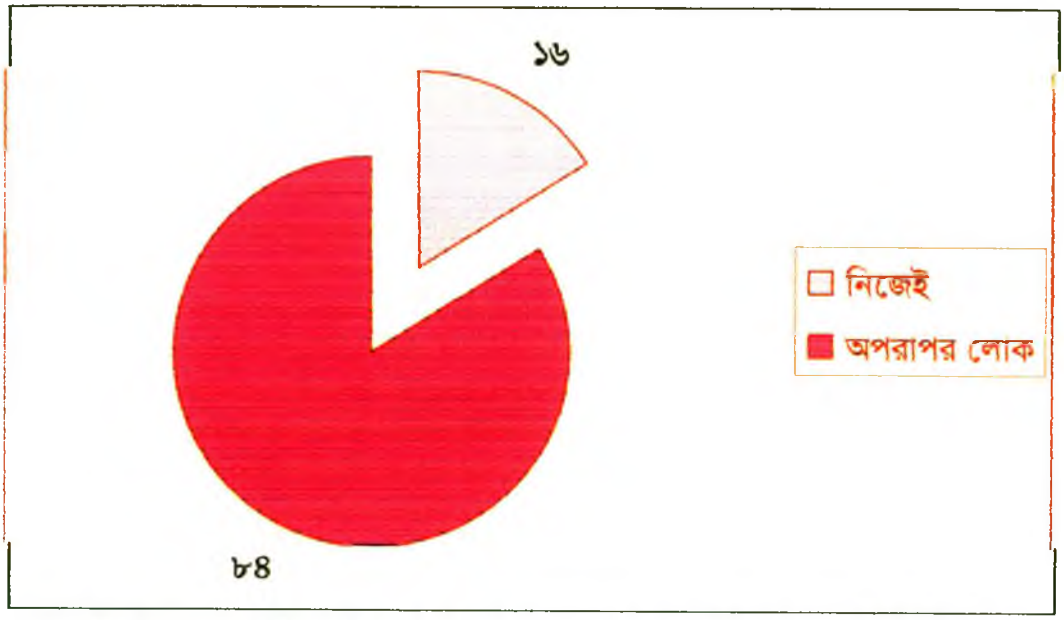

চিত্র ৬.৪ ঃ আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আক্রান্ত রোগীদের ভূমিকা

উপরের ৬.৩ নং সারণীতে লক্ষণীয় যে বেশীর ভাগ রোগীই তাদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করতে পেরেছে ২০০২ সালে। যদিও ২০০০ সাল হতেই আর্সেনিকোসিসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যপকভাবে প্রচার প্রচারণা চালনা হচ্ছে। মাত্র ৬.৬৭% রোগী ২০০ সালে তার আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করতে পেরেছে। তথাপিও রোগীদের সচেতনতার একটা বিষয় থেকে যায় তাহলো খুব কম সংখ্যক রোগী নিজেরা তাদের আর্সেনিকোসিস হয়েছে এ বিষয়টি ধরতে পেরেছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে ৩০০ জন রোগীর মধ্যে মাত্র ৪৮ জন রোগী অর্থাৎ ১৬% রোগী তাদের নিজেদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করতে পেরেছে। বাকী ৮৪% রোগীই তাদের নিজেদের রোগ নিজেরা সনাক্ত করতে পারে নাই। ৬.৩ নং টেবিলে ২০০১ সালে আর্সেনিকোসিসের নাম শুনেছে মাত্র ৩৫.৬৭% রোগী, ২০০২ সালে শুনেছে ৪৭.০০%, রোগী ২০০৩ সালে শুনেছে ১০.৬৭% রোগী। দেখা যাচ্ছে বেশীর ভাগ লোকের আর্সেনিকোসিস বিষয়ে তেমন সচেতনতা নেই। আবার লক্ষণ

সনাক্তকরণে রোগীরা নিজেরাই কতটুকু ভূমিকা রেখেছেন সে বিষয়ে তথ্যে দেখা যাচ্ছে মাত্র ১৬% রোগী নিজেরা নিজেদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করেছেন এবং ৮৪% রোগীর আর্সেনিকোসিসই অন্যান্যরা সনাক্ত করেছেন। রোগীদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী, এন.জি.ও কর্মী, ডাক্তার,হেকিম,কবিরাজ ইত্যাদিরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ৬.৫ ঃ রোগীদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের ভূমিকা

আর্সেনিকোসিসে সনাক্তকরণের মাধ্যমে (অন্যান্য)	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
বন্ধু-বান্ধব	১৪	৪.৭
পাড়া-প্রতিবেশী	২৮	৯.৩
গ্রাম্য ডাক্তার	১৬	৫.৩
সরকারী (MBBS) ডাক্তার	১৫	৫.০
হেকিম, কবিরাজ, হোমিও ডাক্তার	২	০.৭
এন.জি.ও কর্মী	১৭৪	৫৮.০
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	৩	১.০
প্রযোজ্য নয় (নিজেরাই)	৪৮	১৬.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

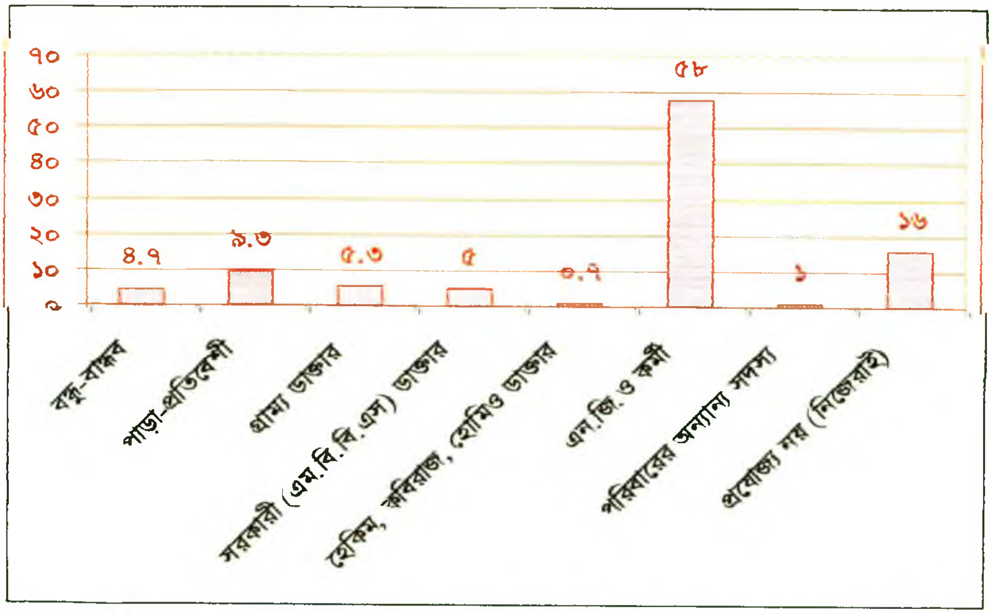

চিত্র ৬.৫ ঃ রোগীদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে আর্সেনিকোসিস সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের ভূমিকার ক্ষেত্রে ৮৪% সনাক্তকারীদের মধ্যে ৪.৭% আর্সেনিকোসিস সনাক্তকারী হলো রোগীদের বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীরা হচ্ছে ৯.৩%, রোগীদের আর্সেনিকোসিস হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য ডাক্তারদের নিকট গিয়েছিল ১০.৩% রোগী। এর মধ্যে ৫.৩% আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করেছেন গ্রাম্য ডাক্তারা এবং ৫% রোগীর রোগ সনাক্ত করেছেন সরকারী এম.বি.বি.এস ডাক্তাররা। হোমিওপ্যাথী ও অন্যান্য ডাক্তাররাও রোগিদের আর্সেনিকোসিস হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সামান্য ভূমিকা রেখেছেন। তবে এদের পরিমাণ খুবই কম, মাত্র ০.৭%। এই গবেষনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, রোগীদের আর্সেনিকোসিস সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা রখেছেন এন.জি.ও কর্মীরা এবং এন.জি.ও. টার নাম হলো গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা। অবশ্য এই এন.জি.ও কর্মীদের নাম বেশী আসার পেছনে কিছু সুস্পষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। তাহলো গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা শিবচরে আর্সেনিক মেটিগেশনের উপর কাজ করেছেন। এলাকায় ইউনিসেফের সহযোগীতায় বেশ কিছু আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন করে দিয়েছে তাছাড়া আর্সেনিক মুক্ত বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য সিমেন্টের তৈরী রিজার্ভার তৈরী করে দিয়েছেন। সর্বোপরি তারাই গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় জানতে পেরেছি এন.জি.ও কর্মীরা যাওয়ার আগে অনেক রোগীই আর্সেনিক বা আর্সেনিকোসিসের নামই শোনেনি। ৫৮% রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে এন.জি.ও কর্মীরা প্রথমে তাদের শরীরে বা হাতে পায়ের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করেছেন। রোগীদের সচেতনতার ক্ষেত্রে আরোও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে তা হলো ঃ এই রোগকে আক্রান্ত রোগীরা কেমনভাবে দেখেছে। অর্থাৎ এই রোগের ঝুঁকি তাদের কাছে কতটুকু তা জানতে চাওয়া হলে আক্রান্ত রোগীরা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেছেন।

সারণী ৬.৬ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের নিকট আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকি

আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকি	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
খুব কম ঝুঁকি পূর্ণ	৩৩	১১.০
কম ঝুঁকি পূর্ণ	৫৪	১৮.০
মাঝারী ঝুঁকি পূর্ণ	১২২	৪০.৭
বেশী ঝুঁকি পূর্ণ	৮১	২৭.০
খুব বেশী ঝুঁকি পূর্ণ	১০	৩.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

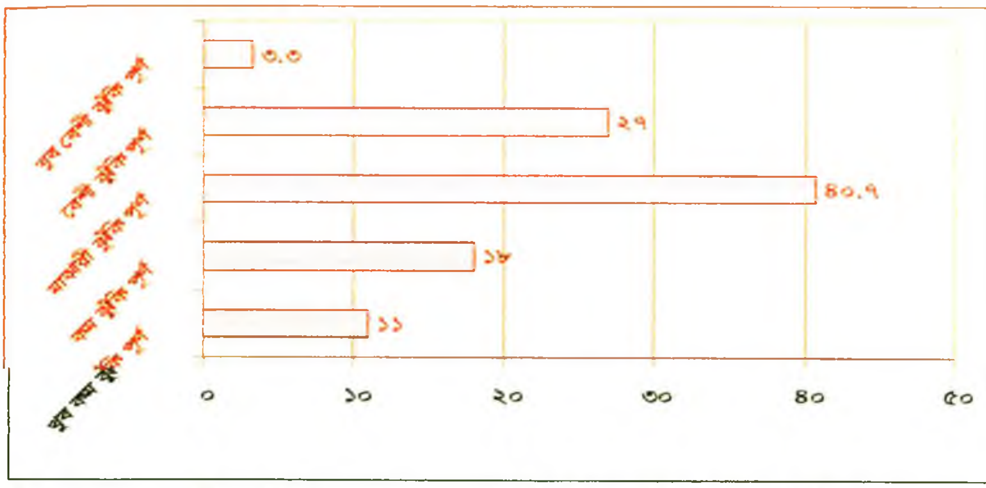

চিত্র ৬.৬ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের নিকট আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকি

উপরোক্ত সারণী অনুসারে বলা যায় যে, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা এই রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে খুব একটা সচেতন নয়। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস যে একটা মারাত্মক রোগ এবং এই রোগে আক্রান্ত হয়ে জটিল পর্যায়ে পৌছালে মৃত্যু অবধারিত সে সম্পর্কে রোগীরা মোটেই অবগত নয়। সারণীতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৩.৩% রোগী, আর্সেনিকোসিস রোগকে মারাত্মক রোগ বলে মনে করে। ৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন রোগী বলেছেন এই রোগটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এই রোগ মাঝারী ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ। অর্থাৎ যারা এখনও আর্সেনিক যুক্ত পানি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করছে তাদের সংখ্যা ৩০০ জনের মধ্যে ১২২ জন। অর্থাৎ ৪০.৭% রোগী এই রোগকে মাঝারী ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ রোগ বলে মনে করেন। এই রোগে মোটেই ঝুঁকি নাই এমন কথা কোন রোগী না বললেও এর কাছাকাছি কথা বলেছে ১১% রোগী। তাদের মতে এই ঝুঁকি আছে তবে তা খুবই সামান্য। তাদের ধারণাএই রোগ হলে কখন ও মানুষ মরে না। আমাদের বাপ-দাদারা ঐ কলের পানি খেয়ে আসছে সারা জীবণ কই তাদের তো মৃত্যু হলো অন্য রোগে। এই পানি খেলে ঘা-পাচরা হতে পারে তবে সেটা একটু সাবধান হলেই সেরে যাবে এরূপ মন্তব্য করেছে ১১% রোগী। সামান্যতম ঝুঁকি আর্সেনিকোসিসের আছে এমন ধারণা কিছু রোগী পোষণ করেছেন তবে তাদের সংখ্যাও কম নয় ১৮% রোগী বলেছে আর্সেনিকোসিস রোগের সামান্য ঝুঁকি আছে। এরাও এক ধরনের অসচেতন লোক বলা চলে। মাঝারী ধরণের ঝুঁকি এই রোগে আছে এমন ধারণা পোষণ করেছে সবচেয়ে বেশী রোগী। যাদের শতকরা হার ৪০.৭% মোটামুটি বেশী ঝুঁকি রয়েছে এই রোগে এমন ধারণাও বেশ কিছু রোগী পোষণ করেছেন। অর্থাৎ ২৭% রোগী বলেছেন আর্সেনিকোসিস রোগটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটি রোগ এই রোগে অনেক মানুষ মরেছে এবং ভবিষ্যতেও মরবে।

সার্বিক আলোচনায় বলা যায়, শিবচর থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা তাদের নিজেদের আর্সেনিকোসিস হয়েছে সেটি সনাক্ত করণে নিজেরা তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারেন নাই। নিজেরা ব্যতীত অন্যান্য যারা তাদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করেছেন সে ক্ষেত্রে ডাক্তাররাও তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি। শুধুমাত্র আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করণের জন্য যখন একটি এন.জি.ও মাঠ পর্যায়ে রোগী সনাক্ত করেন এবং তারাই বলে দিয়ে এসেছেন যে প্রদত্ত ব্যক্তিদের আর্সেনিকোসিস রোগ হয়েছে এবং বেশীর ভাগ রোগী এই এন.জি.ও কর্মীদের নিকট হতে আর্সেনিক বা আর্সেনিকোসিসের নাম শুনেছেন। আর এদের পরিমাণ হলো শতকরা ৫৮%।

৮. আর্সেনিকোসিস রোগীদের গ্রহণীয় চিকিৎসা বনাম প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা

আর্সেনিকোসিসের কোন সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও আবিস্কৃত হয়নি। প্রাথমিক চিকিৎসা তথা আর্সেনিকোসিসের মূল চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আর্সেনিক আক্রান্ত পানি গ্রহণ বন্ধ করে আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পান করা। প্রচলিত খাদ্যাভ্যাগের কিছু পরিবর্তন এনে, আমাদের দেশের সহজলভ্য কিছু প্রোটিন, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই ইত্যাদি জাতীয় খাবার বেশী খাওয়া। একই সাথে এ লক্ষে ব্যাপক ভিত্তিতে জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্ম দিতে হবে, যাতে করে সকলে আর্সেনিকোসিসের কারণ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু এই গবেষণা প্রাপ্ত তথ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পানি পানের সচেতনতা রোগীদের মধ্যে খুবই কম, আর্সেনিকোসিস তথা স্বাস্থ্য সচেতনতাও রোগীদের মধ্যে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। আর এই রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রোগীরা যা কিছু করেছে তার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী ৬.৭ ঃ আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর রোগীদের করণীয় কাজ

রোগীদের করণীয় কাজ বা যা করেছে	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
কিছুই করেন নাই	৪৯	১৬.৩
গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসানিয়েছে	৬৭	২২.৩
সরকারী (MBBS) ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়েছে	১৭৯	৫৯.৭
হেকিম কবিরাজ/হোমিও চিকিৎসা নিয়েছে	৫	১.৭
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

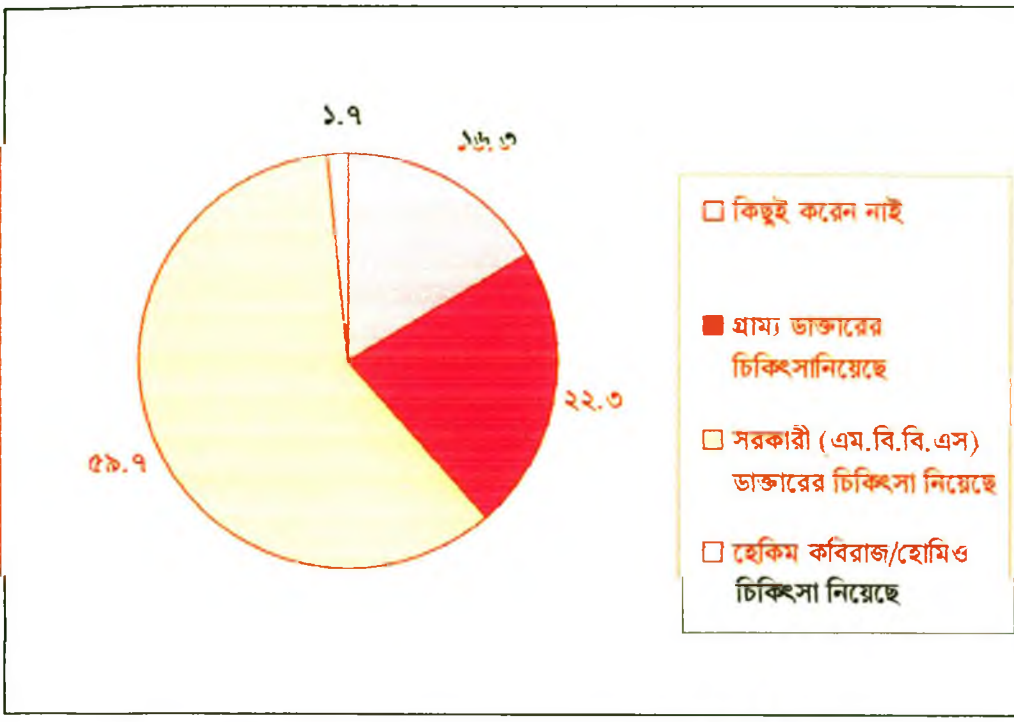

চিত্র ৬.৭ ঃ আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর রোগীদের করণীয় কাজ

উপরের সারণীতে লক্ষণীয় যে ১৬.৩% রোগী তাদের রোগ ধরা পরার পর। অর্থাৎ তাদের আর্সেনিকোসিস হয়েছে বিষয়টি জেনেও তারা সেই রোগের কোন পাত্তা দিচ্ছে না। তাই তারা রোগ চিকিৎসার জন্য নিজেরা তো কিছু করেনই নাই অন্যান্যদের (ডাক্তার, শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ইত্যাদি) কোন পরামর্শও তারা শোনেন নাই। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আর্সেনিকোসিসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ১৬.৩% রোগীদের কোন জ্ঞানই নেই।

আর্সেনিকোসিস হয়েছে এমন কথা শুনে বা জেনে গ্রাম্য ডাক্তারের নিকট গিয়েছে এবং তাদের পরামর্শ নিয়েছে এমন রোগীর সংখ্যা ৩০০ জনের মধ্যে ৬৭ জন। যা শতকরা হিসেবে দাঁড়ায় ২২.৩%। অনুরূপ হোমিও ডাক্তার বা কবিরাজের নিকট গিয়েছে ৫ জন রোগী। অর্থাৎ গ্রাম্য ডাক্তার, হেকিম কবিরাজ ও হোমিও ডাক্তারের নিকট গিয়েছে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিচ্ছে এমন রোগীরা হলো ২৪%। অবশ্য চিকিৎসা সচেতনতার একটা বড় দিকও উক্ত সারণীতে ফুটে উঠেছে তা হলো সরকারী হাসপাতালের এম.বি.বি.এস ডাক্তারদের নিকট চিকিৎসার জন্য অথবা পরামর্শের জন্য গিয়েছে বেশীর ভাগ রোগী। সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৫৯.৭% রোগী তাদের আর্সেনিকোসিস চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষুধ ও অন্যান্য খানা-খাদ্য খাচ্ছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে অবশ্য একটি

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় জানতে পেরেছি। তা হলো N.G.O কর্মীরা যাদের আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করেছে তাদেরকে Provit নামক Antioxident ভিটামিন দিয়ে এসেছিল এবং বলে এসেছিল এটিতে না কমলে সরকারী হাসপাতালে যাবেন সেখানে আরো ফ্রি ঔষুধ দিবে। এরূপ পরামর্শের ভিত্তিতে অনেকে সরকারী হাসপাতালে গিয়েছে এবং ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসরণ করেছে। তথাপিও সবকিছু বাদ দিয়ে প্রায় ৬০% রোগী রেজিষ্টারভূক্ত ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে চিকিৎসা সচেতনই বলতে হবে।

উক্ত সকল চিকিৎসা নেওয়ার পরও কোন রোগীরই রোগ সারেনি বা পুরোপুরি সুস্থ হয়নি, এমতাবস্থায় তারা কি করেছে, বিকল্প অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করেছে কিনা জানতে চাইলে তারা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৬.৮ ঃ রোগীরা ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তন করেছেন কিনা ?

ডাক্তার/কবিরাজ পরিবর্তন	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
না	১৯৮	৬৬.০
হ্যাঁ	১০২	৩৪.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণী ৬.৯ ঃ ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তনের কারণ

পরিবর্তনের কারণ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
ডাক্তারের দেয় ঔষুধে সারেনি	৩৮	১২.৭
ডাক্তারদের ব্যবহার ভাল ছিল না	৩৭	১২.৩
ডাক্তার ভাল না, সঠিক ঔষুধ দিতে পারে নি	২৭	৯.০
প্রয়োজ্য নয় (পরিবর্তন করেনি)	১৯৮	৬৬.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

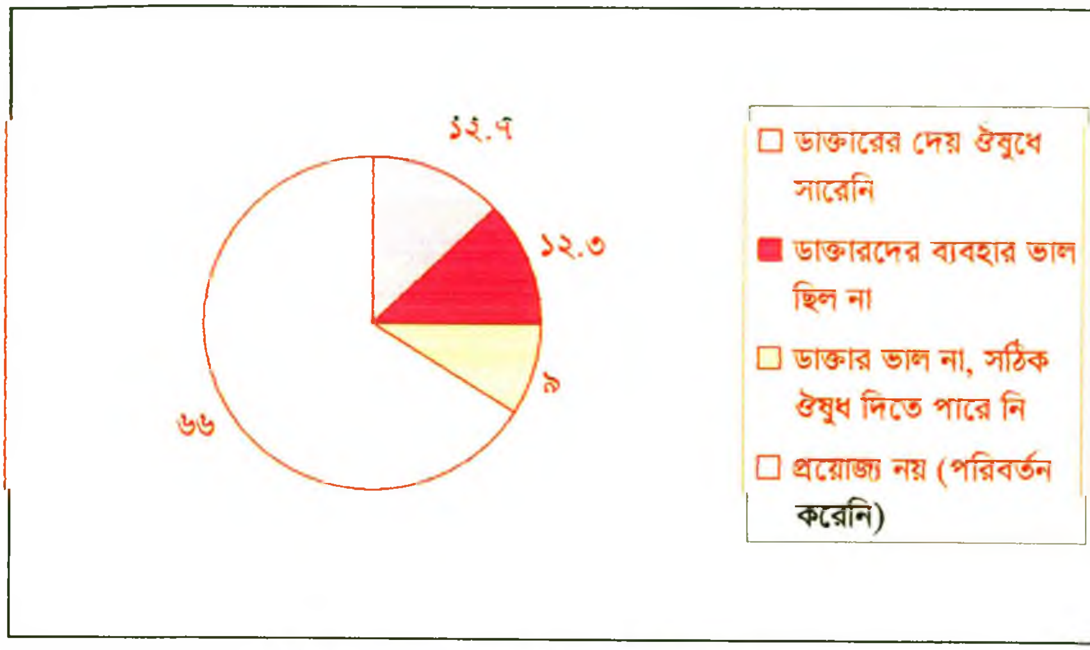

চিত্র ৬.৮ ঃ ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তনের কারণ

উক্ত টেবিল দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে বেশীর ভাগ রোগীই ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তন করেন নাই। অর্থাৎ ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ১৯৮ জন বা ৬৬% রোগী ডাক্তার পরিবর্তন করেননি। মাত্র ৩৪% রোগী ডাক্তার পরিবর্তন করেছেন এবং তারা পরিবর্তনের যথাযথ কারণ ও উল্লেখ করেছেন। অনেকে বলেছেন দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তারের ঔষুধ খাচ্ছি কিন্তু রোগের কোন উন্নতি হয়নি বিধায় ডাক্তার পরিবর্তন করেছি। এরূপ রোগীর সংখ্যা হলো ৩৮ জন বা ১২.৭%। এছাড়া রোগীদের আরও একটা বড় অংশ যারা ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য ডাক্তার পরিবর্তন করেছেন। তাদের মতে ডাক্তাররা আমাদের ঘা পচরা দেখে একটু বিরক্ত হতো, একটু ঘৃণা করত, দুর হতে দেখেই ঔষুধ লিখে দিত। অর্থাৎ ডাক্তারদের এই অবহেলা মূলক আচরণের জন্য ১০২ জনের মধ্যে ৩৭ জন রোগী ডাক্তার পরিবর্তন করেছেন। রোগীদের অপর আরেকটি অংশ ডাক্তার পরিবর্তন করেছেন শুধুমাত্র ডাক্তারদের অনভিজ্ঞতার কারণে। অবশ্য এক্ষেত্রে গ্রাম্য ডাক্তাররাই বেশী গ্রাম্য ডাক্তাররা সঠিক ঔষুধ দিত না বলে তাদের রোগ সারতো না। এরূপ কারণ দেখিয়ে ডাক্তার পরিবর্তন করেছেন ১০২ জনের মধ্যে ২৭ জন রোগী।

উক্ত সকল কারণ ছাড়াও ডাক্তারদের কারণে রোগীদের অন্য কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে তারও একটি পরিসংখ্যান রোগীরা উপস্থাপন করেছেন। এ সংক্রান্ত দুটি সারণী নিচে দেওয়া হলো।

সারণী ৬.১০ ঃ ডাক্তারদের কারণে অন্যান্য সমস্যা হয়েছিল কিনা

সমস্যা হয়েছিল কিনা	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
সমস্যা হয় নাই	২০০	৬৬.৭
সমস্যা হয়েছে	১০০	৩৩.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণী ৬.১১ ঃ ডাক্তারদের কারণে সংঘটিত সমস্যা সমূহ

সমস্যা সমূহ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
আর্থিক সমস্যা	৩	১.০
জ্বর হওয়ার সমস্যা	৪৪	১৪.৭
শরীরে অতিরিক্ত ঘা পচরা হয়েছিল বা ঘা পচরা বেড়ে গিয়েছিল	৫৩	১৭.৭
প্রযোজ্য নয় / সমস্যা হয়নি	২০০	৬৬.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

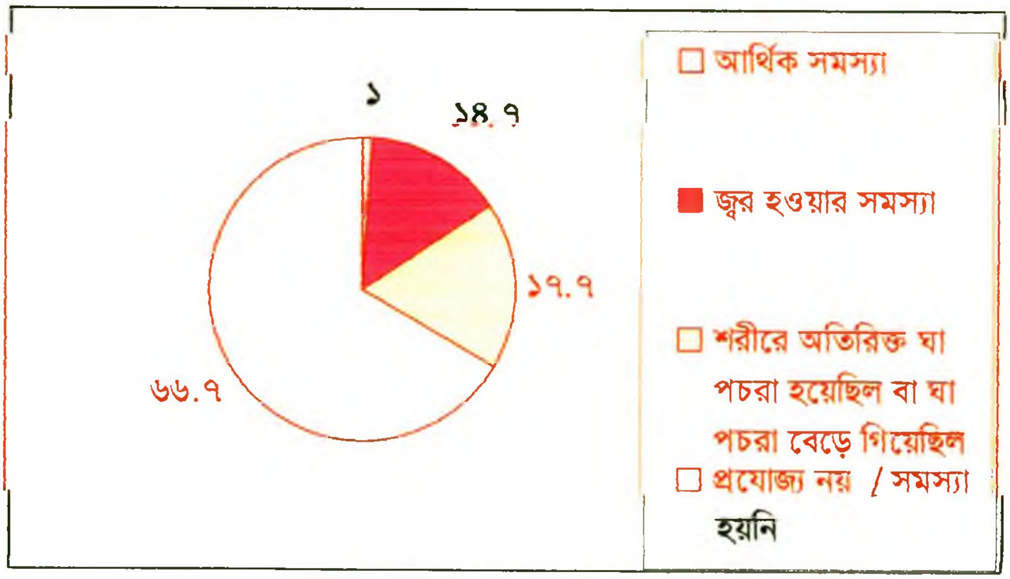

চিত্র ৬.৯ ঃ ডাক্তারদের কারণে সংঘটিত সমস্যা সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে লক্ষণীয় যে ডাক্তারদের কারণে বা চিকিৎসা ব্যবস্থা অথবা তাদের পরামর্শের কারণে মাত্র ৩৩.৩ শতাংশ রোগীর তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ সামান্য কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সমস্যাগুলির মধ্যে একটি হলো আর্থিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যা বলতে রোগীরা যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো অর্থের অপচয়। অর্থাৎ গরীব রোগীরা ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী বা তাদের দেয় ঔষুধ পত্র কেনাকাটার নিমিত্তে বেশ কিছু টাকা পয়সা খরচ করে ফেলেছে। কিন্তু ফলাফল ভাল আসে নাই। তাই উক্ত বিষয়টিকে তারা আর্থিক সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন। তবে এরূপ সমস্যায় পতিত রোগীর সংখ্যা খুবই সামান্য মাত্র ১%। ডাক্তারদের কারণে সমস্যা হয়েছে এরূপ ৩৩.৩% রোগীর এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে সমস্যাটির কথা তারা উল্লেখ করছেন তা হলো তাদের শরীর ও হাতে পায়ের ঘা-পচরা বেড়ে গিয়েছে। রোগীদের ধারণা ডাক্তারদের ঔষুধ খাওয়ার কারণেই তাদের ঘা-পচরা বেড়ে গিয়েছে। এরূপ রোগীর সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ৫৩ জন। যা শতকরা হিসেবে দাঁড়ায় ১৭.৭%। সমস্যা জড়িত আরো বাকী রয়েছে ৪৪ জন রোগী বা ১৪.৭% রোগী। যারা তাদের সমস্যা হিসেবে শরীর ব্যথা হয়ে জ্বর হওয়ার কথা বলেছে। যদিও ব্যাপারটি ডাক্তারদের কারণে হয়নি বরং হয়েছে আর্সেনিকোসিসের কারণে। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, এই রোগ সেড়ে না ওঠার কারণে অনেকেই ডাক্তারদের প্রতি ক্ষিপ্ত। তাই রোগাক্রান্ত অবস্থায় তারা (রোগীরা) যে সমস্যায় পড়েছে সে সব ক্ষেত্রে ডাক্তারদেরকেই বেশী দোষারোপ করেছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত আর্সেনিকোসিস রোগীদের ডাক্তার কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা সমূহ ছাড়াও অন্যান্য রোগ সংক্রান্ত সমস্যা হয়েছিল কিনা? অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে অন্য কোন রোগ হয়েছিল কিনা? তা জানতে চাইলে রোগীরা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন। যথা-

সারণী ৬.১২ ঃ আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের কারণে হওয়া অন্যান্য রোগ

রোগের নাম	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
মাথা ব্যথা	৫০	১৬.৭
জ্বর হওয়া	৪৪	১৪.৭
পা ফোলা	৬৩	২১.০
চুল কাণী	৭৩	২৪.৩
মোটা হয়ে যাওয়া	৫	১.৭
কিছুই হয় নাই	৫৬	১৮.৭
ঘুম কম হওয়া	৯	৩.০
মোট	৩০০	১০০.০

মাঠ পর্যায়ে জরিপ.২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

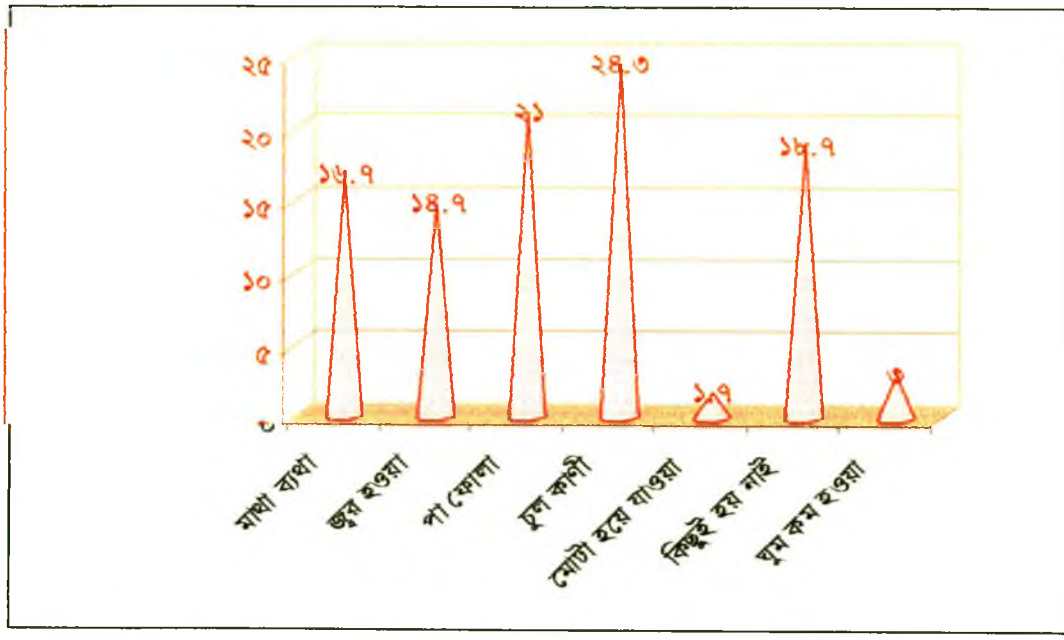

চিত্র : ৬.১০ ঃ আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকোসিসের কারণে হওয়া অন্যান্য রোগ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তারদের পরামর্শের কারণে রোগীর যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি অন্যান্য রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরণের আরো কিছু বারতি সমস্যা তথা রোগের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন প্রায় ১৭% রোগী বলেছে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তারের মাথা ব্যথা হয়েছে। আর্সেনিকোসিসের কারণে জ্বর হওয়ার কথা বা ডাক্তারদের কারণে জ্বর হওয়ার কথা পূর্বেও রোগীরা বলেছেন এখনও বলছেন। তবে পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ঠিক আছে। যেমন পূর্বেও বলেছে ১৪.৭% রোগীর জ্বর এসেছে এখন বলছেন ১৪.৭% রোগর আর্সেনিকোসিসের কারণে জ্বর হয়েছে। আর জ্বর হলে মাথা ব্যথা থাকবেই।

আর্সেনিকোসিসের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন রোগের কথা বলেছে আক্রান্তকারীরা। তারা বলেছে আর্সেনিকোসিসের কারণে অনেক রোগীরই পা ফুলে গিয়েছে। এরূপ রোগীর সংখ্যা ২১%। আসলে পা ফোলা হলো আর্সেনিকোসিসের দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি রোগ, যার নাম ইডেমা। এটি মূলত নন পিটিং ধরণের ইডেমা। আর্সেনিকোসিস হওয়ার পর পা ফুলে এই রোগ হয়। আর্সেনিকোসিসের কারণে শরীর ও অন্যত্র চুলকানী হওয়ার কথা বলেছে প্রায় ২৪% রোগী। তাদের ধারণা চুলকানী বেড়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ হলো আর্সেনিকোসিস। কেননা আর্সেনিকোসিস হলো ত্বকে প্রকাশ পাওয়া এক প্রকার চর্মরোগ। আরও একটি ছোট্ট রোগের কথা বলেছে মাত্র ১.৭% রোগী। তাহলো নিজেদের

শরীর মোটা হয়ে যাওয়া। এ ধরণের রোগীরা প্রায় সবাই বলেছে, আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর ডাক্তারদের দেয় ভিটামিন (এন্টি অক্সিডেন্ট) খেতে থাকি কিন্তু আসল রোগতো কমেই না বরং শরীর আরো মোটা হতে থাকলো। এরূপ মোটা হওয়ার সমস্যায় পড়েছে মাত্র ১.৭% রোগী। তবে রোগীদের একটা বড় অংশ যারা বলেছে আমাদের অন্য কিছুই হয় নাই অর্থাৎ ১৮.৭% রোগীর মন্তব্য আর্সেনিকোসিসের কারণে তাদের অন্য কোন সমস্যা বা রোগের সম্মুখীন হতে হয় নাই।

পূর্বে আলোচিত সকল সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আক্রান্ত রোগীদের রোগ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সে সকল বিষয়েও তাদের যথেষ্ট অসচেতনতা রয়েছে। প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা বা আর্সেনিকোসিস হলে আপাতত যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ তা পর্যালোচনায় রোগীরা তুলনামূলক কতটুকু অসচেতন সে বিষয়ে নিম্নের ছকটি দেখলেই বোঝা যাবে।

৬.১৩ আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ ও উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ।

লক্ষণ ও উপসর্গ	চিকিৎসা ব্যবস্থা
১। ত্বকের বর্ণ পরিবর্তন (প্রাথমিক / পরবর্তী পযায়)।	১। আর্সেনিক আক্রান্ত পানি গ্রহন বন্ধ করে আর্সেনিক মুক্ত পানি গ্রহণ।
২। ত্বকের পুরুত্বে অস্বাভাবিকা (স্বল্প ও মাঝারী পরিবর্তন)।	২। পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান গ্রহণ ও ত্বকের পুরুত্ব হ্রাসকারী উপাদান (৫%-২০%) ইউরিয়া, স্যালিসাইলিক এসিড মলম নেয়া।
৩। চোখের কনজাংটি ভায় প্রদাহ ও লাল হওয়া শ্বাস তন্ত্রের অসুখ।	৩। অন্যান্য উপসর্গ ও লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা নেওয়া এবং রোগটির ফলো-আপ এবং পরামর্শ প্রদান।
১। লিউকোমেলানোসিস সংযোগে ত্বকের বর্ণ পরিবর্তন।	১। আর্সেনিক আক্রান্ত পানি বন্ধ করে আর্সেনিক মুক্ত পানি গ্রহণ।
২। ত্বকের পুরুত্বে তীব্র পর্যায়ে অস্বাভাবিকতা।	২। প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ ও গ্রহণ ও গুরুত্ব হ্রাসকারী উপাদান সমৃদ্ধ (৫-২০%) ইউরিয়া স্যালিসাইলিক

অ. পৃ. দ্র.

	এসিড মলম গ্রহণ।
৩। প্রান্তীয় স্নায়ূতন্ত্রের জটিলতা।	৩। ক্রায়োসার্জারী বা শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ত্বকের পুরুত্ব হ্রাস করা।
৪। প্রাথমিক বৃক্কীয় জটিলতা।	৪। অন্যান্য লক্ষণ ও উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা।
৫। প্রাথমিক যকৃতীয় জটিলতা।	৫। রোগীর ফলো আপ এবং পরামর্শ প্রদান।
১। উপরোক্ত এক বা একাধিক সমস্যা ছাড়াও প্রান্তীয় রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের রোগ হওয়া সেই সাথে গ্যাংগ্রীণ বা পচন হওয়া।	১। আর্সেনিক আক্রান্ত পানি পান বন্ধ করে আর্সেনিক মুক্ত পানি গ্রহণ।
২। পরবর্তী বৃক্কীয় জটিলতা।	২। নির্দিষ্ট জটিলতা ভিত্তিক চিকিৎসা।
৩। পরবর্তী যকৃতীয় জটিলতা।	৩। শল্য চিকিৎসা নেওয়া।
৪। ক্যান্সার হলে।	৪। ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপি নেওয়া।
৫। সর্বপরি	৫। রোগীর ফলো-আপ ও পরামর্শ প্রদান।

উৎস: ডা. এম.এম.হক, ২০০২ : ৩৪

এমত পরিস্থিতিতে অনেকে হয়ত শুধু মাত্র আর্সেনিক আক্রান্ত পানি পান বন্ধ করেছে। কিন্তু বেশীর ভাগই আর্সেনিকোসিসের বিভিন্ন পর্যায় ভিত্তিক চিকিৎসা নেন নাই। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করার কথা থাকলেও অনেকে পয়সার অভাবে আবার অনেকে ইচ্ছে করেই সেগুলো খায় না। ডাক্তারী ফলোআপ ও অনেকে মেনে চলেনি। ফলে অনেকেই গ্যাংগ্রীণ পর্যায়ের রোগীতে পরিণত হয়েছে। যাহোক আর্সেনিকোসিসের চিকিৎসা ব্যাপারে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৯. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের মন্তব্য

বিভিন্ন গবেষণা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে। যা পান করে এদের অনেক মানুষ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যু ও ঘটেছে অনেকের। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বিষ এবং মানুষ আক্রান্ত বিষয়টি বর্তমানে খুবই আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, সংবাদ পত্র,

এন.জি.ও, মসজিদ, মন্দির এমনকি যতভাবে সম্ভব আর্সেনিকোসিসের এই ভয়াবহতা মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তথাপিও আমার আলোচ্য আর্সেনিকোসিস রোগীরা এই রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যতীক্রমধর্মী কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী ৬.১৪ ঃ আর্সেনিকোসিস হওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের মতামত

মতামতের ধরণ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
ভূ-গর্ভস্থ পানি	২০৬	৬৮.৭
দূষিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি	৩১	১০.৩
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ	৩৯	১৩.০
রক্তের সমস্যা	১২	৪.০
বলতে পারে না / জানো না	১২	৪.০
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

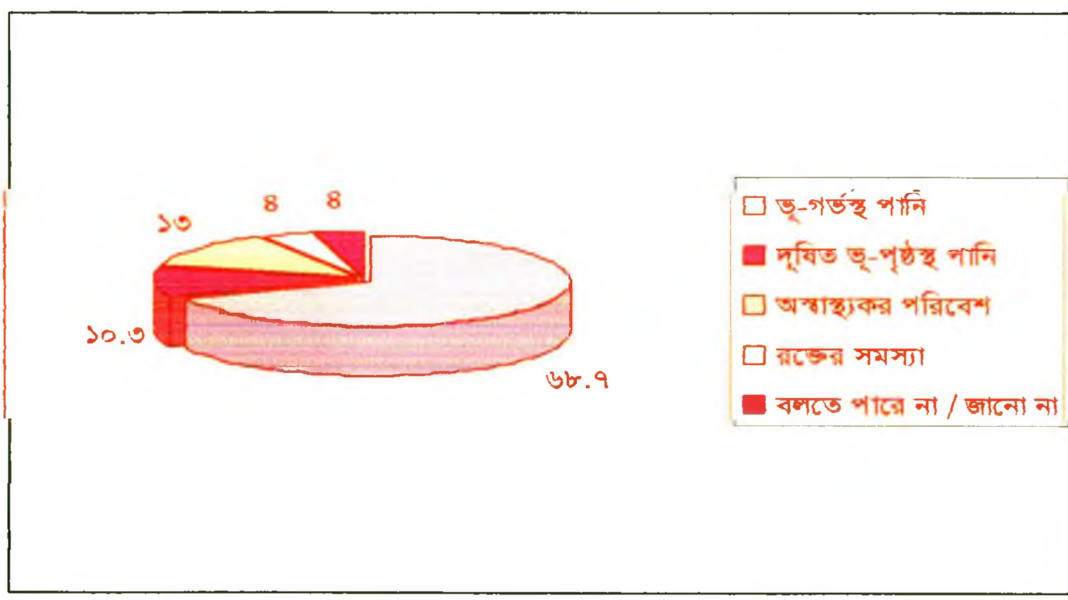

চিত্র ৬.১১ ঃ আর্সেনিকোসিস হওয়ার ক্ষেত্রে রোগীদের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে ৩০০ জন সনাক্তকৃত রোগীর মধ্যে ২০৬ জন বা ৬৮.৭% রোগীই বলেছে আর্সেনিকোসিসের প্রধান কারণ হলো ভূ-গর্ভস্থ পানি। অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আছে এবং সেই পানি মানুষ পান করছে বিধায় তারা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এই ৬৮.৭% রোগী ব্যতীত আরো ২৭.৩% রোগী আর্সেনিকোসিস হওয়ার পেছনে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যতীত অন্যান্য মতামত ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে ১০.৩% রোগী বলেছেন আর্সেনিকোসিসের অন্যতম কারণ হলো দূষিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পান করা। ১৩% রোগী বলেছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে, এমনিতেই মানুষের বিভিন্ন ধরণের অসুখ-বিসুখ হয়, ঘা-পচরা হয়, তেমনই এই রোগটাও হয়েছে। এই রোগ (আর্সেনিকোসিস) হলে ঔষধে ভাল হচ্ছে না এরূপ অবস্থা উপলব্ধি করে কিছু সংখ্যক রোগী শরীরের রক্তের সমস্যার কথা বলেছেন। তাদের মতে শরীরে রক্তের সমস্যা থাকার কারণে এই রোগ (আর্সেনিকোসিস) হচ্ছে। এমন রোগী পাওয়া গেছে ৩০০ জনেরমধ্যে মাত্র ১২ জন। অর্থাৎ ৪% রোগী। এই রোগের প্রকৃত কারণ কি বা কি জন্যে তাদের শরীরে আর্সেনিকোসিস হয়েছে তা বলতে পারেন না এমন ও কিছু সংখ্যক রোগী রয়েছে। তথ্যে প্রাপ্ত এমন রোগীও ৪%। পানি ব্যতীত এই রোগের ক্ষেত্রে যারা ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তারা কিছু কারণ ও সাথে উল্লেখ করেছেন। তা হলো, একই পরিবারে বাস করছে বাবা-মা, ভাই-বোন একই অন্নে খাচ্ছে, একই টিউবয়েলের পানি পান করছে। এরূপ ৬ সদস্যের একটি পরিবারে মাত্র ১ জনের আর্সেনিকোসিস। এমন কি দেখা গেছে বাবা আক্রান্ত নয় কিন্তু ছেলে আক্রান্ত। এক্ষেত্রে ছেলে অপেক্ষা বাবাই বেশীদিন আর্সেনিক আক্রান্ত পানি পান করেছে। অবশ্য পরিবারের সকল সদস্যের আচার-আচারণ চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া, পরিষ্কর-পরিচ্ছন্নতা একরূপ নয়, কাজেই আর্সেনিকোসিস হওয়ার ক্ষেত্রে পানির পাশাপাশি অন্যান্য, উক্ত কারণগুলো থাকতে পারে। কাজেই রোগীদের মতামতের বিষয়টি অমূলক নয়। ফুত কারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। খাদ্যাভ্যাসের তারতম্যের কারণে অনেকের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, অনেকের রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশী।

শেষান্তে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আর্সেনিকোসিস হওয়া, লক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সনাক্ত করা, বিভিন্ন পর্যায়ে তা আলোচনা করা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে রোগীদের মতামত অভিপ্রায় ব্যক্ত করা, সচেতনতা উপলব্ধি করা, সর্বপরি রোগীদের সার্বিক অবস্থা মন্তব্য পর্যালোচনা ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৭

সপ্তম অধ্যায়

১. গবেষণা এলাকার আর্সেনিকোসিস রোগীদের খাদ্যাভাস

পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এখানে গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ১৪০০ লোক বাস করে এবং ৯৪% লোক গ্রামে এবং ৮৫% লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং ৬০% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের সাথে জড়িত। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় এখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম। তথাপি জনসংখ্যার চাপ ক্রমশই বাড়ছে। আমরা জানি জীবন ধারণের জন্য মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন খাদ্যের, যে খাদ্য শরীরকে সুস্থ, সবল ও নিরোগ রাখে এবং কাজ করার শক্তি জোগায়। আর এ সমস্ত খাদ্যকে পুষ্টিকর খাদ্য বলা হয়। খাদ্যের উপাদান ও গুণগত মান বিবেচনা করে খাদ্যকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে উক্ত ছয় প্রকার খাদ্য ও তার গুণাগুণ উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) **শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ঃ** চাউল, আটা, চিনি, গুড়, আলু ইত্যাদি এগুলো দেহের উত্তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

খ) **আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ** মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, ইত্যাদি। এসব খাদ্য শরীরের মাংসপেশী দৃঢ় করে এবং দেহের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টি সাধণে সহায়তা করে।

গ) **চর্বি স্নেহজাতীয় খাদ্য ঃ** ঘি, মাখন, তৈল, চর্বি ইত্যাদি। এ খাদ্যগুলোও দেহের উত্তাপ ও শক্তি বৃদ্ধি করে।

ঘ) **খাদ্য প্রাণ ঃ** মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, বিভিন্ন প্রকার ফলমূল শাক-সবজি ইত্যাদি খাদ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য প্রাণ আছে। এ সব খাদ্য দেহকে সুস্থ ও সুঠাম রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই খাদ্য প্রাণকে আবার ভিটামিন এ. বি. সি. ডি এবং ই ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর অভাবে শরীরে নানা ধরণের রোগ হতে পারে।

ঙ) **লবণ জাতীয় খাদ্য ঃ** সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, ফসফরাস ইত্যাদি এ জাতীয় খাদ্য। বিভিন্ন খাদ্যে এগুলি বিদ্যমান থাকে এবং দেহ গঠনে সহায়তা করে। এগুলির অভাবে দেহে নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

চ) **পানী ঃ** আমাদের দেহের প্রায় ৭০ ভাগই পানি দ্বারা গড়া। স্বাস্থ্য রক্ষা ও জীবণ ধারণের জন্য নিরাপদ পানি অপরিহার্য।

খাদ্যের উপর নির্ভর করে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। পরিমিত ও গুণগত খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য গ্রহন করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শরীরে শক্তি হয় এবং রোগাক্রান্ত হবার ভয় কম থাকে। কাজেই দেহের কাজ অনুযায়ী খাদ্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক) শক্তি ও তাপ দায়ক খাদ্য ঃ

i) শস্য জাতীয় খাদ্য যেমন- ভাত, আটা, জোয়ার ভূট্টা ইত্যাদি।

ii) মূল জাতীয় খাদ্য। যেমন- গোল আলু মিষ্টি আলু মেটে আলু, কাসাবা ইত্যাদি।

iii) তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য। যেমন- সব ধরণের তেল, ঘি, বাটার, মাখন ইত্যাদি।

iv) চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য।

এই সব খাদ্যের ভূমিকা হলো ঃ আমাদের দেহ যন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করা। যেমন- শ্বাস প্রস্বাস ক্রিয়া, হৃদপিন্ডের ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, মলমূত্র নিষ্কাশন ক্রিয়া ইত্যাদি। এছাড়া, চলাফেরা অফিস আদালতের কাজ কর্ম, লেখাপড়া, চাষাবাদ, দাড় টানা, মাটি কাটা, কাঠ চেরাই, রিক্সাভ্যান চালানো, রান্নাবান্না ইত্যাদি সকল ধরণের কাজের প্রয়োজনীয় শক্তি উক্ত সব খাদ্যগুলো উৎপাদন করে।

খ) শরীরের গঠনবৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণীয় খাদ্য ঃ

i) ডিম, ii) দুধ, iii) মাছ, iv) মাংস v) সব রকমের ডাল, vi) মটরশুঁটি, vii) সব রকমের শিমের বীচি, viii) বাদাম প্রভৃতি।

এসব খাদ্যের ভূমিকা হলো ঃ শরীরের কাঠামো তৈরী করা বা শরীর গঠন করা, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করা এবং শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করা।

গ) রোগ প্রতিরোধক খাদ্য ঃ এসব খাদ্যের মধ্যে পড়ে

i) সবুজ, হলুদ ও অন্যান্য রঙিন শাকপাতা।

ii) সব রকমের সবজি।

iii) সব রকমের ফল।

iv) ডিম।

v) দুধ।

vi) কলিজা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

এসব খাদ্যের ভূমিকা হলো ঃ শরীরকে রক্ষা করা, শরীরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি কিংবা অসুস্থ্যতা হতে মুক্ত রাখা।

বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ ও জনবহুল দেশ হওয়ার জন্য অধিকাংশ লোকই তাদের দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য খেতে পারে না। ক্রমাগত কম খাবার গ্রহন করার ফলে অপুষ্টির সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ধেকের ও বেশী লোক অপুষ্টিতে ভূগছে। গবেষণা এলাকা শিবচরে ও এরূপ দরিদ্র লোকের অভাব নেই। ফলে তারাও অপুষ্টিতে ভুগছে এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি রোগ হলো আর্সেনিকোসিস। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের খাদ্যাভাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা এই পুষ্টিহীনতার তালিকাভূক্ত। কারণ তারা যে সব খাদ্য খেয়ে অভ্যস্ত এবং নিত্যদিন যা খাচ্ছে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যা আমরা কে-ক্যালোরী গ্রহণের পরিমান হতে জানতে পেরেছি। আরো লক্ষণীয় যে রোগীদের আমিষ, তাপশক্তি ও খাদ্য প্রাণ- এ, বি^{২}, লৌহ, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, প্রভৃতি যথেষ্ট ঘাটতী রয়েছে। এর মধ্যে তাপশক্তি উল্লেখযোগ্য আর এই তাপশক্তি মাপা হয় ক্যালোরীতে।

২.গবেষণা এলাকা শিবচরের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা ও তার পুষ্টিমান

আমরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকি সাধারণত শক্তি অর্জনের জন্য। তাই খাদ্যের উৎপাদন, বন্টন গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সে খাদ্যের শক্তির উৎস প্রথম বিবেচনা করতে হবে। আমাদের দেশ বিশ্বের সম্প্রতি অগ্রগতিশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং অধিকাংশ লোকের আয় সীমিত। কাজেই খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রতুলতার অভ্যাস তাদের ঐতিহ্যগত। এমতাবস্থায় আমাদের খাদ্য সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ যাতে করে অর্থ ও খাদ্যের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার হয়।

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। শুধু তাই নয় স্বয়ং ভোগী কৃষি প্রধান দেশ। অর্থাৎ শুধু নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই অধিকাংশ লোক কৃষি কাজ করে থাকে। আমাদের দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ধান উৎপাদনের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। অর্থাৎ শক্তির উৎস হিসেবে আমাদের দেশের লোক ভাত, আটা, আলু, তেল ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করে। যদিও ভাতই প্রধান খাদ্য তথাপি দিন দিন আটার প্রচলন কিছুটা বাড়ছে। আটা ও চালে প্রায় সমপরিমাণ শক্তি আছে (৩৪৬ k.cal/১০০g)। ভাত ও আটা শুধু শক্তিরই উৎস নয়। এ খাদ্য দুটি বেশ কিছু পরিমাণ আমিষ ও সরবরাহ করে থাকে। আর এ দুটি খাদ্য আমাদের দেশ তথা গবেষণা এলাকা শিবচর থানার লোকদের অন্যতম খাদ্য তালিকাভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক ওয়াক্তে খাদ্যের সাথে ডালের প্রচলন আছে। যদিও শিবচর এলাকায় বেশী ডাল উৎপাদিত হয় না। এখানে বেশীর ভাগ ডাল অন্যান্য এলাকা হতে আসে। শিবচরে সাধারণত, মুগ, মুশুর, সোলা, কালাই, মটরশুটি, অরহর ইত্যাদি জাতের ডাল পাওয়া যায়। এসব ডালে প্রায় পচিশ শতাংশ (২৫%) আমিষ আছে, আর শক্তি আছে চালের মতই। ডাল এদেশের মানুষের জন্য খুবই উপকারী। কেননা ডালের আমিষ চাল ও গমের সাথে মিশে খাদ্যের আমিষের মান বৃদ্ধি করে। পরিমাণ মত ডাল ভাত ও ডাল রুটি খেলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শক্তি ও আমিষের প্রয়োজন মোটামুটি ভাবে পূরণ করতে পারে। আমরা ডাল বেশী পাতলা খাই। এটি একটু ঘন করে বেশী পরিমাণ ডাল নিশিয়ে খেলে বেশী শক্তি ও আমিষ পাওয়া যাবে।

শিবচরে প্রাণীজ আমিষ হিসেবে পাওয়া যায় দুধ, ডিম, মাংশ ও বিভিন্ন ধরণের মাছ। তবে সব কিছুর দাম অত্যাধিক হওয়ায় এবং জনগণের আয় সীমিত হওয়ায় এগুলো প্রতিদিন কেউ খেতে পারে না। এই প্রাণীজ আমিব প্রতিদিন অল্প পরিমাণ খেলে অন্যান্য আমিষের মান বৃদ্ধি পায়।

এরপর আসা যাক খাদ্য প্রাণ ও খনিজ লবণের কথায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই, পুষ্টি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী খাদ্য প্রাণ (Vitamins) ও খনিজ লবণের (Minerals) অভাব জনিত রোগে ভোগে। খাদ্য প্রাণ ও খনিজ লবণ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি। যেমন- কচু শাক, ডাটা, শাক, পালং শাক, ধনে শাক, পুই শাক, কলমী শাক, পাট শাক, হেলেস্কা শাক, বেতো শাক, সজনে ডাটা ইত্যাদি। আর এগুলোর অধিকাংশই প্রায় শিবচরে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিক পরিমাণ নয়। ফলে দাম একটু বেশী এবং সাধারণ মানুষ প্রয়োজন অনুসারে খেতে পারে না। এসব শাকে খুব বেশী পরিমাণ ক্যালসিয়াম, লৌহ, ক্যারোটিন, খাদ্য প্রাণ সি, বি বিদ্যমান। তাই আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাণ ও খনিজ লবণের অভাব এই অল্প দামী শাক সবজির মাধ্যমেই আমরা মেটাতে পারি।

শিবচর বাসীর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কুমড়া, পটল, করল্লা, ঢেরস, ডাটা, চাল কুমড়া, ধুন্দল, ঝিঙা, চিচিংগা ইত্যাদ সবজি থাকে। এসব সবজিতে কিছু খাদ্য প্রাণ ও খনিজ লবণ আছে। তবে এদের বেশীর ভাগ খাদ্য তালিকার পদ (Item) ও স্বাদ বৃদ্ধি করে। তবে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে সবজির মধ্যে পুষ্টি মানের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল হলো ঘন-সবুজ বর্ণ পাতাযুক্ত শাক-সবজি।

আমাদের দেশে প্রচুর ফলমূল, শাকসবজি, লতাপাতা, চাল ডাল ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। সবগুলোর পুষ্টিমান নিরূপণ করা এখনো হয়নি, তবুও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করে পুষ্টিমান নির্ণয় করা হয়েছে। আমরা মনে করি-দেশের আপামর

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের প্রতিদিনের গৃহীত খাদ্য থেকে আমরা কতখানি পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকি, এবং প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট কিনা সে সম্পর্কে জানার জন্য বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ জানা অত্যাবশ্যক।

৩. আর্সেনিকোসিস রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য তালিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও চাহিদার তুলনায় খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কম। দেহের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারায় দেশের অনেকেই অর্ধাহার ও অনাহারে দিন কাটায়। ক্রমাগত কম খাবার গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ লোক অপুষ্টিতে ভুগছে।

দেহকে সুস্থ রাখার জন্য খাদ্যের উপাদানগুলোর ৬০% কার্বোহাইড্রেট, ৩০% স্নেহ, ১০% প্রোটিন, অতি সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ যেমন দরকার তেমনি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানিও দরকার। বাংলাদেশে অর্ধেকেরও বেশি লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, তাদের পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং অজ্ঞতাবশত মোট জনসংখ্যার ৩/৪ অংশেরই সুষম পুষ্টিযুক্ত খাবার সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট নয়।

প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য দেহে মিথেলেশন প্রক্রিয়া ও প্রোটিন পরিমাণ বৃদ্ধি করে অজৈন আর্সেনিক বিষাক্ততা হ্রাস করে। এন্টিঅক্সিডেন্ট (antioxidant) ভিটামিন-এ.ই ও সি আর্সেনিক বিষাক্ততা হ্রাসে জোরালো ভূমিকা রাখে।

পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণে সেলেনিয়াম (selenium) অভাব দেখা দেয়। সেলেনিয়াম আর্সেনিক প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। ডিম, দুধ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সেলেনিয়াম থাকে যা গরীব জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সাধারণত গরীব জনগনই আর্সেনিকের প্রধান শিকার। সারাদিনের কায়িক প্ররিশ্রমের পর গরীব পল্লী শ্রমিক তৃষ্ণা মিটানোর চার থেকে পাঁচ লিটার পর্যন্ত পানি পান করে থাকে। তাছাড়া, পান্তা ভাত খেয়ে এবং আর্সেনিকদুষ্ট পানি দিয়ে রান্না করা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রির মাধ্যমেও আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত যে দস্তা, সোডিয়ামের উপাদানসমূহ, পারদ, ক্যালসিয়াম, সীসা এবং বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করে। খাদ্যের মাধ্যমে যে যতো কম পরিমাণে মেথিয়নিন (methionine) গ্রহণ করে সে ততো বেশি পরিমাণে আর্সেনিক আক্রান্ত হয়। দেহে মিথিয়নিন ও প্রোটিনের অভাবে আর্সেনিক বিষহ্রাস করার প্রয়োজনীয় কো-ফ্যাক্টরগুলোর পরিমাণ কমিয়ে দেয়। আরো দুটি সূক্ষ্ম পুষ্টি উপাদান ভিটামিন বি-$_{১২}$ এবং ফলিক এসিড সাডেনোসিলমিথিয়নিন (sadenosylmethionine) তৈরি

করে আর্সেনিক বিষক্তা হ্রাস করে। তাছাড়া এগুলো শরীরে আর্সেনিক ও কিছু নির্দিষ্ট মৌলের বিষাক্ততা প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এসব উপাদান বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। মেটালোথায়নিন (metallothionine) ধাতব বন্ধনীযুক্ত সালফাডিলসমৃদ্ধ প্রোটিন এবং প্রোটিনের কার্যকারিতা হ্রাস ধাতু- মৌল দস্তা ও তামায় প্রভাবিত হয়। পরোক্ষভাবে ধারণা করা হয় যে এ প্রোটিন বিভিন্ন ধাতু ও ধাতুকল্প বিশেষ করে আর্সেনিক হ্রাসে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে [Abdulla and Reis,1998,coded by H.K. Das, 2000:213]।

আর্সেনিক প্রতিরোধে সুষম সব পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন 'এ', ও 'সি' ভূমিকা খুবই জোরালো। প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম, সিম, মসুরির ডাল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

ক) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

নিম্নে সারণীর মাধ্যমে শিবচর তথা আমাদের দেশের প্রাপ্ত এবং আসেনিকোসিস প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের তালিকা দেওয়া হলো।

সারণী ৭.১ ঃ প্রতি ৫০ গ্রামে কয়েকটি সাধারণ খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ

খাদ্য	প্রোটিন (মিলিগ্রাম / ৫০ গ্রাম)	খাদ্য	প্রোটিন (মিলিগ্রাম / ৫০ গ্রাম)
মুরগির মাংস	৩	দুধ	২
খাসির মাংস	১১	গরুর দুধের ছানা	৫০
গরুর মাংস	১২	পাকা কলা	৪
হাঁসের মাংস	১১	চিনাবাদাম	১৪
মুরগির ডিম	৭	ছোলার ডাল	১১
হাঁসের ডিম	৭	মাসকলাই ডাল	১২
আইড় মাছ	৮.০	সিমের বিচি	১৩
শিং	১২	মুগ ডাল	১৩
রুই	৯	খেসারি ডাল	১৪
ইলিশ	১২	মসুর ডাল	১৩
চিংড়ি	১৪	সয়াবিন	২২
চিংড়ি শুটকি	৩৫	নারিকেল	৯

উৎস ঃ পুষ্টি খাদ্যবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০,সংকলিত দাস, ২০০০: ২১৪

খ) ভিটামিন 'এ' বা খাদ্যপ্রাণ 'এ'

ভিটামিন 'এ' ঘাটতি বাংলাদেশের অন্যতম পুষ্টি সমস্যা। খাদ্যপ্রাণ 'এ' রোগ প্রতিরোধ করে এবং শিশুদের দেহের বৃদ্ধি সাধন করে। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ২৫০০ আন্তর্জাতিক একক (আই ইউ) খাদ্যপ্রাণ 'এ' প্রয়োজন। এর অভাবে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, 'রাতকানা' রোগ হয় ও পরিশেষে অনেকে অন্ধত্ববরণ করে। খাদ্যপ্রাণ 'এ' মাখন, ঘি, ডিম, যকৃত, মাছ ও মাংসে প্রচুর পরিমাণে থাকে। পালং শাক, কচু শাক, গাজর, পেয়ারা, পাকা আম, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, পাকা টমেটো, তাল ইত্যাদিও খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র উৎস। তাজা সবুজ শাক-সবজি ১ ঘন্টা রোদে রেখে দিলে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ 'এ' নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যপ্রাণ 'এ' দেহে অনেক দিন জমা থাকলেও বিনষ্ট হয় না। সেজন্য শিশুদের খাদ্যপ্রাণ 'এ' ক্যাপসুল বছরে দু'বার খাওয়ালে তাদের এক বছরের প্রয়োজন মিটে যায়। শিশুদের খাদ্যপ্রাণ 'এ' ঘাটতি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম পর্যায়ে বিনামূল্যে 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ করার কর্মসূচি নেয়া একান্ত প্রয়োজন [Saha, 1978, coded by H.K. Das, 2000: 214]।

গ) ভিটামিন 'সি'

ভিটামিন 'সি' পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের মধ্যে অন্যতম। এর অপর নাম 'এসকরবিক এসিড'। এটি ৬ কার্বনবিশিষ্ট একটি জৈবিক পদার্থ। প্রকৃতিতে ভিটামিন 'সি' বিজারিত ও জারিত অবস্থায় থাকে। বিজারিত অবস্থায় এর গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে কিন্তু জারিত অবস্থায় এর কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন 'সি' দেহে সঞ্চিত থাকে না। ৬ ঘন্টা পরপর দৈনিক খাবারে এটা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন 'সি' প্রস্রাবের সাথে দেহ থেকে বের হয়ে আসে। আমাদের খাদ্যে ভিটামিন 'সি'-এর প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন খাবারে কাঁচা ফলমূল, শাক-সবজি বা সালাদের প্রচলন নেই বললেই চলে। রান্না করার সময় ভিটামিন 'সি' অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। বায়ুর অক্সিজেন, আলো, তাপ, লোহা ও কপারের সংস্পর্শে আসলে এটা অতি সহজে এবং দ্রুত গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে। টাটকা শাক-সবজি বা ফলমূল ২/৩ দিন ঘরে রেখে দিলে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় [Saha, 1978, coded by H.K. Das, 2000: 215]।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে কয়েকটি দৈনন্দিন গ্রহণযোগ্য খাদ্যের প্রতি ৫০ গ্রামে খাদ্যপ্রাণ 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ আন্তর্জাতিক এককে সারণি দেখানো হলো।

সারণী ৭.২ ঃ কয়েকটি সাধারণ খাবারে ভিটামিন 'এ' ও 'সি' পরিমাণ (প্রতি ৫০ গ্রামে)

খাদ্য	ভিটামিন 'এ' আই ইউ/৫০ গ্রাম	ভিটামিন 'সি' মিলিগ্রাম / ৫০ গ্রাম
কচু শাক	৬০৭০	৩২
পুঁই শাক	৫৮০০	৩২
লাল শাক	৪৪০০	২২
পালং শাক	৩২০০	৪৯
লাউ শাক	৫৩০০	৫৫
মুলা শাক	৪৮০০	৭৪
মিষ্টি কুমড়া (সবুজ)	৫৩০০	২০
ডাঁটা	৪১০০	০৫
মুলা	৪০০০	২২
গাজর	৭২০০	১২
বাঁধাকপি	৯০০	-
পাকা আম	২৫০০	২২
পাকা পেপে	৪৩০	৩০
আমলকি	-	২৫০
পেয়ারা	৫০	১২০
জাম্বুরা	৬০	৫৫
আমড়া	৪০০	৫০
কমলা	৭০	৪৮
করলা	৭২৫	৩৩
সাজনা	৩৭৫	২৫

উৎস ঃ পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাবি, ১৯৮০, সংখ্যা, (১৯৭৮) , সংকলিত দাস, ২০০০: ২১৫

নিম্নে বিভিন্ন বয়সের লোকদের প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক সুষম-পুষ্টি উপাদানের দৈনিক অনুমোদিত খাদ্য তালিকা ও বাংলাদেশে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনসমৃদ্ধ কয়েকটি প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের ক্যালরিমান সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী ৭.৩ ঃ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের দৈনিক অনুমোদিত পরিমাণ

বয়স	কিলো-ক্যালোরি		প্রোটিন গ্রাম		ভিটামিন 'এ' (আই.ইউ)	ভিটামিন 'সি' (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলিগ্রাম)		ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	
০-১	৮০০		২২		১০০০	২০	০.৪		.০৪	
১-৩	১২০০		২৫		৮৩০	২০	০.৭		০.৭	
৪-৬	১৫০০		৩১		১০০০	২০	০.৯		১.০	
৭-৯	১৮০০		৩৮		১৩৩০	২০	১.১		১.২	
১০-১২	২৪০০		৪৮		১৯২০	২০	১.২		১.৪	
	পুরুষ/স্ত্রীলোক		পুরুষ/স্ত্রীলোক				পুরুষ/স্ত্রীলোক		পুরুষ/ স্ত্রীলোক	
১৩-১৫	২৭০০	২২৫০	৪৪	৪১	২৪০০	৩০	১.৩	১.২	৫	১.২
১৬-১৯	২৯০০	২১০০	৫৩	৪৪	২৫০০	৩০	১.৪	১.১	১.৫	১.২
২০-৩৯	৩১০০	২০০০	৫৯	৪৩	২৫০০		১.৪	১.০	১.৫	১.১
৪০-৪৯	২৮০০	১৯০০	৫৯	৪৩	২৫০০	৩০	১.৩	০.৯	১.৪	১.০
৫০-৫৯	২৫৫০	১৮০০	৫৯	৪৩	২৫০০	৩০	১.২	০.৯	১.৪	১.০
৬০-৬৯	২৩০০	১৬০০	৫৯	৪৩	২৫০০	৩০	১.১	০.৮	১.২	০.৯
৭০>	২০০০	১৪০০	৫৯	৩০	২৫০০	৩০	১.০	০.৭	১.১	০.৭
গর্ভবতী মা প্রসূতি মা	+৩০০ +৫৫০		+৯ +২৮		+০ +০	+০ +০	+.১ +.২		+.২ +.২	
গড় চাহিদা	২৩০০		৪৫		২০০০	২৬	১.০		১.৫	

এখানে উলেলখ্য, দেহের ওজন-প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ : ৬০ কিলোগ্রাম

-প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা : ৫০ কিলোগ্রাম

উৎস : Ahmed, 1982; Food and Nutrition Science Institute, Dhaka University, 1980, coded by H.K. Das, 2000:216।

সারণী ৭.৪ ঃ কয়েকটি প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের ক্যালরিমান।

খাদ্য	কিলো-ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম)	খাদ্য	কিলো-ক্যালরি (প্রতি ১০০ গ্রাম)
আটা	৩৫৫	গরুর মাংস	১১৪
চাল	৩৪৭	খাসির মাংস	১১৮
গোল আলু	৮৯	মুরগির মাংস	১০১
চিনি/গুড়	৩৪৩	ডিম	১৭৩
বাদাম	৬৫৫	রুই মাছ	৯৭
মসুর ডাল	৩৪৩	পুঁটি মাছ	১০৬
সয়াবিন	৪৩২	গরুর দুধ	৬৭
সিম	৩৪৭	মাখন	৭২৯

সূত্রঃ UNICEF, Dhaka, 1978, coded by H.K. Das, 2000:216]।

পূর্ণবয়স্ক আর্সেনিকোসিস রোগীর তিন মাস নির্ধারিত মাত্রায় ভিটামিন সেবনের যে পরামর্শ তা হলো- প্রতিদিন ভিটামিন 'এ' ২৫,০০০ আই ইউ ও ভিটামিন 'সি' ৩০০ মিলিগ্রাম। শিশুদের ক্ষেত্রে পরিমাণ কম হবে।

কোনো একটি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানকে খাদ্য থেকে বাদ দেওয়া আমাদের যেমন উচিত নয় আবার প্রয়োজনীয় পরিমাণের বেশি খাওয়াও ঠিক নয়। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন ভিটামিন 'এ' ১০০,০০০ আই ইউ পরিমাণে কয়েক মাস সেবন করলে দেহে ক্রনিক বিষাক্ততার সৃষ্টি করতে পারে; হজম শক্তির হ্রাস, ত্বক শুষ্ক, ত্বকে অস্বভাবিক দাগ, হাড় ও গাঁট ব্যাথা, প্লীহা ও লিভার প্রশস্ত ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আবার, মারাত্মক আর্সেনিক বিষাক্ততায় ভিটামিন 'এ' ৩,০০,০০০ আই ইউ বেশি পরিমাণে একসঙ্গে সেবন করা যেতে পারে, ভিটামিন 'সি' দৈনিক ২ গ্রামের বেশি সেবনে দেহে পার্শ্বক্রিয়া দেখা দিতে পারে [খান ,১৯৯৭, সংকলিত দাস,২০০০, ২১৭] । মোট কথা রোগীর আর্সেনিক বিষাক্ততার পরিমাণ জেনে ওষুধ ও ভিটামিন সেবনের পরামর্শ দেওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের দৈনন্দিন খাদ্যাভাস, খাবার রুচি এবং রুচির পরিবর্তন

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই আছে অবিচ্ছন্ন নিরক্ষরতার অন্ধকারে। এদেশেরই দক্ষিণ অঞ্চলের একটি থানা শিবচর। শিক্ষা বিকাশের দিক থেকে এ অঞ্চলটি অবিচ্ছিন্ন নিরক্ষরতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশেষ করে গবেষণায় আলোচ্য আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা প্রায় সবই অশিক্ষিত। ফলে জীবন ও জগতের নানাবিধ জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত। শরীর স্বাস্থ্য ও তাদের ভঙ্গুর। সর্বত্রই অপুষ্টি ও ক্ষুদার অভিসাপ তাদের ঘিরে আছে। পুষ্টি সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান তাদের জানা থাকলে তারা বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধির কবল হতে রক্ষা পেত। সমাজে বিদ্যমান অস্থিরতার কারণ গুলির মধ্যে এই অজ্ঞানতা জনিত অক্ষমতা অন্যতম।

আমার গবেষণার মূল বিষয় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী। এই রোগীরা তাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারণ, জীবনের কাজকর্ম, চলাফেরা, দেহকে সুস্থ্য সবল ও রোগ মুক্ত রাখার জন্য যে সমস্ত খাদ্য খায় বা গ্রহণ করে তা নিম্নে আলোচিত হলো ।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ অঞ্চলের লোকেরা প্রতিদিন তিন অথবা চার বার খাবার গ্রহণ করে। তবে গ্রামীণ ও থানা সদরের পৌর এলাকার মধ্যে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। গ্রাম এলাকার বেশীর ভাগ লোকই প্রতিদিন ৪ বার খাবার গ্রহণ করে এবং থানা সদর বা পৌর সভার ও এর আশেপাশের এলাকায় দিনে ৩ বারখাবার গ্রহণ করে।

গবেষণার আলোচ্য গ্রাম পর্যায়ের রোগীরা ও তাদের পরিবার প্রতিদিন ৪ বার খাদ্য গ্রহণ করে। যেমন প্রথমতঃ সকাল ৭টা হতে ৮টার মধ্যে দ্বিতীয়ত ঃ দুপুর ১২টা হতে ১ টার মধ্যে তৃতীয়ত ঃ বিকার ৪টা হতে ৫টার মধ্যে এবং সবশেষ চতুর্থত ঃ রাত ৭ টা হতে ৯ টার মধ্যে খাবার গ্রহণ করে। থানা সদর বা পৌর এলাকার রোগীরা দিনে ৩ বার খাবার করে। তবে তারা বিকালে হালকা নাস্তা বা চা-বিস্কুট খেয়ে থাকে। পৌর এলাকার খাবার সময় হলো সকাল ৮টা হতে ৯টার মধ্যে প্রথম বার, দুপুর ১টা হতে ৩টার মধ্যে দ্বিতীয় বার এবং বিকাল ৫টা হতে ৬টার মধ্যে হালকা চা-বিস্কুট এবং সবশেষ রাত ৯টা হতে ১০টার মধ্যে তৃতীয় বার খাবার গ্রহণ করে। প্রতি বার (ওয়াক্তে) তারা যে সব খাদ্য খায় তার মধ্যে কিছু বৈচিত্রতা দেখা যায়। যেমন- গ্রাম এলাকায় সকালে বেশীর ভাগ লোক তথা রোগী পান্তা ভাত ও ঠান্ডা বা বাঁশি তরকারী খায়। খাবার পরিমাণ ও খুব কম। অর্থাৎ পেট পুরে তারা খায় না। যা খায় তাতে পুষ্টি মানও খুব কম থাকে। এ সময়ে তারা ১০০ গ্রাম হতে ২০০ গ্রাম ভাত খায়। তরকারী খায় প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অনেকে শুধু মরিচ, লবণ, পিয়াজ দিয়ে ভাত খেয়ে ওঠে যায়। পৌর এলাকায় সকালে বেশীর ভাগ লোক রুটি বা গরম ভাত

খায়। এ সময় ভাতের সাথে বেশীর ভাগ লোক বিভিন্ন ধরণের সবজি ভাজি ও শাক খায়। অনেকে আবার পাঁচ মিশালী সবজিও খেয়ে থাকে। তবে এর পরিমাণ ও প্রয়োজনের তুলনায় কম। গ্রাম ও শহর এলাকায় দুপুরে সবাই গরম ভাত ও গরম তরকারী খায় এই সময়ে (ওয়াক্তে) তারা সবাই মোটামুটি পেট পুরে ভাত খায়। কিন্তু তরিতরকারী বা সবজি প্রয়োজনানুসারে খেতে পারে না, আয় রোজগার কম বলে। গ্রামে তৃতীয় বার ঠান্ডা ভাত ও ঠান্ডা তরকারী খায়। অনেকে গরম তরল ভাত ও বিভিন্ন ধরণের ভর্তা খেয়ে থাকে। শহর এলাকার মানুষ তথা রোগীরা অল্প পরিমাণ ভাত খায়। কেননা তারা মাঝে মাঝে হালকা নাস্তা খায়। রাতে গ্রামীণ এলাকায় গরম ভাতও গরম তরকারী খেয়ে থাকে। কিন্তু পৌর এলাকায় রাতে ঠান্ডা ভাত ও ঠান্ডা তরকারী খায়।

আলোচ্য রোগীরা তাদের খাবার মেনুতে বা প্রতিবারে (ওয়াক্ত) যে সমস্ত শাক সবজি খায়। তারমধ্যে আলু, পটল, ঝিংগা, কচু, কচুর গাটি, মুলা, কুমড়া, লাউ, সীম, করল্লা, ডাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আলু সবাই একটু বেশী খায় এবং ডাল একটু কম খায়। শাকের মধ্যে পুই শাক, ডাটা শাক, পালন শাক, কচু ধনে পাতা, কলমি পাতা শাক ইত্যাদি শাক খায়। এর মধ্যে ডাটা ও পুঁই শাক সবাই একটু বেশী খায় এবং কচু শাক খুব কম খায়। অবশ্য প্রাপ্যতার কারণে এবং রুচির কারণে এরূপ কম-বা-বেশী খাওয়া হয়। অর্থাৎ যে সময়েযে শাক-সবজি বেশী পাওয়া যায় সেই সময় সেই শাক সবজি তারা বেশী খায়। তবে দেহের প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। গবেষণা এলাকার লোকেরা যে সমস্ত তরিতরকারী উৎপাদন করে এবং বাজারে বিক্রি করে সেগুলোর মধ্যে পটল, কুমড়া, কচু, কচুর গাটি, লাউ, ডাটা, ঢেরস, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আক্রান্তকারী রোগীরা আমিষ জাতীয় খাবার খুবই অল্প খায়। কেননা এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের দাম খুব বেশী। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের মিঠা পানির মাছ। এর মধ্যে, পুকুরে চাষকৃত, রুই নলা, কাতল, পাংঘাস মাগুর, তেলাপিয়া ও অন্যান্য পোনা জাতীয় মাছ। নদীতে পাওয়া যায় শোল, বোয়াল, কই, সিং, পুটি, টেংরা, বাইলা, বাইম ও অন্যান্য অনেক শ্রেণীর মাছ। এগুলো বাজারে ও খুব বিক্রি হয়, তবে দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় অল্প আয়ের লোকজন তথা আক্রান্ত রোগীরা প্রতিদিন কিনতে পারে না এবং খেতেও পারে না। আমিষ জাতীয় অপর একটি উল্লেখযোগ্য খাদ্য হলো মাংশ। গবেষণা এলাকায় গরু, খাশি এবং দেশী ও ফার্মের মুরগীর মাংশ পাওয়া যায়। তবে খাশি ও দেশী মুরগীর মাংশ খুবই কম পাওয়া যায় এবং দাম ও অথ্যাধিক। আক্রান্ত রোগীরা এসব খাবার মাসে একদিন বা দুদিন খায়। অনেকে ছয় মাস পর আত্মীয়-স্বজন আসলে একদিন খায়। অপর একটি আমিষ জাতীয় খাদ্য হলো দুধ। এটি আক্রান্তকারী রোগীরা মোটামুটি দু-চার দিন অন্তর খেয়ে থাকে। তবে উক্ত সব খাদ্যের

প্রতি আক্রান্ত রোগীদের আকর্ষণ বা রুচী কেমন তা জানতে চাওয়া হলে তারা নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৭.৫ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি দিনের খাবারের প্রতি রুচি

খাওয়ার রুচি	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
ভাল না	১১	৩.৭
মোটামুটি ভাল	২৩২	৭৭.৩
ভাল	৫৭	১৯.০
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

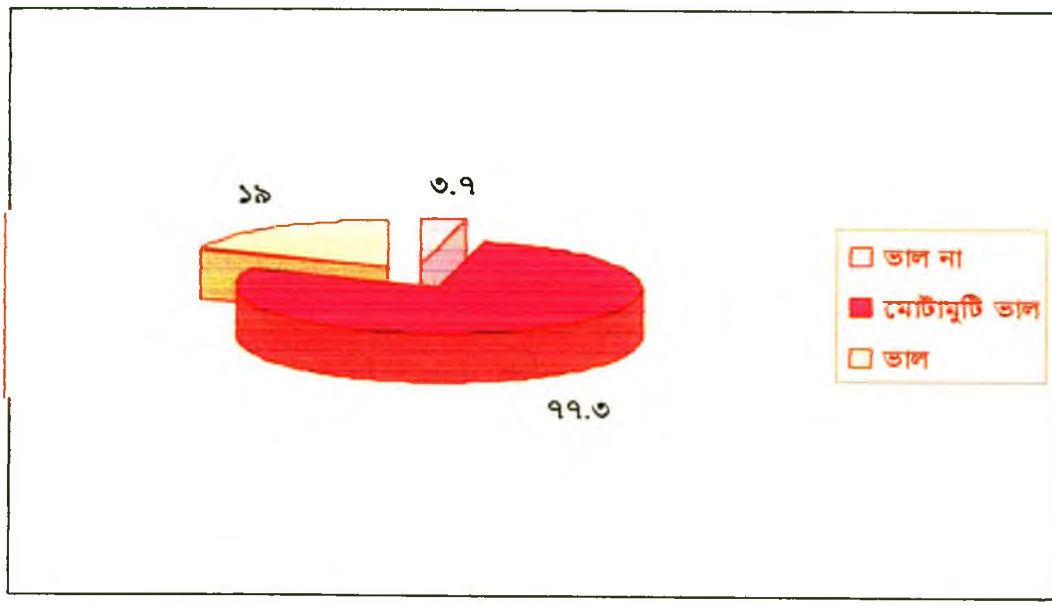

চিত্র ৭.১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি দিনের খাবারের প্রতি রুচি

সারণীতে দেখা যাচ্ছে মোট ৩০০ জন রোগীর মধ্যে মাত্র ১১ জন রোগী বলেছে তাদের খাওয়ার প্রতি ভাল রুচি নেই। অবশ্য বয়স ও রোগ শোকের উপর খাদ্যের রুচি অনেকটা নির্ভর করে। সাধারণত দেখা গেছে যাদের বয়স ৫০ বা ৬০ বছরের উপরে এবং যারা আর্সেনিকোসিস সহ অন্যান্য কিছু রোগ দ্বারা বেশী আক্রান্ত তাদের খাদ্যের প্রতি অনিহা একটু বেশী। ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক কমে গেছে। ৭৭.৩% রোগী রয়েছে যাদের খানা-খাদ্যের প্রতি মোটামুটি ভাল রুচি আছে। কিন্তু রুচি থাকলেও কেনার সামর্থ নেই অনেকেরই । তাই তারা অপ্রতুল খাদ্য গ্রহণ করে। খাবার প্রতি সর্বদা রুচি ভাল এমন রোগীর সংখ্যা পাওয়া গেছে মাত্র ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

জন। যা মোট রোগীর শতকরা ১৯ শতাংশ। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে খানা-খাদ্যের প্রতি খুব ভাল রুচি আছে এমন রোগীও কম নয়। তবে বয়স শ্রেণীতে হিসেব করলে দেখা যায় এরা সবাই মাঝারি বয়সের।

রোগ সনাক্ত করণের আগে ও পরে রোগীদের খাবার রুচি কেমন এবং খাদ্য তালিকার কোন পরিবর্তন করেছে কিংবা হয়েছে কিনা ? এরূপ প্রশ্ন করা হলে রোগীরা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৭.৬ ঃ আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণের পর রোগীদের খাদ্যভাসের পরিবর্তন

খাদ্যাভাস মন্তব্য	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৯৪	৬৪.৭
না	১০৬	৩৫.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

তালিকায় দেখা যাচ্ছে রোগীদের রোগ সনাক্তের পর তাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন করেছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৬৪.৭% রোগী বলেছে হ্যাঁ তারা খাদ্যাভাসের কিছুপরিবর্তন করেছেন। কিন্তু ৩৫.৩% রোগী বলেছে তাদের খাদ্যাভাসের তেমন কোন পরিবর্তন করেনি। যারা খাদ্যাভাসের কিছুটা পরিবর্তন করেছেন তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পানি একটু বেশী পান করছে ও শাক সবজী জাতীয় খাবার বেশী খাচ্ছে ও অনেক পুই শাকের পরিবর্তে ডাক্তারী উপদেশ অনুসারে কচু শাক একটু বেশী খাচ্ছে, কেউ কেউ দিনে ৩ বার খেত রোগ সনাক্তের পর দিনে চার খাচ্ছে। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস সনাক্ত করণের পর রোগীদের খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন লক্ষণীয় তা নিম্নে টেবিলের সাহায্যে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ৭.৭ ঃ রোগ সনাক্তের পর খাদ্যাভাসের পরিবর্তন সমূহ

পরিবর্তনের ধরণ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
১. পূর্বের তুলনায় অধিক পানি পান করা	৫৮	১৯.৩
২. পূর্বের তুলনায় অধিক শাকসবজি খাওয়া	৯৫	৩১.৭
৩. পূর্বের তুলনায় তেল এবং মসলা জাতীয় খাবার কম খাওয়া	২৪	৮.০
৪. বাসি পচা খাবার খাওয়া না করা	১৬	৫.৩
৫. প্রতিদিন ৪ বার খাবার গ্রহণ করা	১	.৩
৬। প্রযোজ্য নয় / যাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন হয় নাই	১০৬	৩৫.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

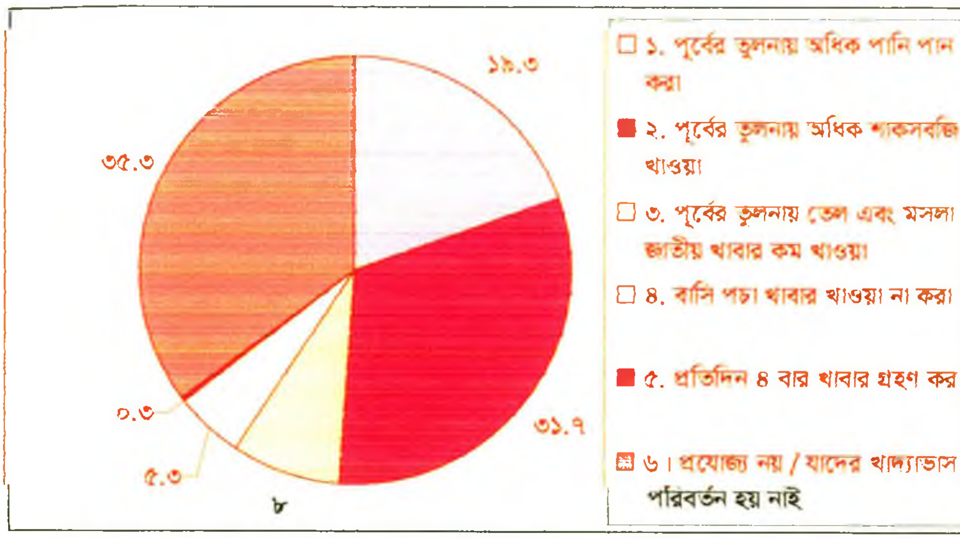

চিত্র ৭.২ ঃ রোগ সনাক্তের পর খাদ্যাভাসের পরিবর্তন সমূহ

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ১৯৪ জন রোগীর আর্সেনিকোসিস ধরা পড়ার পর তারা তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভাসের কিছু পরিবর্তন করেছে। অবশ্য এই পরিবর্তনটা এসেছে মূলত বিভিন্ন N.G.O কর্মীদের পরামর্শের মাধ্যমে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, খাদ্যাভাসের যে পরিবর্তন তা রোগ প্রতিরোধ করার নিমিত্তেই। মোট ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ৫৮ জন তথা ১৯.৩% রোগী তাদের খাদ্যাভাসের যে পরিবর্তন করেছেন তা হলো, তারা পূর্বের তুলনায় একটু বেশী পানি পান করেছে। অনেকে শাক-সবজিটা একটু বেশী খাচ্ছে। এর পরিমাণ ৩১.৭ শতাংশ। তেল ও মসলা জাতীয় খাবার ও অনেকে কম খাচ্ছে। বাসি খাবার ও অনেক রোগীরা একটু কম খাচ্ছে, শুধু তাই নয় অনেকে দিনে ৪ বার বা ৫ বার অর্থাৎ ঘন ঘন খাবার খাচ্ছে। অনেকে আবার খাবার তালিকাও বৃদ্ধি করেছে। এরা দিনে ৩ বারের পরিবর্তে ৪ বার খাচ্ছে। তবে সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে, বেশীর ভাগ রোগী শাক সবজি খাওয়ার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে কেননা সবজি খেলে রোগীর আর্সেনিকোসিস হতে আরোজ্ঞ লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাদের ধারণা এবং ডাক্তারের ও পরামর্শ। অর্থাৎ রোগ ধরা পরার পর ৩১.৭% রোগীই শাক সবজি খাওয়াটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পরেও আগে রোগীদের খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যবধান লক্ষ করা যায় তা অপর পৃষ্ঠায় সারণীতে দেখানো হল।

সারণী ৭.৮ ঃ আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পূর্বে ও পরে রোগীরদের প্রতিদিনের খাবার গ্রহণ

প্রতিদিনের খাবার গ্রহণ	সনাক্ত করণের পূর্বে		সনাক্ত করণের পরে	
	গণ সংখ্যা	শতকরা হার	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
দিনে দুই বার	১৬	৫.৩	-	-
দিনে তিন বার	২৪৫	৮১.৭	১৮৮	৬২.৭
দিনে চার বার	৩৯	১৩.০	১১২	৩৭.৩
মোট	৩০০	১০০.০	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫ ।

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে সব রোগী দিনে ২ বার মাত্র খাবার খেত, তাদের আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর দিনে ২ বারের পরিবর্তে ৩ বার বা ৪ বার খাবার খাচ্ছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে রোগ সনাক্তের পূর্বে মাত্র ১৩% রোগী দিনে ৪ বার খাবার খেত। কিন্তু রোগ সনাক্তের পর দেখা যাচ্ছে সেটি বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৭.৩%। অর্থাৎ প্রায় ২৪.৩% রোগী পূর্বের তুলনায় ঘন ঘন খাবার খাচ্ছে। যদিও শিবচর এলাকার সাধারণ জনগণের বেশীর ভাগই দিনে ৩ বার খাবার খেতে অভ্যস্ত। অবশ্য অনেক রোগী ক্ষুধা মন্দার কারণেও প্রতিদিন বার বার খাবার খায়। বিষয়টি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো।

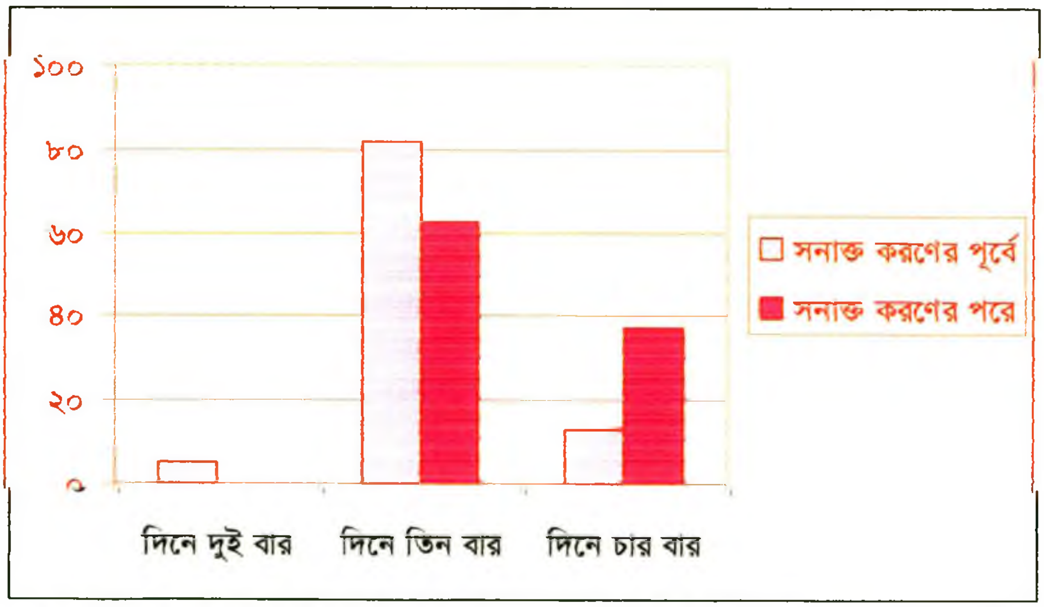

চিত্র ৭.৩ ঃ আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পূর্বে ও পরে রোগীরদের প্রতিদিনের খাবার গ্রহণ

৫. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বিভিন্ন ধরণের শাক খাবার প্রতি আগ্রহ, অনাগ্রহ ও পরিবর্তন

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ হওয়ায় এ দেশের আনাচে-কানাচে প্রচুর শাক-সবজি জন্মানো সম্ভব। গবেষণা এলাকা শিবচর ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই থানার পৌর এলাকাসহ গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই শাক-সবজী জন্মানো যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় স্থানীয় লোকজন শাক-সবজির চাষাবাদ তেমন একটা করে না। ফলে বাজারে প্রাপ্ত শাক-সবজিই তাদের গ্রহণকৃত শাকের যোগান দেয়। আর বাজারে প্রাপ্ত শাক-সবজির বেশীর ভাগই আসে অন্যান্য জেলা হতে। বিশেষ করে যশোর জেলা হতে। এ সকল শাক সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। যেমন- স্থানীয় ভাবে যে সকল শাক-সবজি উৎপাদিত হয় বা নিজেরা চাষ করে তার বেশীর ভাগই তারা সাধারণ ভাবে চাষ করেছে এবং বাজার হতে যে গুলো কিনে এনেছে তার বেশীর ভাগই সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করেছে।

জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীরা তাদের আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পূর্বে ও পরে যে সমস্ত শাক একটু বেশী খেত তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

সারণী ৭.৯ ঃ রোগীদের রোগ সনাক্তের আগে ও পরে অধিক গ্রহণকৃত শাক-সবজী

গ্রহণকৃত শাকের প্রকৃতি	রোগ সনাক্ত করণের পূর্বে		রোগ সনাক্ত করণের পরে	
	গণ সংখ্যা	শতকরা হার	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
পুঁই শাক	১৩৫	৪৫.০	১২০	৪০.০
ডাটা শাক	১২৯	৪৩.০	৯০	৩০.০
কচু শাক	৩৬	১২.০	৯০	৩০.০
মোট	**৩০০**	**১০০.০**	**৩০০**	**১০০.০**

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে সকল ক্ষেত্রেই রোগীরা পুঁই শাক একটু বেশী খেত বা পুঁই শাক খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সবার বেশী। অবশ্য এই শাকটি গবেষণা এলাকা শিবচরের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। তাই এই শাক খাওয়ার প্রতি বেশী আগ্রহের কারণ হতে পারে। কেননা শিবচরে বাজারে শাকের খুব দাম। তাছাড়া শিবচর বাজারের বেশীর ভাগ শাক সবজিই

Dhaka University Institutional Repository

আমদানীকৃত। আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পূর্বে ৪৫% রোগী পুঁই শাক বেশী খেত। আর আর্সেনিকোসিস নিশ্চিত হওয়ার পর এই হার কমে হয়েছে ৪০.০%। তথাপিও বেশীর ভাগ রোগীই পুঁই শাক বেশী খাচ্ছে। এরপর যে শাকটি রোগীরা বেশী খেয়েছে তা হলো ডাটা শাক। পুঁই শাক বেশী খাওয়ার পেছনে স্থানীয় ভাবে উৎপাদনের কারণ হতে পারে। শিবচরে রয়েছে অনেক পানে বরজ। আর এই পানের বরজের বাইরের পার্শ্বে জমির বেড়া হিসেবে পুঁই গাছ লাগানো হয়। ফলে জমির বেড়াও হয়, আবার শাক খাওয়ার কাজটিও চলে যায়। এখানকার বাজারেও প্রচুর পুঁই শাক পাওয়া যায়। এ সব পুঁই শাকের চাষ সাধারণ ভাবেই হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে বেশ কিছু পুঁই শাকের ডগা আটি বাঁধা অবস্থায় বাজারে আসে যা সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত। সারণীতে দেখা যাচ্ছে আর্সেনিকোসিস সনাক্তের পূর্বে ১৩৫ জন রোগী পুঁই শাক খাওয়ার প্রতি বেশী আগ্রহ ছিল। কিন্তু আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর পুঁই শাক খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। হয়ত অন্যান্য শাক খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে যেমন কচু শাক, পালং শাক ইত্যাদি। অর্থাৎ রোগ সনাক্তের পরে মাত্র ১২০ জন রোগী পুঁই শাকে অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে। অর্থাৎ ৪৫% হতে কমে গিয়ে ৪০% এ দাড়িয়েছে। অপর একটি শাক শিবচরের বাজারে প্রচুর দেখা যায় তা হলো ডাটা শাক। এই শাকও মানুষ বেশ খায়, তবে আগ্রহ তেমন একটা নেই। রোগীদের মধ্যে দেখা যায় আর্সেনিকোসিস সনাক্তের পূর্বে মাত্র ১২৯ জন রোগী বা ৪৩.০% রোগীর ডাটা শাক খাওয়ার প্রতি আগ্রহ ছিল। কিন্তু রোগ সনাক্তের পরে মাত্র ৯০ জন রোগী বা ৩০% রোগীর ডাটা শাকের প্রতি অধিক আগ্রহ রয়েছে। তবে একটা বিষয় আমি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাহলো বিভিন্ন ধরণের শাক এই এলাকার গরীব মানুষের প্রধান খাদ্য। কারণ অন্যান্য সবজি খুব কম পাওয়া যায় এবং বাজারেও প্রচুর দাম। এ অঞ্চলের লোকেরা তথা রোগীরা উক্ত তিনটি শাক ছাড়াও পালং শাক, কচুর লতি, কলমি শাক, পাট শাক ইত্যাদি ঋতু ভিত্তিক শাক খেয়ে থাকে।

অপর পৃষ্ঠায় তালিকার মাধ্যমে উল্লেখিত তিনটি শাকের পুষ্টি উপাদান (১০০ গ্রামে) উল্লেখ করা হলো

সারণী ৭.১০ ঃ কচু, পুই ও ডাটা শাকের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান (১০০ গ্রামে)

শাক	জলীয় অংশ গ্রাম	খনিজ পদার্থ গ্রাম	আশ গ্রাম	খাদ্য শক্তি K.Calory	আমিষ গ্রাম	চর্বি গ্রাম	শর্করা গ্রাম
কচু শাক	৮২.৭	২.২	২.৯	৫৬	৩.৯	১.৫	৬.৮
পুঁই শাক	৯২.০	১.৪	-	২৭	২.২	০.২	৪.২
ডাটা শাক	১৪.৩	০.৫	১.০	২২	১.৮	০.২	৩.৩

সারণী ৭.১০ ঃ কচু, পুই ও ডাটা শাকের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান (১০০ গ্রামে)

শাক	ক্যালসিয়াম মিলিগ্রাম	লৌহ মিলিগ্রাম	ক্যারোটিন মিলিগ্রাম	ভিটা বি-১ মিলিগ্রাম	ভিটা বি-২ মিলিগ্রাম	ভিটা সি মিলিগ্রাম
কচু শাক	২২৭	১০.০	১০২৭৮	০.২২	০.২৬	১২
পুঁই শাক	১৬৪	১০.০	১২৭৫০	০.০২	০.৩৬	৬৪
ডাটা শাক	৮০	২৫.৫	১০১০০	০.২৬	০.১৮	৭৮

উৎস ঃ দেশীয় খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিমান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপরে আলোচিত শাক সবজি, যা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তরা প্রতিনিয়ত খাচ্ছে। সেগুলো কিভাবে উৎপাদিত সে সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হলে রোগীরা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৭.১১ ঃ রোগীদের গ্রহণকৃত শাকের উৎপাদন পদ্ধতি

উৎপাদন পদ্ধতি	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
সাধারণ ভাবে চাষ	১৮২	৬০.৭
সেচের মাধ্যমে চাষ	৮০	২৬.৭
সাধারণ + সেচের মাধ্যমে	২৭	৯.০
অন্যান্য / জানেনা	১১	৩.৬
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

টেবিলে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ রোগীরা বলেছে, তারা যে শাক খায় তা তারা নিজেরা চাষ করে এবং সাধারণ ভাবেই চাষ করে, সেচ তেমন দেয় না, দিলেও নদীর পানি কলসিতে করে নিয়ে দেয়। অর্থাৎ রোগীরা যে শাক-সবজি খায় তা অধিকাংশ বিনা সেচে উৎপাদিত। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ে রয়েছে সেচের চাষ ব্যবস্থা। অর্থাৎ ২৬.৭% রোগী সেচের মাধ্যমে চাষ করা শাক খায়। এই সেচের মাধ্যমটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেলো টিউবওয়েল। আর এই সেলো টিউবওয়েলের পানিতে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিকের বিষ। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে দু ধরণের চাষাবাদ পদ্ধতি। তা হলো সাধারণ ভাবে এবং সেচের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে রোগীরা বলেছে, তারা যে শাক খায় তা সাধারণ ভাবে নিজেরা চাষ করে এবং বাজার হতে যে গুলো কিনে আনে তা বেশীর ভাগই সেচের মাধ্যমে চাষ করা। এরূপ রোগীর সংখ্যা পেয়েছি ২৭ জন। এছাড়া আরো ১১ জন বা ৩.৬% রোগীদের মতামত, যে সব শাক তারা বাজার হতে এনে রান্না করে খায় তা বিক্রেতারা কিভাবে চাষ করে বা কোথা হতে আনে তা আমরা কিছুই জানেনা।

৬. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পানি পান ও হাঁটা চলাফেরার অভ্যাস

'পানির অপর নাম জীবন'। বর্তমান কথাটি আর ঠিক নয়। কেননা দূষিত পানির অপর নাম মরণ। তাই বর্তমান বলা হয়ে থাকে। দূষণ মুক্ত নিরাপদ পানির অপর নাম জীবণ। অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মতো অধিক পরিমাণ নিরাপদ পানি পান করলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উক্ত গবেষণায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পানি পানের প্রতি কেমন আগ্রহ আছে বা অতীতে ছিল। তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে গবেষণা এলাকার ৩০০ জন রোগীর নমুনা জরিপে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা নিম্নে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৭.১২ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের দৈনিক বর্তমান ও রোগ সনাক্তের পূর্বে পানি পানের পরিমাণ

পানি পানের পরিমাণ (লিটার)	আর্সেনিকোসিস সনাক্তের পূর্বে		আর্সেনিকোসিস সনাক্তের পরে	
	গণ সংখ্যা	শতকরা হার	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
২ থেকে ৪ লিটার	২৩৯	৭৯.৬৭	১৭২	৫৭.৩৩
৫ থেকে ৭ লিটার	৬১	২০.৩৩	১২৮	৪২.৬৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

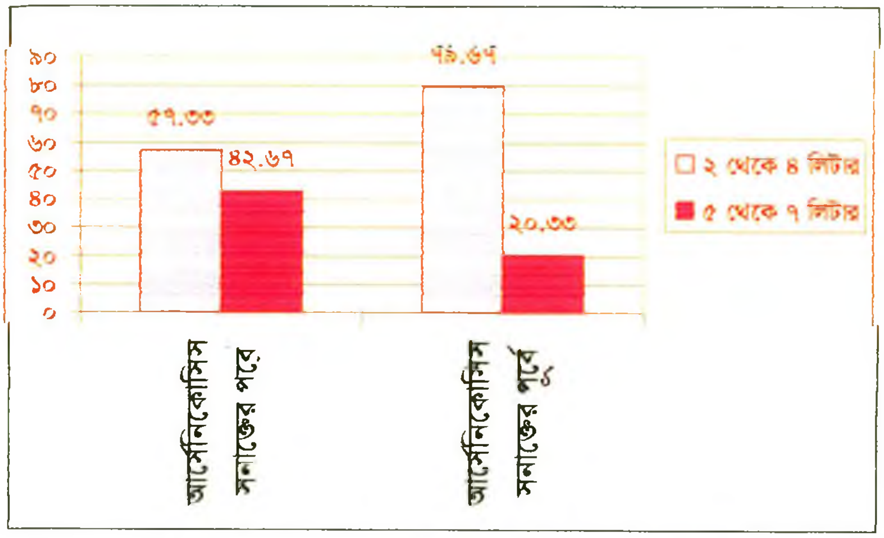

চিত্র ৭.৪ ঃ আক্রান্ত রোগীদের পানি পানের অভ্যাস

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, আর্সেনিকোসিস ধরা পড়ার পূর্বে প্রতিদিন ২ থেকে ৪ লিটার পানি পান করত এমন রোগীর সংখ্যা ছিল ২৩৯ জন। যা মোট রোগীর ৭৯.৬৭% আর্সেনিকোসিস সনাক্তের পরে বা বর্তমান প্রতিদিন ২ থেকে ৪ লিটার পানি পান করে এমন রোগীর সংখ্যা কমে গিয়ে হয়েছে ১৭২ জন। যা মোট রোগীর ৫৭.৩৩%। এক্ষেত্রে রোগীর ২ থেকে ৪ লিটার মাত্রায় পানি পানের পরিমাণ কমে গিয়েছে ২২.৩৪% রোগীর। অর্থ্যাৎ দিনে ৫ থেকে ৭ লিটার পানি প্রতিদিন পান করে এমন রোগীর সংখ্যা পূর্বে ছিল ২০.৩৩% পরে বা বর্তমান হয়েছে ৪২.৬৭%। টেবিলে দেখা যাচ্ছে রোগ সনাক্তের পরে মানুষ বেশী পানি পান করছে। মোট ৩০০ জন রোগীর মধ্যে রোগ সনাক্তের পরে ১২৮ জন বা ৪২.৬৭% রোগী প্রতিদিন ৫ তেকে ৭ লিটার পানি পান করছে। রোগ সনাক্তের পূর্বে এই মাত্রায় পানি পানের রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬১ জন বা ২০.৩৩%। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর বেশীর ভাগ রোগীই পানি পানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের প্রতি ডাক্তারদের পরামর্শ হলো। বেশী করে শাক-সবজি খাবেন এবং আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান করবেন।

রোগীদের দৈনিক হাঁটা-চলার পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে তাদের রোগাক্রান্ত হওয়া ও রোগ হতে মুক্তি পাওয়া সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। সাধারণ একজন সু-স্বাস্থ্যবান মানুষ দৈনিক গড়ে ৮-১০ ঘন্টা হাটে বা চলাফেরা করে বা করা উচিৎ কিন্তু রোগীদের ক্ষেত্রে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

প্র. পৃ. দ্র.

সারণী ৭.১৩ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের দৈনিক গড় হাটার স্থিতিকাল

হাটার স্থিতিকাল	গণসংখ্যা	শতকরা হার
০ – ৩ ঘণ্টা	৪২	১৪.০০
৪ – ৬ ঘণ্টা	১৬০	৫৩.৩৩
৭ – ৯ ঘণ্টা	৮৩	২৭.৬৭
১০ – ১২ ঘণ্টা	১৫	৫.০০
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

বিষয়টি নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

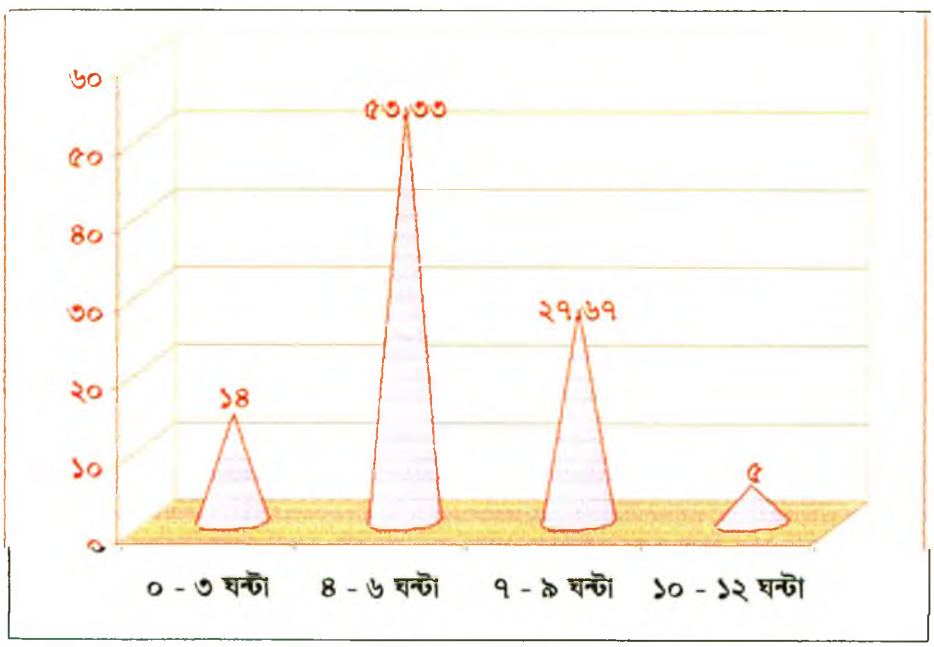

চিত্র ৭.৫ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের দৈনিক গড় হাটার স্থিতিকাল।

রোগীদের গড় হাটার স্থিতিকাল হলো ৫.৬৪ ঘন্টা, রোগীদের সবচেয়ে বেশী হাটার স্থিতিকাল হলো ৫.০০ ঘন্টা, রোগীদের মধ্যম হাটার স্থিতিকাল হলো ৫.০০ ঘন্টা, রোগীদের হাটার স্থিতিকালের পরিমিত ব্যবধান হলো ২.১২ ঘন্টা। সারণীতে লক্ষ্যণীয় দিনে ৪-৬ ঘন্টা হাটা চলাফেরা করা রোগীর সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ ৫৩.৩৩% রোগী দিনে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা করে হাটে।

সবচেয়ে কম বা মাত্র ৫% রোগী রয়েছে যারা দিনে ১০-১২ ঘন্টা হাটে এবং মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে দিনে ৭-৯ ঘন্টা হাটার রোগীরা। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে আরো লক্ষণীয় যে সর্ব নিম্ন হাটার তালিকায় রয়েছে মাত্র ১ ঘন্টা বা তারও কমএবং এমন রোগীর সংখ্যা মাত্র ১ জন এবং সবচেয়ে বেশী হাটা এমন রোগীও মাত্র ১ জন, দিনে ১২ ঘন্টা হাটে। সর্বাধিক রোগী রয়েছে যারা দিনে ৫ ঘন্টা করে হাটে। উপরোক্ত রোগীদের গড় হাটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়যে তারা গড়ে ৫.৬৪ ঘন্টা করে হাটে। এক্ষেত্রে মধ্যম পর্যায়ে রয়েছে ৫ ঘন্টা হাটার রোগীরা। উপরোক্ত সারণীর পরিমিত ব্যবধান বা গড় হাটা হতে ব্যবধান হলো ২.১২ ঘন্টা।

৭. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বর্তমান প্রতিদিনের গ্রহণকৃত খাদ্যের কিলো-ক্যালোরিও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টি উপাদান

আমাদের ক্ষুধা পায় তাই আমরা আহার গ্রহণ করি। দিনে যতবার ক্ষুদা পায় ততবারই আমরা কিছু না কিছু খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করি। এই ক্ষুধা নিবারণের অর্থ হলো আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করা বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধ করা। তাই আমাদের শরীরের যেমন রয়েছে কাজ করার শক্তি তেমনই রয়েছে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। যার স্বাস্থ্য ও শরীরের পুষ্টিমান যত ভাল তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও কাজ করার ক্ষমতা তত বেশী। অতএব পুষ্টিমানের সঙ্গে বা ক্যালোরী গ্রহণের সঙ্গে শরীরের রোগ হওয়ার ও প্রতিরোধ করার রয়েছে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক। অপরিমিত খাদ্য, চরম দরিদ্রতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে বিরাজমান এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের সাথে একটি নিবিড় যোগসূত্র কাজ করছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা, থানায় মানুষের পুষ্টিহীনতার সাথে বিভিন্ন রকম রোগাক্রমনের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ও মহামারী। বর্তমান বাংলাদেশে সর্বাধিক আলোচিত এমনই একটি মহামারী রোগ হলো আর্সেনিকোসিস। আমরা সকলেই জানি যে আজকাল অনেক মারাত্মক রোগের টিকা আবিস্কৃত হয়েছে। এসব টিকা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তবে এই টিকা সকল ক্ষেত্রে যে পুরোপুরি কার্যকরী হবে এমনটিও নয়। সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে, যেখানে পুষ্টিহীনতা নেই বললেই চলে সে সব দেশে নির্দিষ্ট নিয়ম ও সময়সূচী অনুসারে টিকা নিলে মানুষ অনেক মারাত্মক রোগের হাত হতে রক্ষা পায়। কিন্তু আমাদের মত গরীব সব দেশ যেখানে পুষ্টিহীনতা রয়েছে সে সব দেশে এ সকল টিকা যথাযথভাবে কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ পুষ্টিহীনতার কারণে প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকশন সব সময় ঠিকমত প্রতিরক্ষিকা

(Antibody) তৈরী করতে পারেনা। বর্তমান আমাদের দেশে এমন কিছু মারাত্মক রোগ আবিস্কৃত হয়েছে, যার কোন টিকা বা ইনজেকশন এখনও আবিস্কৃত হয় নাই। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রতিষেধক হলো আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী করে রাখা। তারজন্য চাই পুষ্টিকর ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধিগুলো যথাযথভাবে পালন করা।

নিম্নে বিভিন্ন বয়সের মানুষের প্রতিদিন কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন তার একটি তালিকা ও পাশাপাশি শিবচর থানার আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত বিভিন্ন বয়সের রোগীরা কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

সারণী ৭.১৪ ঃ আক্রান্ত রোগীদের বয়সানুসারে দৈনিক গড় প্রয়োজনীয় কিলো ক্যালোরীর তালিকা।

বয়স শ্রেণী	গণ সংখ্যা	শতকরা করা	প্রয়োজনীয় কিলো ক্যালরী	
			পুরুষ	স্ত্রী
১৬ – ১৯	১২	৪.০	২৮২০	২১০০
২০ – ৩৯	৯১	৩০.৩	২৭৬০	২০০০
৪০ – ৪৯	৮০	২৬.৭	২৬২০	১৯০০
৫০ – ৫৯	৮২	২৭.৩	২৪৮০	১৮০০
৬০ – ৬৯	২৯	৯.৬	২২১০	১৬০০
৭০ +	৬	২.০	১৯৩০	১৪০০

উৎস ঃ দেশীয় খাদ্যের পুষ্টিমান, পুষ্টি ও খাদ্য ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সারণী ৭.১৫ ঃ আক্রান্ত রোগীদের দৈনিক গড় গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরীর তালিকা

দৈনিক গ্রহণীয় কিলো ক্যালরী	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
১২০০ – ১৪০০	৬৭	২২.৩৩
১৪০১ – ১৬০০	১২৫	৪১.৬৭
১৬০১ – ১৮০০	৮৯	২৯.৬৭
১৮০১ – ২০০	১৮	৬.০৩
২০০১ +	১	০.৩০
মোট	৩০০	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

আক্রান্তকারী রোগীদের সর্বোচ্চ গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী =	২১০০.০০
আক্রান্তকারী রোগীদের সর্বোনিম্ন গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী =	১২০০.০০
আক্রান্তকারী রোগীদের গড় গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী =	১৫৭৪.১৮
আক্রান্তকারী রোগীদের মধ্যমান গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী =	১৫৫০.০০
আক্রান্তকারী রোগীদের সবচেয়ে বেশী গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী =	১৫০০.০০
আক্রান্তকারী রোগীদের পরিমিত ব্যবধানের গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী =	১৭৬.৬৭৯

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫ ।

আক্রান্ত রোগীদের দৈনিক গ্রহণকৃত কিলো-ক্যালোরি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হবে।

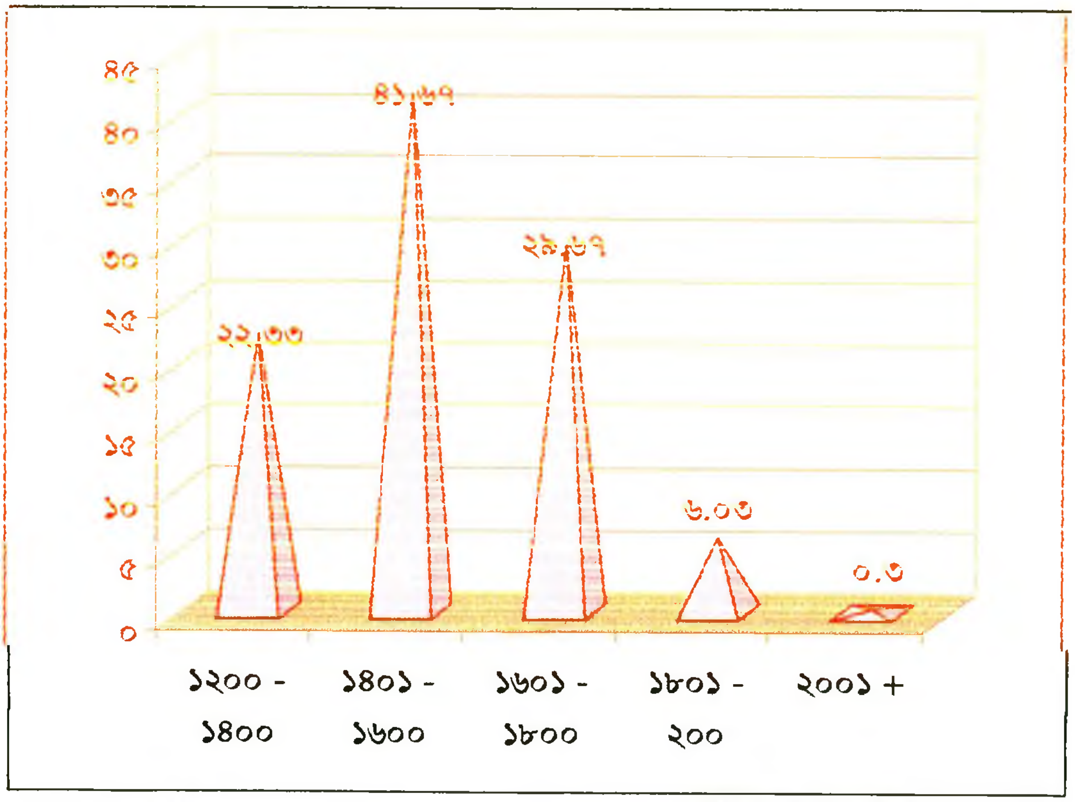

চিত্র ৭.৬ ঃ আক্রান্ত রোগীদের দৈনকি গ্রহণকৃত কিলো-ক্যালোরি

উপরোক্ত টেবিলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের মানুষের জন্য যতটুকু পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করা প্রয়োজন তার তুলনায় খুবই কম পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে। বিশেষ করে আক্রান্তস্থ গরীব রোগীরা খুবই কম তাপশক্তি বা কিলো-ক্যালোরি গ্রহণ করে। পুষ্টি উপাদান গুলোর মধ্যে শক্তি ও উত্তাপ উৎপাদনকারী কিলো ক্যালোরীই অধিক

গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে একজন বাড়ন্ত বয়সী পুরুষ বা মহিলা যাদের বয়স ১৬-১৯ বছর। এই বয়সী পুরুষের দৈনিক গড়ে ২৮২০ কিলো ক্যালোরীর প্রয়োজন। সেখানে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত একই বয়সী একজন রোগী দৈনিক গ্রহণ করতে পারছে মাত্র ১৫০০ থেকে ১৯০০ বা ২০০০ কিলো ক্যালোরী। এই বয়সী মহিলাদের দৈনিক প্রয়োজন ২১০০ কিলো ক্যালোরী। সেখানে একজন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত মহিলা রোগী পাচ্ছে মাত্র ১৪০০-১৬০০ কিলো ক্যালোরী। উপাত্ত বিশ্লেষণের অপর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি, গবেষণা এলাকা হতে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৬-১৯ বছর বয়সী রোগী রয়েছে ৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ১২ জন বা ৪%। উক্ত ৪% রোগীর প্রতিদিন প্রয়োজন (পুরুষ) ২৮২০ কিলো ক্যালোরী এবং (স্ত্রী) ২১০০ কিলো ক্যালোরী। সেখানে ২১০০ কিলো ক্যালোরী গ্রহণ করা মাত্র একজন পুরুষ রোগী পাওয়া গেছে যা শতকরা হারে দাড়ায় ০.৩%। অর্থাৎ মাত্র ০.৩% রোগী প্রতিদিনি ২১০০ কিলো ক্যালোরী গ্রহণ করে। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অপর পক্ষে ২৮২০ কিলো ক্যালোরী গ্রহণ করে এমন রোগী একজনও পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ প্রত্যেকটি রোগীর ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৮০০ থেকে ৯০০ বা তারও অধিক কিলো ক্যালোরী। ফলে তারা (রোগী) আক্রান্ত হয়ে পড়ছে আর্সেনিকোসিস-সহ অন্যান্য জটিল রোগে। প্রয়োজনীয় কিলো ক্যালোরী ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারলে হয়ত তারা (রোগী) এরূপ গণহারে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হতো না। কেননা তাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী থাকতো। উপাত্তে ২০-৩৯ বছর বয়সী রোগী রয়েছে সর্বাধিক ৯১ জন। যা মোট রোগীর ৩০.৩ শতাংশ। এদের গড়ে দৈনিক, পুরুষ ও স্ত্রী লোকের যথাক্রমে ২৭৬০ ও ২০০০ কিলো ক্যালোরী গ্রহণ করা দরকার সেখানে আমাদের রোগীরা বা উপাত্তের সর্বাধিক সংখ্যক রোগীরা পাচ্ছে মাত্র পুরুষ ও স্ত্রী গড়ে ১৪০০-১৬০০ কিলো ক্যালোরী। এখানে ঘাটতী রয়েছে সর্বাধিক অর্থাৎ ৬০০ থেকে ১১০০ কিলো ক্যালোরী। এত ঘাটতী থাকার কারণে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

গবেষণায় ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সী রোগী রয়েছে ৩০০ জনের মধ্যে ৮০ জন বা ২৬.৭%। এদের প্রতিদিন গড়ে প্রয়োজন ২৬২০-১৯০০ কিলো ক্যালোরী কিন্তু গ্রহণ করছে ১৬০০-১৮০০ কিলো ক্যালোরী। এখানেও ঘাটতী প্রচুর। আমরা পূর্বেই জেনে এসেছি, যে সকল দেশে পুষ্টিহীনতা রয়েছে, সে সকল দেশে কোন টিকা বা ইনজেকশন পুরোপুরি কার্যকরী হয় না। কাজেই আমাদের দেশে বিভিন্ন রোগের টিকা বা ইনজেকশন নেওয়া সত্ত্বেও সেই রোগের হাত হতে মানুষ রেহাই পাচ্ছে না। আর এরূপ পরিস্থিতিতে যে নতুন রোগ আর্সেনিকোসিস দেখা দিয়েছে তা থেকেও মানুষের বাঁচার উপায় নেই। আমি মনে করি পানির সাথে এ রোগের অপর কারণ পুষ্টিহীনতা। ৭.১৩ নং সারণীতে রোগীদের গ্রহণীয় যে কিলো ক্যালোরী দেখাতে হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ২২.৩৩% রোগী প্রতিদিন গড়ে গ্রহণ করছে মাত্র ১১০০-১৪০০ কিলো

ক্যালোরী, অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের মাত্রা একইরূপ। ৪১.৬৭% রোগী গ্রহণ করছে ১৪০১-১৬০০ কিলো ক্যালোরী। অর্থাৎ অধিকাংশ রোগী গ্রহণ করছে এই স্বল্প পরিমাণ কিলো ক্যালোরী। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক (প্রচুরক) রোগী গ্রহণ করছে মাত্র ১৫০০ কিলো ক্যালোরী। ২৯.৬৭% রোগী গ্রহণ করছে মাত্র ১৬০১-১৮০০ কিলো ক্যালোরী। যাদের গ্রহণ করার কথা ছিল ২৭৬০-২০০০ কিলো ক্যালোরী। মাত্র ৬% রোগী গ্রহণ করছে ১৮০১-২০০০ কিলো ক্যালোরী। আর ০.৩% লোক গ্রহণ করছে মাত্র ২১০০ কিলো ক্যালোরী। অর্থাৎ গড়ে রোগীরা সবাই প্রতিদিন গ্রহণ করছে মাত্র ১৫৭৪.১৮ কিলো ক্যালোরী। কিন্তু গড় গ্রহণের কথা ছিল পুরুষদের ২৪৭০ কিলো ক্যালোরী এবং মহিলাদের ১৮০০ কিলো ক্যালোরী এবং পুরুষ স্ত্রী একত্রে গড়ে ২১০০ কিলো ক্যালোরী। এখানে ঘাটতী রয়েছে (২১০০-১৫৭৪ = ৫২৬) কিলো ক্যালোরী। তবে মোট রোগীদের মধ্যম গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী হচ্ছে ১৫৫০ এবং মোট উপাত্তের পরিমিত ব্যবধান হলো ১৭৬.৬৭৯ কিলো ক্যালোরী। অর্থাৎ গড় হতে অন্যান্য সকল রোগীরা প্রতিদিন প্রায় ১৭৬.৬৮ কিলো ক্যালোরী কম বা বেশী গ্রহণ করে। যেহেতু প্রচুরক মান ১৫০০ কিলো ক্যালোরী সেহেতু বেশীর ভাগ রোগীই গড় হতে ১৭৬.৬৮ কিলো ক্যালোরী কম গ্রহণ করে।

এখন দেখা যাক আক্রান্ত রোগীদের কিলো ক্যালোরী গ্রহণ করার সাথে আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার কোন সম্পর্ক আছে কিনা? এই বিষয়টি জানার জন্য Chi-square পরীক্ষা নিম্নে দেখানো হলো।

সারণী ৭.১৬ ঃ রোগীদের কিলো ক্যালোরী গ্রহণের সাথে আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার সম্পর্ক

রোগীদের আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার পর্যায়	রোগীদের দৈনিক গ্রহণীয় কিলো ক্যালোরী					মোট
	১২০০-১৪০০	১৪০১-১৬০০	১৬০১-১৮০০	১৮০১-২০০০	২০০১+	
প্রথম পর্যায় : ক্রনিক বিষক্রিয়া	৩৭	৭১	৪৬	১২	০০	১৬৬
দ্বিতীয় পর্যায় : মাঝারী বিষক্রিয়া	২৪	৫৩	৪১	০৬	০১	১২৫
তৃতীয় পর্যায় : তীব্র বিষক্রিয়া	০৬	০১	০২	০০	০০	০৯
মোট	**৬৭**	**১২৫**	**৮৯**	**১৮**	**০১**	**৩০০**

Chi-square = ১৪.০১, Degree of fredom = 8, Provability value =০.০৮

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে Chi-square এর সম্ভবনার যে মান এসেছে তাতে ক্যালোরী গ্রহণের সাথে আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার কোন সম্পর্ক নাই। এক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত গ্রহণীয় মান হলো ০.০৫। কিন্তু উপরিক্ত সারণীর মান এসেছে ০.০৮। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে সামান্য সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এমন সম্পর্ক হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। তা হলো একজন রোগী শুধুমাত্র বেশি বেশি তাপশক্তি বা কিলো ক্যালোরী খাবার গ্রহণ করল, কিন্তু অন্যান্য বিষয় যেমন আর্সেনিক যুক্ত পানি নিয়মিত খেলো, অপরিস্কার থাকলো। অর্থাৎ কিলো ক্যালোরী ব্যতীত অন্যান্য আর্সেনিকোসিস প্রতিরোধক খাবার গ্রহণ করল না এক্ষেত্রে তার আর্সেনিকোসিস বাড়তে থাকবে। তাই পরিশেষে বলা যায় শুধু কিলো ক্যালোরী গ্রহণের সাথে আর্সেনিকোসিসের তেমন কোন সম্পর্ক নাই।

৮. রোগীদের খাদ্যভাসের সার্বিক পর্যালোচনা

শরীর সুস্থ ও নিরোগ রাখার জন্য আমাদের কি খাওয়া উচিৎ, কিভাবে খাওয়া উচিৎ তা জানা একান্ত প্রয়োজন। আরো ও প্রয়োজন হলো বিভিন্ন রোগ-ব্যধি হতে নিজেকে কিভাবে নিরাপদে রাখা যায় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আপাত দৃষ্টিতে যদিও দেখা যায় যে সাধারণত ক্ষুদা নিবারণের জন্য আমরা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি। কিন্তু ইহা মূখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়। কারণ খাদ্যের পুষ্টিমানের উপর নির্ভর করে আমাদের দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, মানসিক ও শারীরিক বিকাশ, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সর্বপরি শারীরিক সুস্থতা। জন্ম হতে শুরু করে প্রায় ২৫ বছর পর্যন্ত মানব দেহের বৃদ্ধি থাকে। যার ফলে একটি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর হতে আস্তে আস্তে কিশোর, যুবক, প্রাপ্ত বয়স্ক ও বার্ধক্যে পরিণত হয়। আবার জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ, দেহ কোষ, মস্তিস্কো ইত্যাদি তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্যই অনবরতই ক্ষয় হতে থাকে। এই ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করাই হলো খাদ্যের প্রধান কাজ। তাছাড়া শরীরের স্বাভাবিক কিয়া প্রক্রিয়ার জন্যও শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি আমরা খাদ্য দ্রব্য হতে তাপ আকারে পেয়ে থাকি। যদি কখনও আমরা খাদ্য দ্রব্য আহার না করি তবে আমাদের কাজ করার শক্তি ও উৎসাহ কমে যাবে। সুতরাং খাদ্যের দ্বিতীয় প্রদান কাজ হচ্ছে দেহে তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করা। আবার দেখা যায় যে উপযুক্তখাদ্যের অভাবে জীবণ ধারণের জন্য দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো সুষ্টুভাবে সম্পূর্ণ হয় না। ফলে আমরা সহজেই বিভিন্ন ধরণের রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরি। তাই খাদ্যের তৃতীয় কাজ হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্বাভাবিক কাজগুলোকে সুষ্টুভাবে পরিচালিত করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা।

কোন কোন খাদ্য আমাদের শরীরের উপরোক্ত প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকলে আমরা সহজেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বেছে নিতে পারি।

বিভিন্ন পুষ্টি গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, চিনাবাদম শীমের বিচি ও সোয়াবিন ইত্যাদি খাদ্যগুলো দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে। তাই গর্ভবতী ও প্রসূতী এবং শিশুদের জন্য এই জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন একটু বেশী। এই সব খাদ্যে আমিষের পরিমাণ বেশী থাকে বলে, এগুলোকে আমিষ জাতীয় খাদ্যও বলা হয়ে থাকে। আমাদের বাঙালীদের প্রধান খাদ্য, ভাত, রুটি, আলু, গুড়, চিনি, তেল, ঘি, ডালডা, মাখন ইত্যাদিকে দেহের তাপ ও শক্তি দানকারী খাদ্য বলা হয়ে থাকে। দেহের এই জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের বয়স ও শারীরিক পরিশ্রমের উপর। যেমন- একই বয়সের একজন কেরানী অপেক্ষা একজন দিন মজুরের তাপশক্তি উৎপাদনকারী খাদ্যের প্রয়োজন অনেক বেশী। তবে এই জাতীয় খাদ্যে শর্করা ও চর্বির ভাগ একটু বেশী থাকে।

নিম্নে আমাদের দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত অর্থাৎ শ্রমানুযায়ী একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো।

সারণী ৭.১৭ ঃ অত্যাধিক পরিশ্রমী (দৈনিক শ্রমিক, রিক্সাচালক, ইত্যাদি) একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক খাদ্য তালিকা।

নং	খাদ্য বস্তু	পরিমাণ
১।	ভাত	৫০০ গ্রাম
২।	আটা	১৫০ গ্রাম
৩।	ডাল	১০০ গ্রাম
৪।	শাক ঃ যেমন- কচু শাক, পালং শাক, ডাটা শাক, শাজিনা পাতা, ধনে পাতা ইত্যাদি	১০০ গ্রাম
৫।	সবজী ও মূল জাতীয় ঃ যেমন- বেগুন, পটল, উচ্ছা, শশা, লতি, আলু, কুমড়া, মূলা, কচু ইত্যাদি	১৫০ গ্রাম
৬।	মাছ বা মাংস	৫০ গ্রাম
৭।	তৈলাক্ত বস্তু ঃ যেমন তেল	৫৩ গ্রাম
৮।	মিষ্টি দ্রব্য যেমন- চিনি গুড় ইত্যাদি	৩৫ গ্রাম
৯।	ফল জাতীয় ঃ যেমন- পেয়ারা, আমলকী, জাম্বুরা, টমেটো, লেবু ইত্যাদি	১ টা কম পক্ষে

উৎস ঃ পুষ্টি বার্তা, এপ্রিল, ১৯৭৮: ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৭.১৮ ঃ স্বল্প পরিশ্রমী (যেমন-শিক্ষক, ডাক্তার, অফিসার, ছাত্র ইত্যাদি) প্রাপ্ত বয়স্ক যারা প্রতিদিন ডিম ও দুধের সংস্থান করতে পারে না তাদের জন্য দৈনিক খাদ্য তালিকা ঃ

নং	খাদ্য বস্তু	পরিমাণ
১।	ভাত	৩৬০ গ্রাম
২।	রুটি	৬০ গ্রাম
৩।	ডাল (যে কোন)	১০০ গ্রাম
৪।	শাক ঃ যেমন- কচু শাক, পালং শাক, ডাটা শাক, শাজনা পাতা, ধনে পাতা ইত্যাদি	১১৫ গ্রাম
৫।	সবজী ও মূল জাতীয় ঃ যেমন- বেগুন, পটল, উচ্ছা, কচু, লাউ, কুমড়া, আলু ইত্যাদি	১১৫ গ্রাম
৬।	মাছ বা মাংস	৬০ গ্রাম
৭।	তৈলাক্ত বস্তু ঃ যেমন তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি	১১৫ গ্রাম
৮।	মিষ্টি দ্রব্য ঃ যেমন- চিনি ও গুড় ইত্যাদি	৩০ গ্রাম
৯।	ফল জাতীয় ঃ যেমন- পেয়ারা, আমলকী, লেবু ইত্যাদি	৩০ গ্রাম বা ১টা

উৎস ঃ পুষ্টি বার্তা, এপ্রিল, ১৯৭৮ : ১৪

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী লোকের দৈনিক খাদ্য তালিকা মোটামুটি একই রকম শুধু চাল ও আটার পরিমাণ একটু কম হবে, কারণ পুরুষের চেয়ে স্ত্রী লোকের শক্তির চাহিদা কিছুটা কম। আর খাদ্য প্রাণ ও খনিজ লবণ, বিশেষ ভাবে লৌহের উৎস হিসেবে অন্যান্য সব শাক-সবজীর সাথে কচু শাক কিছুটা বেশী খেতে হবে। এটি আর্সেনিকোসিস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য প্রাণ-এ ও লৌহের জন্য উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও বেশী পরিমাণ শাক-সবজী খাওয়া উচিত।

উপরোক্ত খাদ্য তালিকায় যে সব খাদ্যবস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আমাদের দেশের প্রচলিত খাদ্যবস্তু। তবে বাচ্চাদের জন্য কোন খাদ্য তালিকা এখানে নেই। কেননা আমার গবেষণায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত কোন বাচ্চা রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। যেহেতু বিভিন্ন ধরণের রোগ, বিশেষ করে আর্সেনিকোসিস হতে নিরাপদে থাকার জন্য এবং শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদের উপরোক্ত সব খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সেহেতু উক্ত সব খাদ্যবস্তুর প্রতি বেশী আলোকপাত করা হয়েছে।

সবুজ ও হলুদ রঙের শাকসবজী, তরিতরকারী ও ফলমূল যেমন-কলমি শাক, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, ফলের মধ্যে লেবু, পেয়ারা, আমড়া, আম, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি

আমাদের দেহের স্বাভাবিক কাজগুলো সুসম্পূর্ণ করে ও নানা রোগের হাত হতে আমাদের রক্ষা করে। এই সব খাদ্য আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয় উক্ত সব খাদ্যবস্তু এবং ভিটামিন ও খনিজ আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে সক্রিয় ও কর্ম চঞ্চল করে আমাদের রোগ মুক্ত রাখে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় চির সবুজ এই বাংলার জনসাধারণ, খাদ্য প্রাণ ও খনিজ দ্রব্যের অভাবে নানা প্রকার রোগ উপসর্গে ভূগছে অথচ পুষ্টি সম্বন্ধে একটু সজাগ হলেই আমরা এইঅজ্ঞতা প্রসূত পুষ্টিহীনতার কবল থেকে বাঁচতে পারতাম।

উপরের এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় আপনারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, আমাদের প্রতিদিনের খাবারে উক্ত গবেষণায় আলোচিত এই তিন জাতীয় খাদ্যের সমন্বয় হওয়া একান্ত দরকার। আর তা না হলে আমাদের খাদ্য সুষম এবং স্বাস্থ্যকর হতে পারে না। কোন জাতীয় খাদ্য কতটুকু হবে তা নির্ভর করে একটি লোকের বয়স ও শরীর ভিত্তিক অবস্থা, যেমন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কায়িক বা শারীরিক পরিশ্রমের উপর। একজন শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মা'র খাবারে থাকবে শরীর বৃদ্ধিকারী ও ক্ষয়পূরক খাদ্যের পরিমাণ বেশি। একজন মুজুরের খাবারে বেশী থাকবে শক্তি ও তাপ উৎপাদনকারী খাদ্যে। তবে সবার খাবারেই সমভাবে থাকতে হবে রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই সাধারণ নিয়মানুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করলেই আমরা সুন্দর সবল ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারব।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা বলতেই চাই, খাবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে পুষ্টিকর সুষম খাদ্যেও মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। আর খাদ্য দামী হলেই পুষ্টিকর হয় না। অনেক সময় সস্তা খাদ্যে অনেক দামী খাদ্যের চেয়ে পুষ্টির মান বেশী থাকে।

উপরোক্ত সব আলোচনা থেকে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, তাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অধিক পরিমাণে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য, ভিটামিন সমৃদ্ধ তরিতরকারি এছাড়া বিভিন্ন ধরণের দেশী খাদ্য যেমন-সিম, মটরশুটি, বিভিন্ন ধরণের ডাল, সয়াবিন, বিভিন্ন ধরণের সবুজ ও পাতাযুক্ত তরিতরকারি থাকতে হবে। সুতরাং একথা জোড় দিয়ে বলা যায় পুষ্টি ও পুষ্টিক্ষুদ্র উপাদানগুলো আর্সেনিক বিষক্রিয়া প্রতিরোধে জোড়ালো ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭.১ ঃ আর্সেনিকোসিস প্রতিরোধমূলক দেশীয় কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা।

Dhaka University Institutional Repository

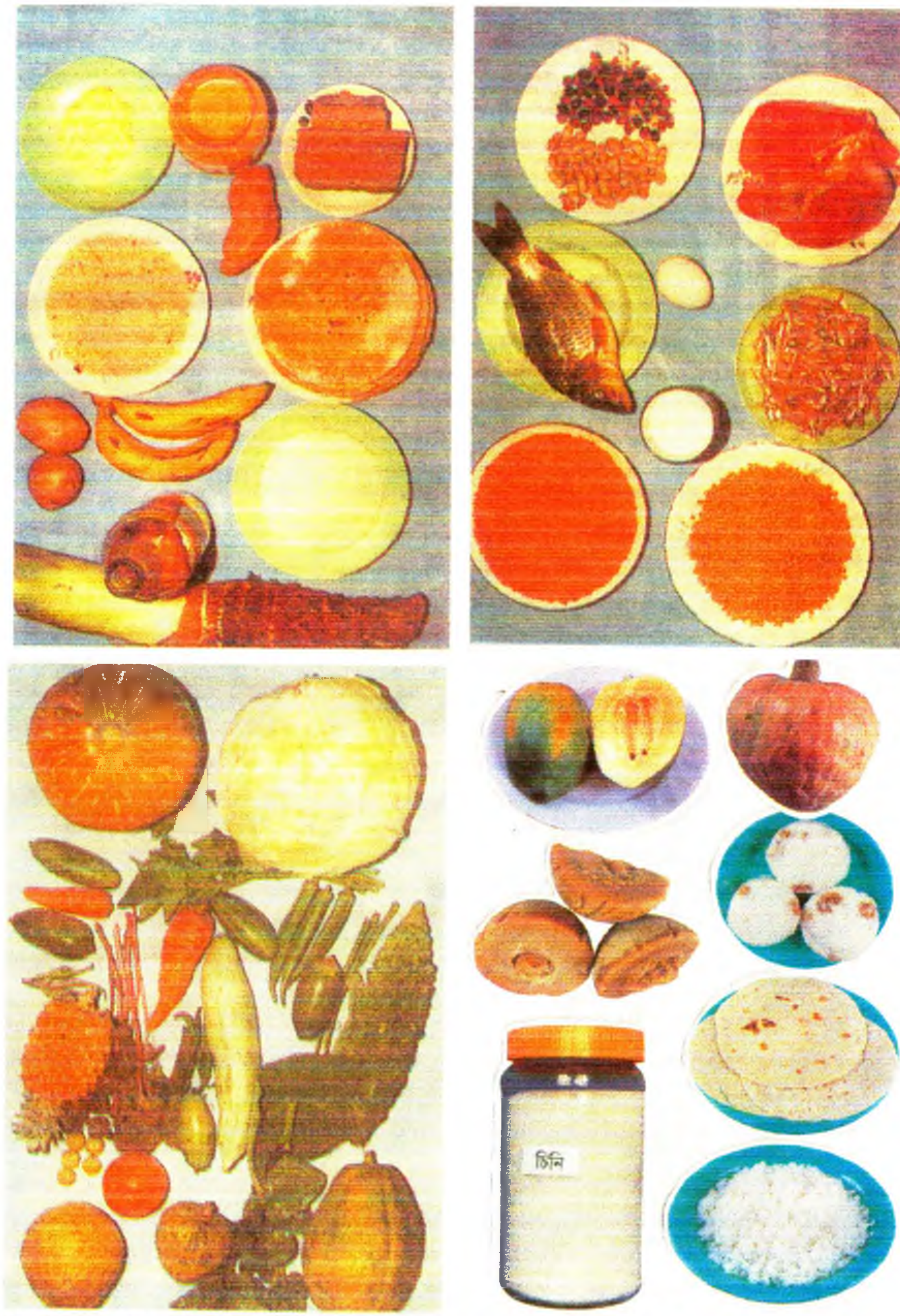

চিত্র ৭.২ ঃ আর্সেনিকোসিস প্রতিরোধমূলক বা শরীর গঠন ও ক্ষয়পূরণকারী গবেষনা এলাকার কিছু খাদ্য তালিকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৮

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

১. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বসতি, বাড়ীঘরের ধরণ ও পরিবেশ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস জনিত প্রধান অবয়ব হলো গ্রাম। আমাদের বাংলাদেশ ও গ্রাম প্রধান একটি দেশ। এই গ্রামকেও গ্রামের বসতিকে ঘিরেই এদেশের মানুষের জীবন আবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অর্থাৎ জন্মের পর লালিত পালিত হবার জন্য গ্রাম ও তার বসতির ব্যবহার অপরিহার্য। এছাড়া মানুষের আবাসজনিত কারণে বাড়ির আশে-পাশে যে ভূমি ব্যবহার গড়ে ওঠে তা গ্রামীণ বসতি পঠনে অত্যান্ত মূল্যবান। কারণ বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন এই খাদ্য উৎপাদনের জন্য চাষের জমির কোন বিকল্প নেই। আবার জমি চাষ করলে তা দেখা শোনার প্রয়োজন আছে এবং এই দেখাশোনা করা বসতিকে ঘিরেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষিকাজের জন্য বসতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি এই আবাসস্থল মানুষকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রভাব, যেমন- রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সাহায্য করে একই ভাবে বসতিকে কেন্দ্র করে মানুষ বিভিন্ন কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে জীবণ ধারণের প্রয়াস পায়।

মানুষের বসবাস, কর্মতৎপরতা, জীবন-যাপন সবকিছুই প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অনুকূলতা, প্রতিকূলতা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এটাই হলো পরিবেশ। পরিবেশে কিছু বিষয় মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২. বাসস্থান ও বসবাসের পরিবেশ

গ্রামীণ বসতি তথা বাসস্থানের অবস্থান কতগুলো সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়ামকের আলোকে হয়ে থাকে। এই অবস্থানগত নিয়ামকের যথেষ্ট গুরুত্বও রয়েছে। এই বসতি বা বাড়িঘর যেখানে যতটা কাছাকাছি সেখানে পাড়া ও আন্তরিকতার অনুভূতি ততটা জোড়ালো। আবার যেখানে বাড়িঘরগুলো যতটা বিচ্ছিন্ন সেখানে সামাজিক নিঃসঙ্গতা লক্ষ্যণীয়। আমার গবেষণা এলাকার বাসস্থান ও ঘরবাড়িগুলো, কাছাকাছি আবার বিচ্ছিন্নতার সুস্পষ্ট রূপও রয়েছে। যদিও বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক, ধর্মীয়, শিক্ষা, বাণিজ্যিক, চিকিৎসা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথাপিও শিবচর দক্ষিণ বঙ্গের নদী বিধৌত নিম্নভূমি এলাকা হওয়ার উক্ত বিষয়গুলোকে গৌণ বিবেচনা করা হয়েছে। কেননা এখানে প্রতি বছরই বন্যা হয়। ফলে ভূমি প্লাবিত হয়। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘরবাড়ি তৈরী করতে ভূমি হতে বেশ উঁচু ভিটি তৈরী করতে হয় এবং এটা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। আমরা জানি, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ

বসবাস করে তাই হলো সেখানের পরিবেশ। কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং জীবন যাত্রা প্রণালীকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তাকে পরিবেশ বলা হয়।

একটু বিস্তারিত বলতে গেলে পরিবেশ হলো মানব জীবনের বাঁচার মাধ্যম। পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বেঁচে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ পরিবেশকে ধারণ করে এবং পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়। পরিবেশ অনুসারেই মানুষের চাল-চলন রীতি-নীতি খাওয়া-পড়া, মায়া-মমতা, স্নেহ ভালবাসাসহ সকল প্রকার সামাজিকতা বা অসামাজিকতা শিখে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, "মানুষ যে সমস্ত বস্তুগত বা অবস্তুগত সমস্যাগুলির মধ্যে জীবন ধারণা করে তাই হলো ঐ সমস্ত মানুষের পরিবেশ।" অর্থাৎ পরিবেশের সাথে মানুষের জীবন প্রণালী অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কাজেই মানুষের বাসস্থানের পরিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তার পরিবেশ জড়িত। শিবচর এলাকার গ্রামীণ বসতি তথা বাসস্থান ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব একটা ভাল নয়। কারণ বর্ষা মৌসুমের শুরু হতে চার মাস পর্যন্ত বাড়িঘরের আশে পাশে থাকে জলাবদ্ধতাসহ, ঝোপজাড় বা অপরিষ্কার আবর্জনাময় পরিবেশ। বেশীর ভাগ লোকেরই বাড়ি হতে বের হয়ে প্রধান সড়কে আসার রাস্তা নেই। অনেক কষ্ট করে তারা হাট বাজার করে। শীতকালে শীতের তীব্রতা এখানে বেশী। অপ্রাকৃতিক কিংবা সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিশ্লেষণে দেখা যায়। এখানে শিক্ষার হার খুব কম। ফলে, মানুষের কৃষ্টি-কালচার তেমন উন্নত নয়। তারা বাড়ি ঘরের আশে-পাশে পরিষ্কার রাখে না। যাতায়াতের সংযোগ রাস্তা তৈরী করে না। একই বাড়ীতে অনেক লোকের বসবাস করে। যৌথ পরিবারের আধিক্য থাকায় পাড়া-প্রতিবেশির দেখা-শোনা করা ও ভাল-মন্দের খোঁজ খবর নেওয়ার সংস্কৃতি এখানকার পরিবারগুলোতে খুব একটা নেই।

৩.গবেষণা এলাকার ঘর বাড়ির ধরণ, বিন্যাস ও নির্মাণ শৈলী

সময়ের দীর্ঘ আবর্তনে মানুষ তার বাসস্থান তৈরীর কৃত কৌশল আয়াত্তে এনেছে। তবে সর্বাত্মকভাবে সফলতা অর্জন করেছে, এমন মন্তব্য ঠিক নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ রোদ-বৃষ্টি শীত-কুয়াশা, ঝড়-ঝাপটা, বায়ু প্রবাহসহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ামকের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে। কিন্তু সেই খুঁজে বেড়ানো আজও মানুষের শেষ হয়নি। কেননা পৃথিবীর বহু দেশে বহু অঞ্চলে আজও অনেক মানুষ নিরাশ্রয় ও ভাসমান অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে [বাকী, ১৯৯৮ : ১৭০] জরিপকৃত শিবচরের মানুষের ঘর-বাড়ির ধরণ বিন্যাসে বিভিন্নতা লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘরবাড়ির নির্মাণ কৌশল ও ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, শিবচরের প্রায় অধিকাংশ মানুষই তার পরিবেশের বিভিন্ন নিয়ামকের সাথে নিজেদেরকে অনেক খানি মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। পরিবেশ বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ হার্ডসন এর মতে, "দরিদ্র কৃষকের বাড়ীতে প্রাকৃতিক নিয়ামক যতটা প্রভাব ফেলে, ভাল অবস্থা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ততটা প্রভাব ফেলে না।" জরিপকৃত গ্রামগুলোতে ভাল অবস্থা সম্পন্ন লোক কম থাকলেও হার্ডসনের কথাটি অনেকাংশে প্রযোজ্য। এই গ্রামের দরিদ্র কৃষক তথা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত অনেক পরিবার তাদের বাড়িঘর তৈরীতে দরিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট করেছে। অর্থাৎ রোদ-বৃষ্টি ও ঝড় তুফানের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যতটুকু না করলেই নয় তাই করেছে। অবশ্য বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা নিজেস্ব স্বপ্নশৈলী ও নিজেস্ব কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য এটি নিজস্ব পরিবেশের ছাপ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ও বটে।

আমার গবেষণা এলাকা শিবচরে বাড়িঘর নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে রয়েছে, বাঁশ, কাঠ, পাটকাঠি, কাশবন, টিন পলিথিন, ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি। এই এলাকার গ্রামগুলোতে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রাম ছেড়ে পৌর এলাকায় বাড়িঘর তৈরী করেছে তথাপি আর্থিক অবস্থার চিহ্ন রাখার জন্য গ্রামে দু/চারটি পাকা ও সেমি পাকা বাড়ি লক্ষ্যণীয়।

নিম্নে আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী শিবচর থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নির্মাণ শৈলী অনুসারে ঘর বাড়ির ধরণ দেখানো হলো।

সারণী ৮.১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের নির্মাণ শৈলী অনুসারে ঘরবাড়ির ধরণ

বাসগৃহের ধরণ	পরিবার সংখ্যা	শতকরা হার
পাকা ঘর	১৮	৬.৭২
আংশিক পাকা ঘর	২৫	৯.৩৩
টিনের চাল, টিনের বেড়া ঘরের ভিটি ও মেঝে পাকা	১১০	৪১.০৪
টিনের চাল, বাঁশ ও কাঠের বেড়া	৮৫	৩১.৭২
টিনের চাল, পাট খড়ির বেড়া	২৩	৮.৫৮
পলিথিনের চাল কাশ বনের বেড়া	৩	১.১২
কাশ বনের চাল কাশ বনের বেড়া	৪	১.৪৯
মোট	**২৬৮**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

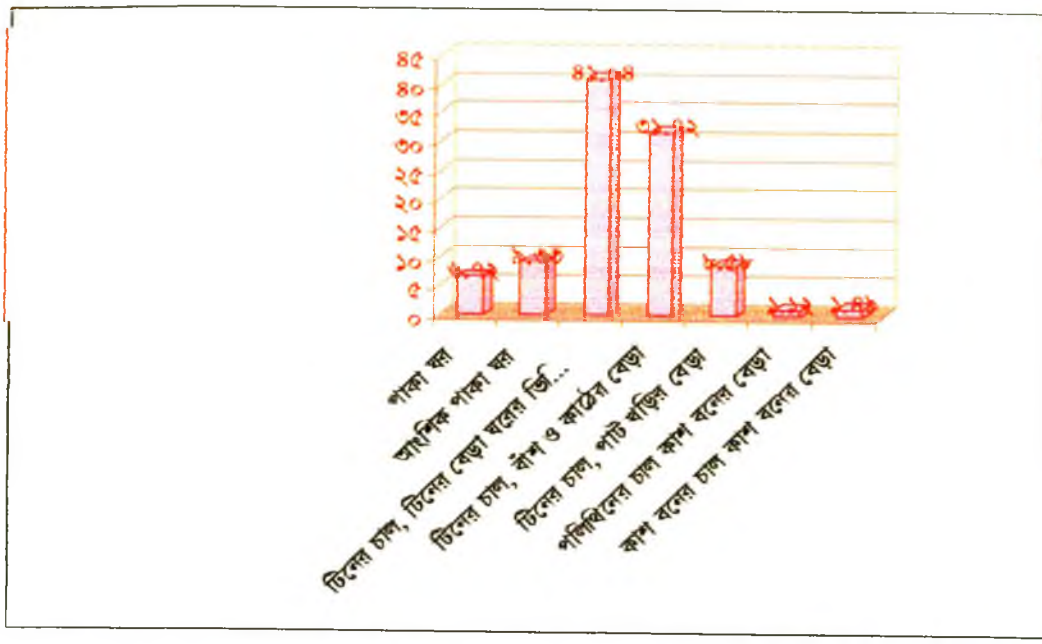

চিত্র ৮.১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের নির্মাণ শৈলী অনুসারে ঘরবাড়ির ধরণ

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপকৃত ২৬৮ টি পরিবারের মধ্যে ১৮টি পরিবারের বাড়িঘর পাকা, এদের বাসস্থান পৌরসভা এলাকার মধ্যে এবং যারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। অর্থাৎ ৬.৭২% রোগীদের বাড়ি পাকা। সেমি পাকাঃ অর্থাৎ দেয়াল ও মেঝে পাকা কিন্তু উপরে / ছাউনি টিনের এগুলোই আংশিক পাকার অন্তর্ভূক্ত। এরূপ বাড়ির সংখ্যা ২৬৮ টির মধ্যে ২৫। যা শতকরা হিসেবে দাঁড়ায় ৯.৩৩%। সবচেয়ে বেশী রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে গ্রাম এলাকায়, যেখানে শতকরা ৪১.০৪% ঘরবাড়িই তৈরী করা হয়েছে টিনের চালা টিনের বেড়া ও মেঝে পাকা করে। ঘরের ভিটি ও মেঝে পাকা করার পেছনে যে কারণটি বেশী উল্লেখযোগ্য তা হলো বণ্যার পানি ঘরে উঠলে ও ক্ষতির পরিমাণ কম থাকে। ৩১.৭২% বাড়িঘর রোগীদের টিনের চালা, কাঠ, বাঁশ পাট কাঠির তৈরী। এছাড়া রয়েছে দরিদ্র গোছের কিছু ঘরবাড়ি যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল। এরা সত্যিই বৃষ্টি-বাদল, রোদ, ঝড়-ঝাপটা ইত্যাদি হতে রক্ষা পাবার নিমিত্তেই এরূপ বাড়িঘর নির্মাণ করেছে।

শেষান্তে বলা যায়, বাড়িঘর মানুষের এমন একটি একক যাতে ব্যক্তির অভিরুচি, সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ফতিফলন ঘটে। তাই এর বৈচিত্রতা নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদের ও জন্ম দেয়। একটি বাড়ি যে সময়ে নির্মিত হয়, সেটি সে সময়কার সে অঞ্চলের নির্মাণ উপকরণ, স্থাপত্যশৈলী, নির্মাণ কৌশলের সমাহারকে ও প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ একটি বাড়ির দ্বারা একটি পরিবার বা জনগোষ্ঠির প্রকৃতির উপর কতটুকু নিয়ন্ত্রণ আছে তা বুঝাতে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বসতি ও বসতির ধরণ বিন্যাস

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপনের একান্ত প্রয়োজন থেকেই বসতির সৃষ্টি। সম্ভাবত বেঁচে থাকার তাগিদে আত্মরক্ষা বা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই বসতির সূচনা হয়েছিল। তাই দেখা যায় পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। পথ-ঘাটের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন গৃহে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে যে জনমন্ডলীর সমাবেশ গড়ে ওঠে তাকেই বসতি বলা হয়। কথাটি আরও সহজ সাবলীল করে বলা যায়, কোন একটি স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে, তাকেই জন বসতি বলে। এই জনবসতিই সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নানা প্রকার উপাদানের উপর ভিত্তি করে বসতি গড়ে উঠে, এদের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি ও স্থানীয় মানুষের কাগিগরি উন্নতিই অধিক প্রভাব বিস্তার করে। আবার লোক বসতির চাপ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে জনবসতির আকার পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই বসতি একটি যাতায়াত ও বাসস্থানে সুবিধাবিশিষ্ট মনুষ্য উপনিবেশ।

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার বসতি দেখা যায়, তাই এই জনবসতিগুলোকে আকৃতির জটিলতা, গঠন ও কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) গ্রামীণ বসতি ও (খ) শহুরে বসতি। আমার গবেষণা এলাকা একটি থানা শহর, এখানে শহুরে বসতি নেই বললেই চলে। কেননা দু-একটা পাকা বিল্ডিং ব্যতীত গ্রামীণ বসতির প্রত্যেকটা অবয়ব এখানকার বসতিতে স্পষ্ট। এখানে শহুরে বসতি নামান্তর মাত্র। গবেষণা এলাকা শিবচরের একটি বসতি থেকে আরেকটি বসতির মধ্যে বিরাজমান ব্যবধান, আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এখানকার গ্রামীণ বসতিকে

i) বিচ্ছিন্ন

ii) বিক্ষিপ্ত

iii) সন্নিবিষ্ট

iv) অনুকেন্দ্রিক

এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি

অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে বসতিকে কখনো বিচ্ছিন্ন আবার কখনো বিক্ষিপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে [বাকী, ১৯৯৮:৭৪]। যদিও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বসতি বলতে প্রায় একই রকম বসতিকে বোঝায়, তবে এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। বিক্ষিপ্ত বলতে সাধারণত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বসতি সমূহকে বোঝায়। আমার গবেষণা এলাকা শিবচরে এরূপ বসতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে একটি বাড়ি হতে আরেকটি বাড়ি বেশ দূরে অবস্থিত। পরস্পর মধ্যে ব্যবধান হয়ে থাকে সাধারণত নদী ও অধিক নিচু এলাকায় বাড়িগুলোর মধ্যে লক্ষণীয়। তবে এদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। এদের মধ্যে গৃহস্থালির জিনিসপত্র দেয়া-নেয়া হয়। পৌর এলাকার বাইরে এরূপ বসতির আধিক্য দেখা যায়।

অপরপক্ষে বিচ্ছিন্ন বসতি বলতে এমন সব বসতিকে বোঝায় আশে-পাশের বাড়ি হতে অনেক দুরে অবস্থিত। এ ধরণের বসতি প্রধানত একটি বা গুটি কয়েক পরিবার ও তাদের বাড়িঘর নিয়ে গঠিত হয়। এক্ষেত্রে একটি বসতি থেকে আরেকটি বসতির মাঝে একটা বিরাট ব্যবধান থাকে। অর্থাৎ বসতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন (Isolated) থাকে। শিবচরে এরূপ বসতির সংখ্যাও কম নয়। এই থানার বাঁশকান্দি, মাতবারের চর, কাঠালবাড়ি, সন্ন্যাসির চর এবং চর জানাজাত ইউনিয়নের বেশীর ভাগ বসতিই বিচ্ছিন্ন বসতি। এই বসতিগুলো সাধারণত কৃষি জোতের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। কৃষি কাজের সুবিধা তথা খেত খামার সহজে দেখা শোনার জন্য এই এলাকায় উক্ত বসতি গড়ে উঠেছে। বসতির এই বিচ্ছিন্নতায় কারণে এই বসতির লোকেরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তবে এরূপ বসতিতে কিছুটা খারাপ দিক ও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি হয়। এতে মেয়েরা অনেকটা অসামাজিক থাকে। চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধা এ ধরণের বসতিতে খুবই কম। কেননা এ ধরণের বেশীর ভাগ বাড়িতেই এখনো বিদ্যুৎ পৌছায়নি, বাড়িতে যাওয়া-আসার ভাল রাস্তা-ঘাটও নেই। এই ধরণের বসতির লোকজনের মাঝেই বেশী আর্সেনিকোসিস রোগী পাওয়া গেছে এবং যারা এই রোগ আর্সেনিকোসিস ও অন্যান্য রোগের ব্যাপারে খুবই অসচেতন। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে এই অসচেতনতা বেশী লক্ষ্যনীয়। কেননা এই বসতির পুরুষরা ক্ষেত্রে খামারে কাজের সময় অনেকের দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং গল্প-গুজব করে হালকা চিত্ত বিনোদন করে। কিন্তু মেয়েদের গৃহস্থালির কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকার ফলে বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ ও বিনোদন করতে পারে না। তাই এই ধরণের বসতির বেশীর ভাগ লোকই অধিকাংশ সময় সামাজিক নিঃসঙ্গতায় ভোগে। দৈনন্দিন ও অন্যান্য কাজে প্রতিবেশিদের কোন সাহায্য তারা পায় না। সাধারণত বসতির বিচ্ছিন্নতার কারণেই এরূপ হয়ে থাকে [বাকী, ১৯৯৮:৭৫]।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ সন্নিবিষ্ট ও অনুকেন্দ্রিক বসতি

সমষ্টিগতভাবে যখন অনেকগুলো পরিবার পরস্পর খুব কাছাকাছি বাস করে তখন তাকে সন্নিবিষ্ট বসতি বলে। এই সন্নিবিষ্ট বসতিই কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে এবং আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে পৌর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। এই বসতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। একটি হলো বাসগৃহের একত্র সমাবেশ এবং অপরটি হলো বসতির ভিতরের পথ-ঘাট উন্নত। সন্নিবিষ্ট বসতির বাড়িঘরগুলো এত কাছাকাছি থাকে যে প্রতিটি বাড়িতে যাতায়াত করার জন্য ভাল পথ ঘাটের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই বসতিতে বাড়িঘর যেমন বেশী; তেমনি জনসংখ্যাও বেশী। এই বসতি এলাকায় বাড়িঘরগুলো ঘন হওয়ার পাশাপাশি তার নির্মাণশৈলী ও কিছুটা উন্নত উপকরণ দ্বারা তৈরী [বাকী, ১৯৯৮:৭৮]। গবেষণা এলাকা শিবচরের পৌর বসতি পুরাপুরি একটি সন্নিবিষ্ট বসতির রূপায়ণ। পৌর এলাকায় বাড়িঘরগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি। অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট ও অনেক এবং সেগুলো বেশ উন্নত। তবে সমস্যা একটাই শিবচর পৌর এলাকায় পানি সাপ্লাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই অন্তত একটি অগভীর নলকূপ আছে এবং যার পানিতে মিশে আছে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক। ফলে পৌর এলাকায়ও রয়েছে প্রচুর আর্সেনিকোসিস রোগী। তবে বর্তমানে পৌর এলাকায় গভীর নলকূপের সংখ্যা বাড়ছে। এই পৌর এলাকায় বসতির অভ্যন্তরে যে পথঘাট গড়ে উঠেছে তা শুধু একটি বাড়ির সাথে অন্যান্য বাড়ির সংযোগ সাধনই করে নাই বরঞ্চ গ্রামের প্রতিটি রাস্তার সাথে ও যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। এভাবে আরো দুরের গ্রামের গাঁ ছুঁয়ে শহরের সীমানার বাইরেও আরো দূরবর্তী এলাকার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তবে এসব পথ ঘাটের মিলন একটি কেন্দ্রাতিক মাকড়সার জালের ন্যায় ধারার সৃষ্টি করেছে। যার কেন্দ্রে রয়েছে পৌরসভা। এই বসতির অধিবাসিরা বেশীর ভাগ কৃষিজীবি হলেও অনেকে অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। অন্যান্য পেশার মধ্যে ছোট-বড় ব্যবসায়ী, চাকরীজীবি, গাড়ি চালক, ভ্যানচালক ইত্যাদি প্রধান। শিবচরের এই পৌর তথা সন্নিবিষ্ট বসতির অধিবাসিদের মধ্যে বেশ সামাজিকতা ও উন্নত জীবন যাত্রার আভাস লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে এই সন্নিবিষ্ট বসতির অভ্যন্তরে সৃষ্ট অপর একটি নিবিড় বসতির নাম অনুকেন্দ্রীক বসতি। এ ধরণের বসতির কেন্দ্রে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা ভূমি ব্যবহার থাকে যা এরূপ বসতি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে এবং একে ঘিরেই বসতি গড়ে ওঠে। ইউরোপে এমন অনেক পুরানো বসতি আছে যা শুধু গীর্জাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশেও এরূপ বসতি, বিভিন্ন কলকারখানা, পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাট-বাজার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে [বাকী, ১৯৯৮ : ৭৮]। শিবচর এলাকায় এরূপ অনুকেন্দ্রীক বসতি লক্ষ্য করা যায় হাট-বাজার এলাকায়। এ অঞ্চলে হাট-বাজারের পারস্পারিক দূরত্ব অনেক এবং হাটগুলো ও বসে

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তাহে মাত্র ১ দিন। তাই এখানকার হাট বাজারগুলো বেশ জাকজমকপূর্ণ হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব বহন করে। বিধায় শিবচরে হাটগুলোকে কেন্দ্র করেই আশে পাশে গণ হারে পুঞ্জিভূত বসতি লক্ষ্য করা যায়। শিবচরে সন্নিবিষ্ট ও অনুকেন্দ্রীর বসতির ঘরবাড়ি ও অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট বেশ উন্নত হলেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কিন্তু তেমন উন্নত নয়। কারণ, জনগণের মধ্যে শিক্ষা খুব কম। তাছাড়া তুলনামূলক নীচু এলাকা হওয়ায় এবং পানি নিস্কাসন ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে বাড়িঘরের আশে-পাশে পানি জমে থাকে এবং সেখানে ময়লা-আবর্জনা জমা হয়ে পরিবেশ দূষিত হয়। আবার শীত মৌসুমে পানি জমে না থাকলেও নিজেদের ব্যবহৃত পানি তথায় ফেলার কারণে সর্বদাই বাড়ি ও পথঘাটের আশ-পাশ স্যাতস্যাতে থাকে যা একটি গুমোট ড্যাম পরিবেশের জন্ম দেয়। আর বিভিন্ন ধরণের অসুখ-বিসুখের জন্য এই পরিবেশ খুবই গুরুত্ব বহন করে।

৫. পানীয় জল ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জলের উৎস

জীবণ ধারণের জন্য প্রয়োজন পানি পানির প্রয়োজন কৃষি কাজের জন্যও। পানির সহজলভ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েই প্রাচীন কাল হতে অধ্যোবধি বসতি তথা বাসস্থান নির্মাণের প্রাধান্য পেয়ে আসছে। যেখানে পানি পেতে অসুবিধে সেখানে যত্রতত্র বসতি গড়ে উঠেনি। দৈনন্দিন জীবনে পানি এত বেশী প্রয়োজন যে প্রতি মুহূর্তে পানি পাবার জন্য মানুষ পানির উৎসকে ঘিরে অথবা পানির উৎস সৃষ্টি করে অতপর সেকানে বসতি স্থাপন করেছে। জীবন ধারণে পানির এত প্রয়োজন, আর এই পানি দূষিত হলে সেটা হবে মরণ। গবেষণার ব্যবহারিক উপাদান হলো আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগী, যে রোগের সূত্রপাত পানি হতে। আর এই পানি হলো ভূ-তলস্থ পানি, কাজেই যে সকল বাড়ীতে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করেছি, সে সকল পরিবারের পান করার পানির উৎস ও খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। প্রথমে খোঁজ নিয়েছি রোগীদের নিজেস্ব কোন নলকূপ আছে কিনা এবং সেটা আর্সেনিক মুক্ত কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে আমরা যে তথ্য পেয়েছি তা নিম্নরূপ।

সারণী ৮.২ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের নিজেস্ব নলকূপের মালিকানা

নলকূপ আছে কিনা	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
নিজেস্ব নলকূপ আছে	২২৩	৮৩.২১
নিজেস্ব নলকূপ নেই	৪৫	১৬.৭৯
মোট	**২৬৮**	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৮৩.২১% রোগীদের নিজেস্ব নলকূপ আছে। এটা হতে পারে আর্সেনিক মুক্ত ও আর্সেনিক যুক্ত। কিন্তু ১৬.৭৯% রোগীদের বাড়িতে নিজেস্ব নলকূপ নেই। তাহলে ১৬.৭৯% রোগীরা কোথাকার বা কিসের পানি পান করছে? অর্থাৎ তারা খাবার পানি কোথায় পাচ্ছে এবং সেই পানির উৎসই বা কি ? এরূপ প্রশ্নের জবাবে অথবা এরূপ তথ্যের সন্ধানে নিম্নোক্ত জবাব খুঁজে পেয়েছি।

সারণী ৮.৩ ঃ রোগীদের নিজেস্ব নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি

আর্সেনিক আছে কিনা	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
আর্সেনিক আছে	১৯৫	৮৭.৪৪
আর্সেনিক নাই	২৮	১২.৫৬
মোট	**২২৩**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

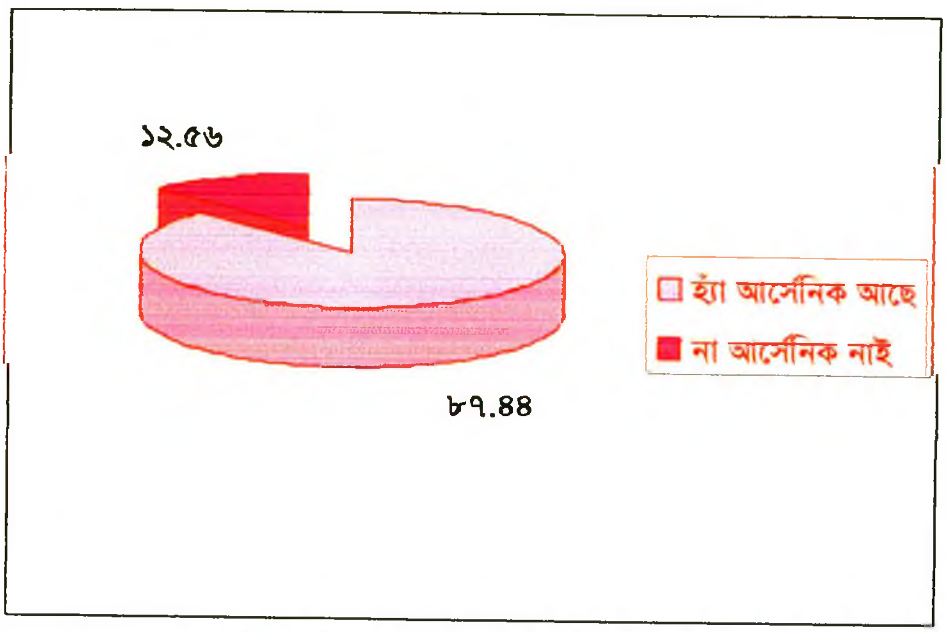

চিত্র ৮.২ঃ রোগীদের নিজেস্ব নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি।

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের মোট ২৬৮ পরিবারের মধ্যে ২২৩টি পরিবারের পানীয় জলের উৎস হিসেবে নিজেস্ব নলকূপ আছে। গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা নামক এন.জি.ও কর্তৃক নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে ২২৩ টির মধ্যে ১৯৫ টি নলকূপের উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক আছে। অর্থাৎ রোগীদের বাড়ির ৮৭.৪৪% নলকূপে

Dhaka University Institutional Repository

আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত, মাত্র ১২.৫৬% নলকূপ পাওয়া গেছে যাতে আর্সেনিক নাই। মূলত এগুলো গভীর নলকূপ। এই ২৮টি নলকূপের বেশীর ভাগই পৌর এলাকায় অবস্থিত।

তথ্যে প্রাপ্ত আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ২৬৮ টি পরিবারের মধ্যে ৪৫টি পরিবার যাদের নিজেস্ব নলকূপ নেই বাইরের বা পাড়ার অন্যান্য বাড়ি হতে পানি এনে তা পান করে। সেই সব নলকূপের তথ্যে জানতে পেরেছি ৪৫টির মধ্যে ৪০টি নলকূপেই উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক আছে এবং মাত্র ৫টি নলকূপ আর্সেনিক মুক্ত। নলকূপের মোট হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় যে মোট ২৬৮ টি পরিবারের পানীয় জলের উৎসের মধ্যে ২৩৫টি পরিবারের পানীয় জলের উৎসে রয়েছে আর্সেনিক যা শতকরা হিসেবে দাড়ায় ৮৮.৫৬। অর্থাৎ রোগীদের ৮৮.৫৬% পরিবারের নলকূপে আর্সেনিক আছে।

উক্ত নলকূরগুলোর গভীরতা কতটুকু এরূপ প্রশ্নের জবাবে ২৬৮টি নলকূপের যে গভীরতা পাই তা নিম্নরূপ

সারণী ৮.৪ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ব্যবহৃত নলকূপের গভীরতা

নলকূপের গভীরতা (ফুট)	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
৩৫ – ৬০	৭৪	২৭.৬১
৬১ – ৮৫	১৪৭	৫৪.৮৫
৮৬ – ১১০	২৯	১০.৮২
১১১ – ১৩৫	০০	০০.০০
১৩৬ +	১৮	০৬.৭২
মোট	**২৬৮**	**১০০.০০**

নলকূপগুলোর গড় গভীরতা = ৮১.৫০ ফুট; নলকূপগুলোর গভীরতার প্রচুরক = ৪০ ফুট; যার মধ্যক বা মধ্যমা হলো = ৭০ ফুট; গড় গভীরতা হতে নলকূপগুলোর পরিমিত ব্যবধান হলো = ৪২.২৫ ফুট।

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

অপর পৃষ্ঠায় নলকূপগুলোর গভীরতা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

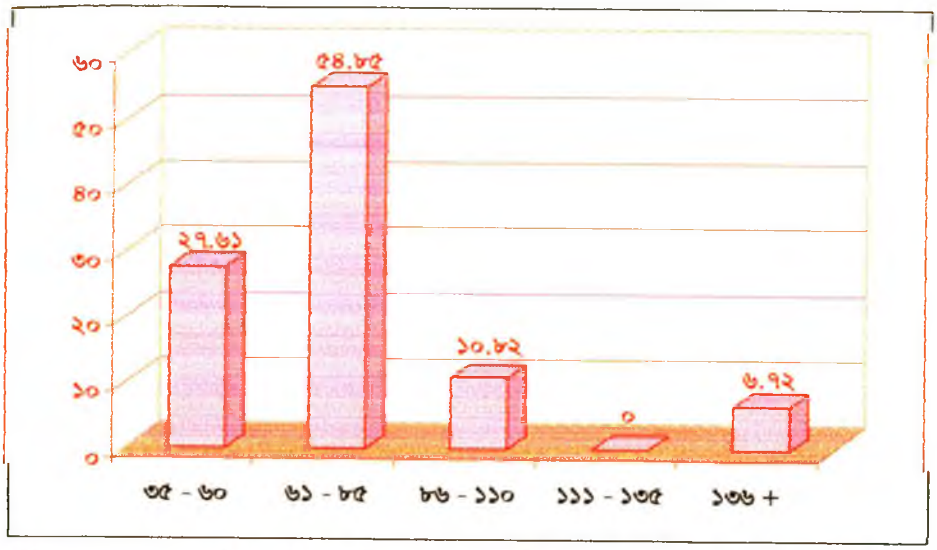

চিত্র ৮.৩ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ব্যবহৃত নলকূপের গভীরতা

সারণীতে লক্ষণীয় যে, উক্ত নলকূপগুলোর মধ্যে ২৭.৬১% নলকূপের গভীরতা ৩৫ থেকে ৬০ ফুট। এগুলো উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক আক্রান্ত। তবে দু-একটিতে আর্সেনিক নেই। ৫৪.৮৫% আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপের গভীরতা ৬১ থেকে ৮৫ ফুট। আর্সেনিক আক্রান্ত আরো ১০.৮২% নলকূপ পাওয়া গেছে যার গভীরতা ৮৬ থেকে ১১০ ফুট। গভীরতার শ্রেণী ব্যবধানে ১১১ থেকে ১৩৫ ফুট গভীরের কোন নলকূপ পাওয়া যায় নি। তবে ২৬৮ টি নলকূপের মধ্যে মাত্র ১৮টি নলকূপ পাওয়া গেছে যাদের গভীরতা ১৩৬ ফুটের উপরে। অর্থাৎ ১৫০ ফুট গভীরতার পাওয়া গেছে দুইটি নলকূপ, ২৫০ ফুট গভীরতার পাওয়া গেছে ১৪টি নলকূপ এবং ২৬০ ফুট গভীরতার পাওয়া গেছে দুটি নলকূপ। এগুলো সবগুলোই আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ। এছাড়া আরো ২৯টি নলকূপ পাওয়া গেছে আর্সেনিক মুক্ত। যাদের গভীরতা ৩৫ হতে ১১০ ফুটের মধ্যে। অধিকন্ত আরো ৫টি নলকূপ পাওয়া গেছে আর্সেনিক মুক্ত। যাদের গীভরতা খুবই কম। মাত্র ৩৫-৪০ ফুটের মধ্যে।

৬.১. রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের স্থিতিকাল

আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীরা কত বছর যাবৎ উক্ত নলকূপে পানি পান করে আসছে। তার উপরও আর্সেনিকোসিস হবার বিষয়টা নির্ভর করে। কেননা আর্সেনিকোসিস হলো দীর্ঘ মেয়াদী প্রকাশ পাওয়া একটি রোগ। নিম্নে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৮.৫ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত স্থিতিকাল

পানি পানের স্থিতিকাল (বছর)	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
১ – ১০	৩৭	১২.৩৩
১১ – ২০	১৪৮	৪৯.৩৩
২১ – ৩০	১০০	৩৩.৩৩
৩১ – ৪০	১৫	০৫.০০
মোট	৩০০	১০০.০০

রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পানের গড় স্থিতিকাল = ২০.৫২ বছর
রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পানের মধ্যম স্থিতিকাল = ২০.০০ বছর
রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পানের সর্বাধিক / প্রচুরক স্থিতিকাল = ২০.০০ বছর
রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পানের পরিমিত ব্যবধান স্থিতিকালের = ০৭.৩৯ বছর

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫ ।

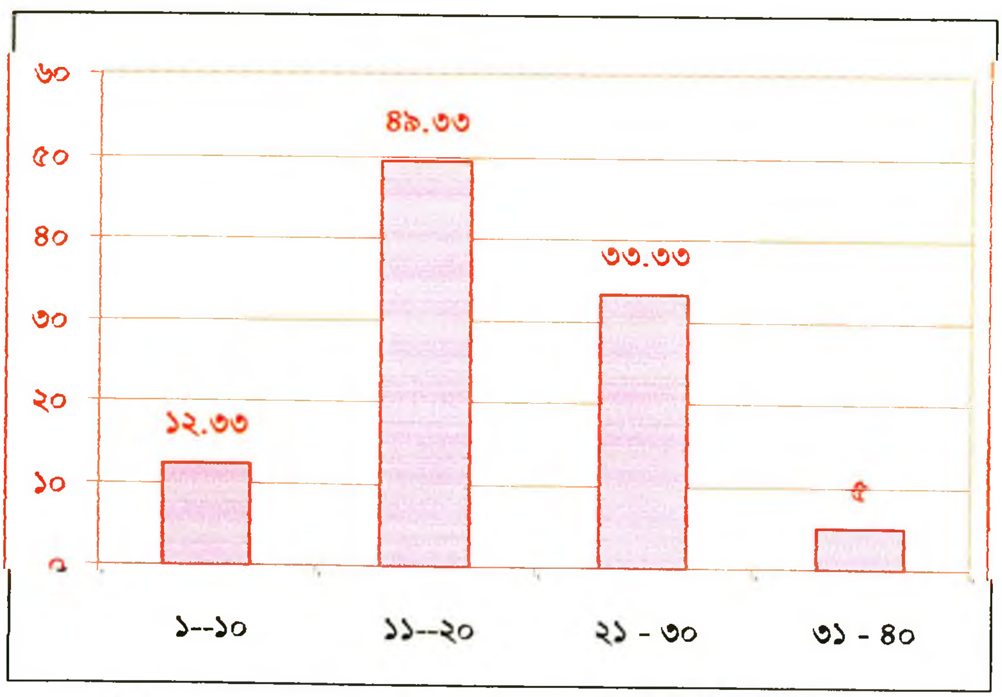

চিত্র ৮.৪ ঃ রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের স্থিতিকাল।

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা কতদিন যাবৎ আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করে আসছে। সে সংক্রান্ত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, মোট ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ৩৭ জন বা ১২.৩৩% রোগী ১ থেকে ১০ বছর যাবৎ আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করে আসছে। প্রায় ৫০%

Dhaka University Institutional Repository

রোগী ১১ থেকে ২০ বছর ধরে এই আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে। ৩৩.৩৩% রোগী পাওয়া গেছে যারা ২১-৩০ বছর যাবৎ আর্সেনিক যুক্ত নলকূপের পানি পান করেছে। আর ৫% রোগী রয়েছে যারা এই পানি পান করছে ৩১ থেকে ৩০ বছর। তবে যে সব রোগীর বয়স একটু বেশী তারাই বেশীদিন যাবৎ আর্সেনিকের বিষ মিশানো পানি পান করছে। এরূপ হওয়ার ক্ষেত্রে সরেজমিনে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাহলো যাদের বাড়ীতে বহু পূর্ব হতেই নলকূপ আছে তারাই মূলত বেশী দিন ধরে নলকূপের পানি পান করছে। পৌর এলাকায় এরূপ পুরানো নলকূপের সন্ধান বেশী পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ পানি পানের গড় স্থিতিকাল হতে ৭.৩৯ করে কম বা বেশী সময় ধরে অন্যান্য রোগীরা পানি পান করে আসছে।

এছাড়া আরো একটি বিষয় স্পষ্ট তা হলো রোগীদের সর্বনিম্ন পানি পানের স্থিতিকাল ১ বছর। অবশ্য এরূপ রোগী পাওয়া গেছে মাত্র ১ জন বা ০.৩% এবং সর্বাধিক সময়ব্যাপী আর্সেনিক দূষিত পানি পান কারী রোগী পাওয়া গেছে ৯ জন। অর্থাৎ ৩% রোগী এরা ৪০ বছর ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান করে আসছে।

পানি পানের ব্যাপ্তি কালের সাথে আর্সেনিকোসিস হওয়ার বা এর তীব্রতার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা Chi-square- পরীক্ষার মাধ্যমে দেখানো হল।

সারণী ৮.৬ ঃ রোগীদের পানি পানের স্থিতিকাল ও আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার সম্পর্ক ।

রোগীদের আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার পর্যায়	রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের স্থিতিকাল (বছর)				মোট
	১-১০	১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	
প্রথম পর্যায়: ক্রনিক বিষক্রিয়া	১৯	৮৭	৫১	০৯	১৬৬
দ্বিতীয় পর্যায়: মাঝারি বিষক্রিয়া	১৫	৫৭	৪৭	০৬	১২৫
তৃতীয় পর্যায়: তীব্রবিষক্রিয়া	০৩	০৪	০২	০০	০৯
মোট	**৩৭**	**১৪৮**	**১০০**	**১৫**	**৩০০**

Chi-square=5.93; Degree of Fredom= 6; Provability value=0.43

উৎস : মাঠ পর্যায়ে জরীপ, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত Chi-square নির্ণয় সারনীর সম্ভাবনার মান =০.৪৩। কিন্তু এই মান গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা Chi-square- এ গ্রহণযোগ্য মান হল ০.০৫। রোগীদের আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের সাথে আর্সেনিকোসিস হওয়ার বা এই রোগে বেশী আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। কোন ব্যক্তি ১০ (দশ) বছর আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলেও তার শরীরে আর্সেনিকের কোন লক্ষণ দেখা না দিতে পারে। আবার মাত্র ১ (এক) বছর আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে অনেকেরই তীব্র পর্যায়ে আর্সেনিকোসিস হতে পারে। অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি ভালভাবে পুষ্টিকর খাবার খাবে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করবে সে তাড়াতাড়ি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ও হবে না। অর্থ্যাৎ আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার সাথে পানি পানের ব্যাপ্তি কালের কোন সম্পর্ক নাই।

৬.২. আর্সেনিক দূষিত পানির অন্যান্য ব্যবহার

পান করা ব্যতীত গৃহস্থালির আরো অনেক কাজ রয়েছে, যেখানে পানির প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয়। যেমন রান্না করা, থালাবাসন ধোয়া, কুলকুচি করা, ওজু-গোসল করা, কাচা ফলমূল ও কাঁচা শাক সবজী ধোয়া, খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া, পান্তাভাতে পানি দেওয়া ইত্যাদি। আরো রয়েছে টয়লেট বা পায়খানায় গিয়ে পানির ব্যবহার। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিবার আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করা ব্যতীত অন্যান্য যে ব্যবহার করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৮.৭ ঃ পান করা ব্যতীত গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে আর্সেনিক যুক্ত পানির ব্যবহার

গৃহস্থালির কাজ	গণ সংখ্যা (পরিবার)	শতকরা হার
রান্না করা	৯১	৩৩.৯৬
থালাবাসন ধোয়া	১৪০	৫২.২৪
কুলকচি করা / ওজু করা	১৬০	৫৯.৭০
ওজু করা / গোসল করা	৭০	২৭.৯৯
টয়লেটে ব্যবহার করা	২৮২	৯৪.০২
অন্যান্য	৩৪	১২.৬৯
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবারের বিভিন্ন কাজে আর্সেনিকযুক্ত পানির ব্যবহার দেখানো হলো।

Dhaka University Institutional Repository

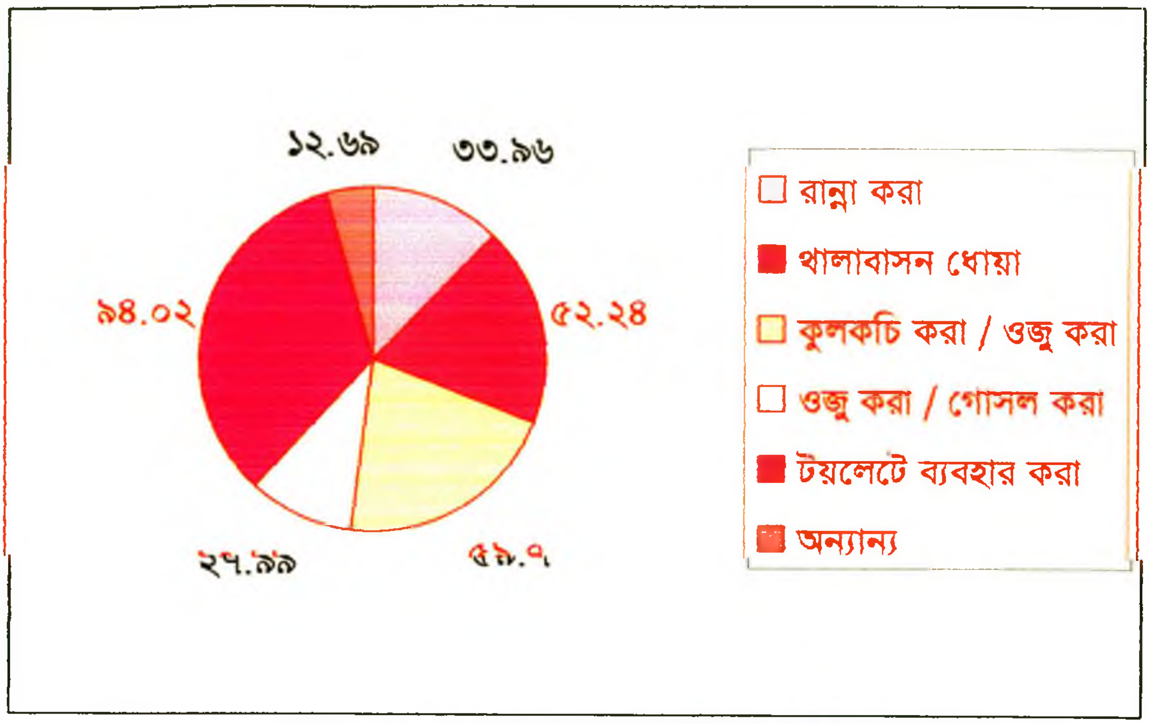

চিত্র ৮.৫ ঃ পান করা ব্যতীত গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে আর্সেনিক যুক্ত পানির

আলোচিত আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী বা তাদের পরিবার আর্সেনিকে আক্রান্ত পানি পান করা ব্যতীত গৃহস্থালির অন্যান্য যে সকল কাজে ব্যবহার করেছে তা উপরের সারণীতে স্পষ্ট। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে ৩৩.৯৬% আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত পরিবার আর্সেনিক দূষিত পানি রান্না করা কাজে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ তারা ভাত, শাক, সবজী ও অন্যান্য তরি-তরকারীর মাধ্যমে ও আর্সেনিক গ্রহণ করেছে। পরিবারে থালাবাসন ধোয়া বা পরিষ্কার করা একটি নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। এ কাজে ৫২.২৪% পরিবার আর্সেনিক দূষিত পানি ব্যবহার করেছে। বাকী প্রায় ৪৮% পরিবার থালাবাসন ধৌত করেছে নদী বা পুকুরে অথবা অন্যান্য উপায়ে। কুলকুচি এবং ওজু করার কাজে এই দূষিত পানির ব্যবহার করেছে প্রায় সকল আক্রান্ত পরিবারই। অর্থাৎ ৫৯.৭% পরিবার এই দূষিত পানি ব্যবহার করে এবং অন্যান্য পরিবারগুলো পুকুরে বা নদীতে কুলকুচি বা ওজু করে। এরপর আসছে গোসল বা স্নান করার কাজ এবং এই কাজের সাথে ওজু করাও জড়িত রয়েছে। প্রায় ২৮% পরিবার ওজু গোসল করেছে এই আর্সেনিক আক্রান্ত পানি দিয়ে। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার (পান করা ব্যতীত) করেছে পায়খানায় বা টয়লেটে। অর্থাৎ প্রায় ৯৪% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার টয়লেটের কাজে আর্সেনিক দূষিত পানি ব্যবহার করে। এছাড়া অন্যান্য গৃহস্থালির ছোটখাট কাজে প্রায় ১২.৬৯% পরিবার এই দূষিত পানি ব্যবহার করে।

৫.৩.

৭. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বর্তমান বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত পনির উৎস

গবেষণায় আলোচিত শিবচর থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত অনেক রোগীর বাড়ীতে এখনও পর্যন্ত আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ বসাতে পারে নাই। এমনকি অনেকে অসচেতনতার কারণে বা ইচ্ছে করেই বসান নাই। তথাপিও অধিকাংশ রোগীই পানি পানের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। নিম্নে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিবার বর্তমান (আর্সেনিকোসিস ধরা পরার পর) পান করা সহ গৃহস্থালির অন্যান্য সকল কাজে নিরাপদ পানি নাকি দূষিত পানি ব্যবহার করে তার একটি ছক উল্লেখ করা হলো ।

সারণী ৮.৮ ঃ বর্তমান বিভিন্ন কাজে রোগী ও তাদের পরিবারের পানি ব্যবহার।

কাজের প্রকৃতি ও পানি ব্যবহার	নিরাপদ পানি		দূষিত পানি	
	গণ সংখ্যা (পরিঃ)	শতকরা হার	গণ সংখ্যা (পরিঃ)	শতকরা হার
পান করা	২৪০	৮৯.৫৫	২৮	১০.৪৫
রান্না করা	২০৭	৭৭.২৪	৬১	২২.৭৬
থালাবাসন ধোয়া	১২৮	৪৭.৭৬	১৪০	৫২.২৪
কুলকুচি, হাত-পা, ধোয়া	২৪	৮.৯৬	২৪৪	৯১.০৪
ওজু, গোসল করা	৪৭	১৭.৫৪	২২১	৮২.৪৬
টয়লেটে ব্যবহার	১৭৩	৬৪.৫৫	৯৫	৩৫.৪৫
মোট	**২৬৮**	**১০০.০০**	**২৬৮**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ, ২০০৫।

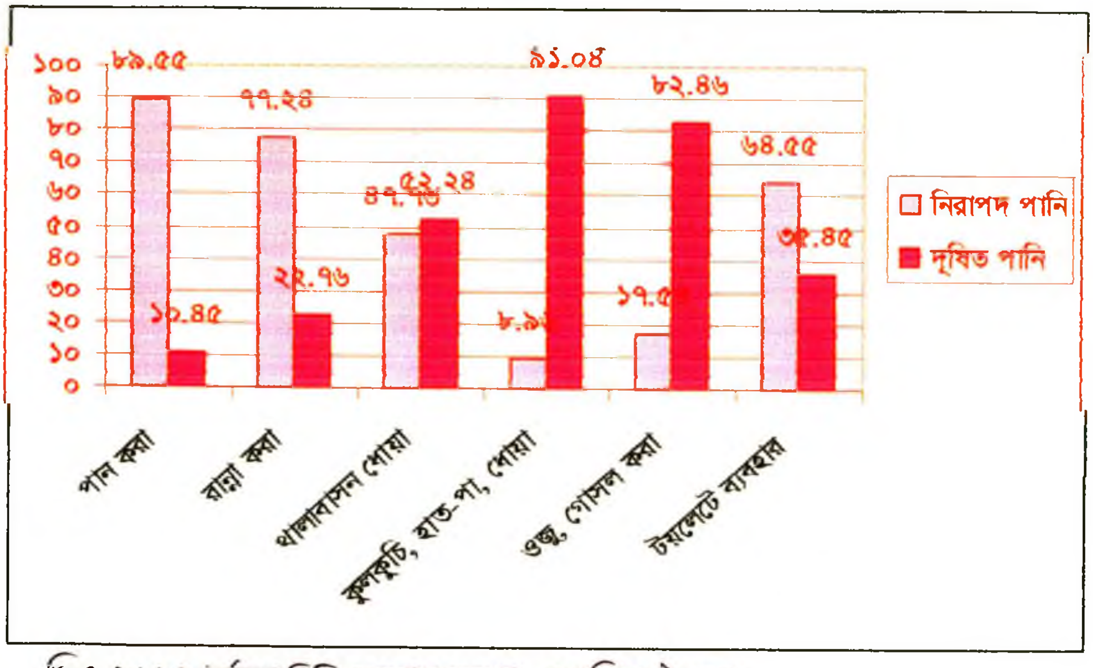

চিত্র ৮.৬ঃ বর্তমান বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত পানির উৎস

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৮.৬ ঃ বর্তমান বিভিন্ন কাজে রোগী ও তাদের পরিবারের পানি ব্যবহার।

আর্সেনিকের ভয়াবহতা আর্সেনিকোসিসের আগ্রাসন আজ সারাদেশ। যার শিকার এদেশের লক্ষ্য কোটি মানুষ। সেই আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে বিভিন্ন মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যম মানুষের প্রায় দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিচ্ছে আর্সেনিকের ভয়াবহতার বাণি। তথাপি আজও অনেক মানুষ এই বিষ ও বিষক্রিয়ার কোন পাত্তাই দিচ্ছেনা। অনেকে এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েও নিজে তার পরবর্তী বংশধরদের রক্ষার্থে কোনরূপ সুব্যবস্থা নিচ্ছে না। বিষয়টা উপরের সারণীতেই স্পষ্ট। আর্সেনিকের উপস্থিতি নিজেদের নলকূপে, নিজেও আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী এবং আর্সেনিকোসিস হওয়ার পেছনে নলকূপের আর্সেনিক দূষিত পানিই দায়ী এসব কিছু জেনেও এবং অন্যান্য অনেক রোগী তাদের গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে আজ পর্যন্তও (বর্তমান) বিভিন্ন দূষিত পানি ব্যবহার করছে। যেমন- পান করার জন্য ৮৯.৫৫% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার নিরাপদ দূষণমুক্ত পানি ব্যবহার করলেও ১০.৪৫% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার সেই দূষিত ও ভয়াবহ পানি পান করে যাচ্ছে।

রান্নাবান্না করার জন্য দূষিত পানি ব্যবহার করছে অনেক আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার। এক্ষেত্রে ২২.৭৬% পরিবার রান্না করার কাজে দূষিত পানি ব্যবহার করছে এবং বাকী ৭৭.২৪% পরিবার এই কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করছেন। এরপর আসছে থালাবাসন ধোয়ার বিষয়। এই কাজে বর্তমান ও প্রায় ৫২.২৪% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার দূষিত পানি ব্যবহার করছে। বাকী ৪৭.৭৬% পরিবার নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে।

কুলকুচি করা হাত-পা ধোয়া, ওজু করা এই কাজের জন্য মাত্র ৮.৯৬% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে। আর বাকী ৯১.০৪% পরিবার এখনও আর্সেনিক আক্রান্ত পানি অথবা পুকুর, ডোবা, নদী ইত্যাদির দূষিত পানি ব্যবহার করছে।

গোসল করার ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা অর্থাৎ ৮২.৪৬% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা গোসল বা স্নানে দূষিত পানি ব্যবহার করছে। সবশেষে আসা যাক পায়খানায় ব্যবহারের পানির কথায়। এক্ষেত্রে ৬৪.৫৫% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার নিরাপদ পানি এবং ৩৫.৪৫% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার দূষিত পানি ব্যবহার করছে।

Dhaka University Institutional Repository

আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত অনেক পরিবারও আক্রান্ত অনেক রোগী তাদের পান করা ও পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসচেতনতা এবং কিছু সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন- এই রোগ ধরা পরার পর, এই রোগের ভয়াবহতা বোঝানোর পর এমনকি আর্সেনিকে আক্রান্ত নলকূপগুলো লাল রঙের চিহ্ন দিয়ে ঐ নলকূপের পানি পান নিষিদ্ধ করার পরও অনেক আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার ও রোগীরা অদ্যবধি আর্সেনিক আক্রান্ত লাল রঙ চিহ্নিত নলকূপের পানি পান করে যাচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে ৩০০ জন আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যে তথ্য পেয়েছি পাওয়া গেছে তা অপর পৃষ্ঠায় দেয়া হল।

সারণী ৮.৯ ঃ আর্সেনিকন আক্রান্ত পানি পান বন্ধ করেছেন কিনা ?

রোগীদের মতামত	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ বন্ধ করেছি	২১৯	৭৩.০
না বন্ধ করি নাই	৮১	২৭.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্তও ২৭% আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগী আর্সেনিকের বিষ অবলিলায় পান করে যাচ্ছে। অনেকে বলছে "এই পানি আমরা সবাই খাচ্ছি অন্যদের তো যা-পচরা হচ্ছে না। আমার হয়েছে আমার দোষে, অন্যান্য কারণে।" আবার অনেকে বলেছে "এই আক্রান্ত পানিই পান করতে হচ্ছে, কারণ নতুন করে গভীর আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ বসানোর মত সামর্থ আমার নেই।" রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করা বন্ধ না করার ক্ষেত্রে যে তথ্য পেয়েছি তা নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৮.১০ ঃ আর্সেনিক যুক্ত পানি পান বন্ধ না করার কারণ

বন্ধ না করার কারণ সমূহ	গণ সংখ্যা	শতকরা হার
আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ না থাকা	১৭	৫.৭
আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ অনেক দূরে	২৩	৭.৭
নতুন করে আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ দেওয়ার টাকা না থাকা	২৮	৯.৩
আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে কিছুই হবে না	১৩	৪.৩
প্রযোজ্য নয় / আর্সেনিক মুক্ত পানি পান	২১৯	৭৩.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

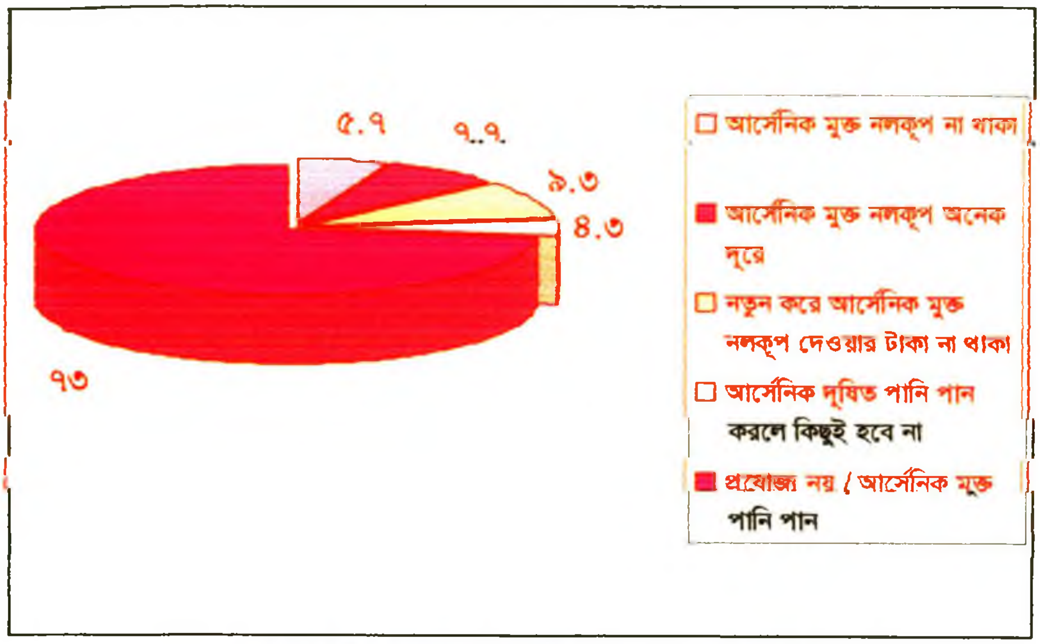

চিত্র ৮.৭ ঃ আর্সেনিক যুক্ত পানি পান বন্ধ না করার কারণ

সারণীতে দেখা যাচ্ছে মোট ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ৮১ জন বা ২৭% রোগী যারা অদ্যবদি আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে। এই ৮১ জনের মধ্যে ১৭ জন বা ৫.৭% রোগী বলেছে তাদের বাড়িতে আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ থাকলে তার পানি পান করতো। তাই এই টিউবওয়েল না থাকায় আর্সেনিক যুক্ত পানিই পান করছে। মোট রোগীর ৭.৭% এ আক্রান্ত রোগী বলেছে, আর্সেনিক মুক্ত পানি আনতে অনেক দূরে যেতে হয়। সেখান থেকে পানি এনে পান করা সম্ভব নয়। নতুন করে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ বসানোর টাকা নেই বা সামর্থ নেই এমন রোগী পাওয়া গেছে ২৮ জন। বা মোট রোগীর ৯.৩%। এ সংক্রান্ত আরো একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো এই আক্রান্ত পানি খেলে কিছু হবে না। এরা মোট রোগীদের ৪.৩% হলেও যারা শুধু মাত্র আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান বন্ধ করেন নাই এমন রোগীদের মধ্যে ১৬%।

পরিশেষে বলা যায় যে, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বাসস্থান, ঘরবাড়ি, এসব কিছু তাদের আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও বসতি, বসতির ধরণ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনেকটা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তথাপী আর্থিক সঙ্গতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জতাপূর্ণ প্রভাব এখানকার বসতি ও বসতির ঘরবাড়ির মধ্যে তেমন একটা পাওয়া যায় নি। পানীয় জলসহ গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জলের প্রাপ্ততা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনেক রোগীদের অসচেতনতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে উঠেছে। বিশেষ করে আর্সেনিক আক্রান্ত পানির ব্যবহার ও পান করা বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। অনেক রোগী আছে যারা জেনেছে তাদের নলকূপে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক আছে এবং সে নিজেও একজন আর্সেনিকোসিস রোগী, তারপরও সে আর্সেনিক আক্রান্ত পানি পান করে যাচ্ছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ্যনীয়, যারা আর্সেনিকে আক্রান্ত

Dhaka University Institutional Repository

নলকূপের পানি পান করছে সেই নলকূপ গুলো বেশীর ভাগই ৪০ থেকে ৮০ ফুট গভীর। এখানে নলকূপের ক্ষেত্রে আরো একটা শ্রেণী বিভাজন দেখানো হয়েছে তা হলো গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ। ৩৫-১৩৫ ফুট গভীরতা পর্যন্ত ধরা হয়েছে অগভীর নলকূপ। যেগুলোর প্রায় ১০০%ই আর্সেনিক যুক্ত। অপর পক্ষে ১৩৫ ফুটের ও বেশি গভীর যতগুলো নলকূপ পাওয়া গেছে সেগুলোকে ধরা হয়েছে গভীর হিসেবে। এ গুলোর বেশীর ভাগই আর্সেনিক মুক্ত। পানি পানে সচেতনতার ক্ষেত্রে একটি বিষয় উঠে এসেছে তা হলো, যে সব রোগীদের বাড়িতে আর্সেনিক যুক্ত অগভীর নলকূপ ছিল এবং যারা দীর্ঘদিন ঐ আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করে আসছিল। তারা বা তাদের বেশীর ভাগ পরিবার আর্সেনিক সনাক্ত করণের পর নতুন করে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ বসিয়েছে এবং বর্তমান তার পানি পান করছে। আরো একটা বিষয় উল্লেখ্য আর্থিক সামর্থ থাকলে অধিকাংশ পরিবার গভীর নলকূপ বসাতো।

৮. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সেনিটেশান ব্যবস্থা

মানুষ ও পরিবেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সেনিটেশান ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মলত্যাগ বা দেহের বর্জ পদার্থ নিশ্রিত হওয়া বা অপসারিত হওয়া একটি নিত্য নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার আত্মে বাধা আমাদের জীবন-যাপনের উপর ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রত্যেক মানুষের সেনিটেশান ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। এ সমস্ত মলমূত্র ও দূষিত বর্জ পদার্থ খোলা জায়গায় থাকলে, তা থেকে বিভিন্ন ধরণের রোগজীবাণুর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করে। কাজেই মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবণে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাত্বে সেনিটেশান ব্যবস্থা ও পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা এলাকায় জরিপকৃত আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সেনিটেশান ব্যবস্থা ও পদ্ধতি কেমন? তা নিম্নে আলোচিত হলো।

সেনিটেশানের প্রধান মাধ্যম হলো টয়লেট বা পায়খানা। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বাড়ির পায়খানা স্বাস্থ্য সম্মত নাকি খোলামেলা অস্বাস্থ্য সম্মত। সে সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো

সারণী ৮.১১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বাড়ির পায়খানার ধরণ

পায়খানার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
স্বাস্থ্য সম্মত	১৯৮	৬৬.০
অস্বাস্থ্যকর	১০২	৩৪.০০
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

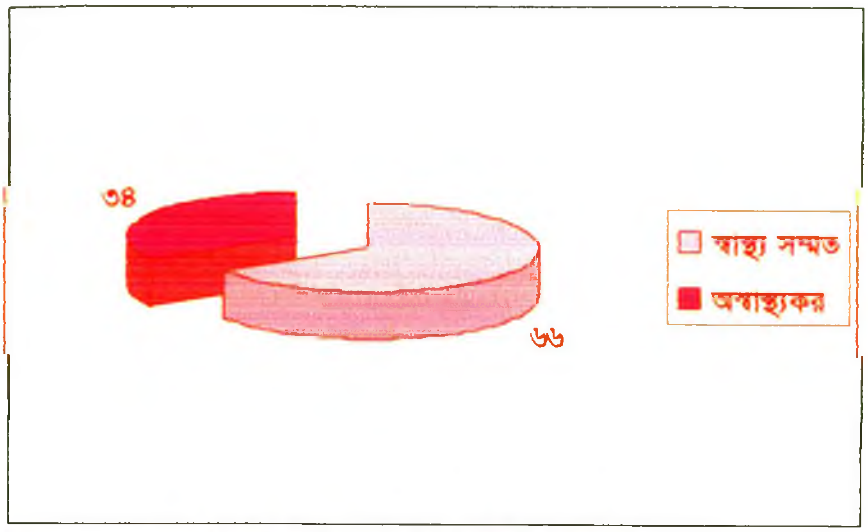

চিত্র ৮.৮ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বাড়ির পায়খানার ধরণ

উপরের সারণীতে দেখা যায় অধিকাংশ রোগীর বাড়িতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আছে। এখানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বলতে পিট / গর্ত করা ঢাকনা যুক্ত পায়খানা, রিং / স্লাব ঢাকনা যুক্ত পায়খানা এবং সম্পূর্ণ পাকা পায়খানা গুলোকে বুঝানো হয়েছে। আর এরূপ নিরাপদ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা রয়েছে ৬৬% রোগীর বাড়িতে। অপর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর খোলামেলা পায়খানা ব্যবহারকারীর রোগীদের সংখ্যা ও কম নয়। এই অস্বাস্থ্যকর পায়খানা বলতে বুঝানো হয়েছে, ঝুলন্ত খোলা পায়খানা, যে কোন খোলা জায়গা, যে কোন ঝোপঝাড় বা খোলা গর্তে পায়খানা বা মলত্যাগ করাকে। রোগীদের মধ্যে এরূপ পরিবারের সংখ্যা পাওয়া গেছে ১০২টি। অর্থাৎ রোগীদের ৩৪% বাড়িতেই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নেই। অবশ্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকার পেছনে বেশ কিছু কারণ ও উক্ত জরিপে উঠে এসেছে। কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সারণী ৮.১২ ঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী না করার কারণ

কারণসমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সচেতনতার অভাব	২২	৭.৩
টাকা / অর্থের অভাব	১২	৪.০
জায়গায় অভাব	৬৮	২২.৭
প্রযোজ্য নয় / স্বাস্থ্য সম্মত	১৯৮	৬৬.০
মোট	৩০০	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

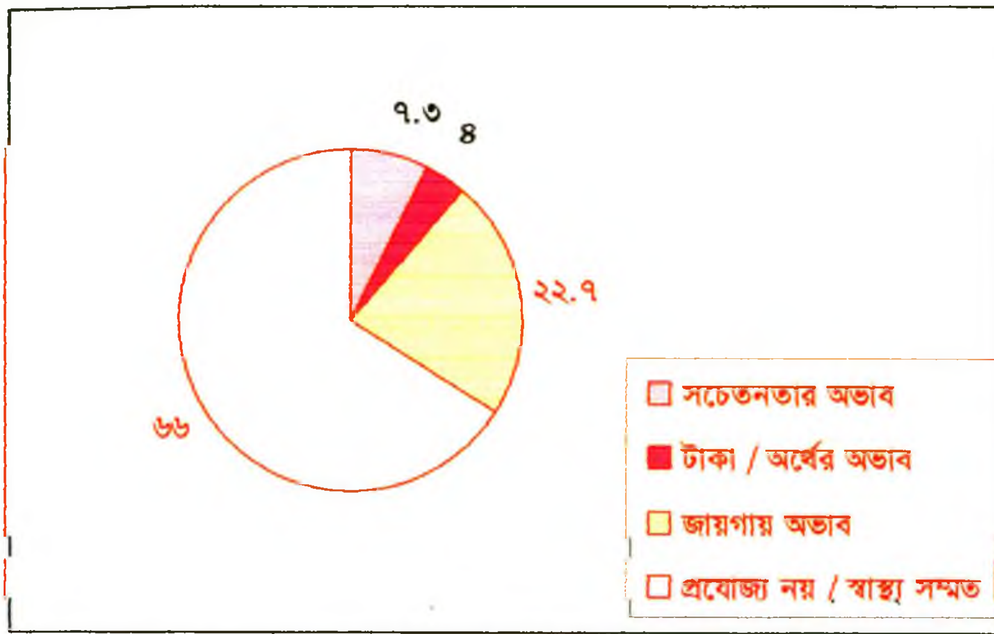

চিত্র ৮.৯ঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী না করার কারণ

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে মোট ৩০০টি রোগীদের মধ্যে ৭.৩% রোগী যারা অস্বাস্থ্যকর পায়খানায় বা পরিবেশে মলত্যাগ করে। এরা সচেতনার অভাবে ঝুলন্ত ও খোলামেলা পরিবেশে মলত্যাগ করে অভ্যস্ত এবং এটাই তাদের ভাল লাগে। তাছাড়া খোলামেলা পরিবেশে পায়খানা করলে কি কি ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে ও তাদের তেমন একটা ধারণা নেই। টাকা পয়সার অভাবে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী করতে পারছে না ৪% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা। এদের মোটামুটি স্বাস্থ্য সচেতনতা আছে। তবে সবচেয়ে বেশী যে সমস্যাটির কথা রোগীরা উল্লেখ করেছে তা হলো জায়গায় অভাব। কথাটি নিম্নভূমি শিবচরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একই বাড়িতে অনেক পরিবার তথা লোকের বসবাসের কারণে বাড়িতে জায়গার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে বেশীর ভাগ পরিবার, যাদের স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নেই তারা সম্মিলিত পায়খানায় মলত্যাগ করে। আর এরূপ রোগীর সংখ্যা পাওয়া গেছে ৬৮ জন বা ২২.৭%।

স্বাস্থ্য সচেতনতার আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো টয়লেটে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে স্যান্ডেলের ব্যবহার। উক্ত জরিপে দেখা গেছে, ৫০% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা পায়খানায় যাওয়া ও আসার সময় কোন প্রকার স্যান্ডেল ব্যবহার করে না। কেন এরা স্যান্ডেল ব্যবহার করার কারণ নিম্নরূপ।

সারণী ৮.১৩ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পায়খানায় যাওয়া ও আসার ক্ষেত্রে স্যান্ডেল ব্যবহার না করার কারণ

কারণ সমুহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
স্যান্ডেল না থাকা	২৪	৮.০
স্যান্ডেল ব্যবহার মনে না থাকা	৮২	২৭.৩
স্যান্ডেল ব্যবহার না করলে কিছু হবে না	৪৪	১৪.৭
প্রযোজ্য নয় / স্যান্ডেল ব্যবহার করে	১৫০	৫০.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

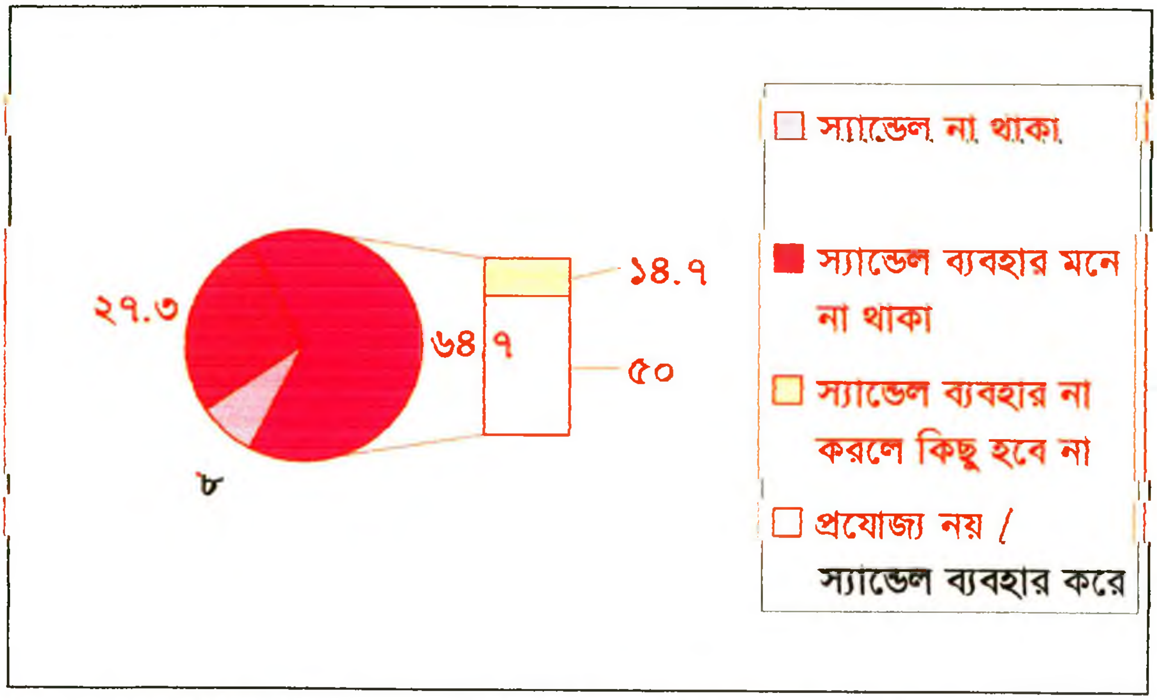

চিত্র ৮.১০ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের পায়খানায় যাওয়া ও আসার ক্ষেত্রে স্যান্ডেল ব্যবহার না করার কারণ

সারণীতে লক্ষ্যনীয় যে, মোট ১০০% রোগীর মধ্যে ৮% রোগী যারা পায়খানায় যাওয়ার সময় স্যান্ডেল ব্যবহার করে না। তাদের স্যান্ডেল নেই। কিন্তু যাদের স্যান্ডেল আছে, অথচ পায়খানায় যাওয়ার আগে স্যান্ডেল পড়তে হবে এ বিষয়টি মনে বা স্বরণ থাকে না এরূপ রোগীর সংখ্যাও কম নয়। দেখা গেছে প্রায় ২৭.৩% রোগী যাদের স্যান্ডেল থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মনে না পড়ার কারণে পায়খানায় যাওয়ার পূর্বে স্যান্ডেল পড়ে না। আবার এ বিষয়ে একে বারে অসচেতন লোক বা রোগীও রয়েছে বেশ কিছু। যেমন- ৩০০ জনের মধ্যে ৪৪ জন বা ১৪.৭% রোগী বলেছে টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে স্যান্ডেল ব্যবহার না করলে কিছুই হবে না।

এরপর আসা যাক পায়খানা হতে ফিরে এসে হাত পরিষ্কারের বিষয়টিতে। পায়খানা থেকে এসে আর্সেনিকোসিসে রোগীরা হাত পরিষ্কার করে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ২৬৪ জন বা ৮৮% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী বলেছে তারা পায়খানা হতে ফিরে এসে হাত পরিষ্কার করে এবং বাকী ১২% আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী বলেছে, পায়খানায় পানি খরচের পর নতুন করে আর হাত ধোয়ার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ১২% রোগী হাত পরিষ্কার করে না। যারা টয়লেট হতে ফিরে এসে হাত পরিষ্কার করে। তারা কিভাবে, কি দ্বারা হাত পরিষ্কার করে সেটা তাদের সচেতনার বিষয়। সে সংক্রান্ত তথ্য নিচের সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৮.১৪ ঃ টয়লেট হতে ফেরার পর হাত পরিষ্কার করার উপায় সমূহ

কারণ সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
শুধু পানি দ্বারা	৮৩	২৭.৭
সাবান দ্বারা	৬৭	২২.৩
ছাই অথবা মাটি দ্বারা	১১৪	৩৮.০
প্রযোজ্য নয়	৩৬	১২.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

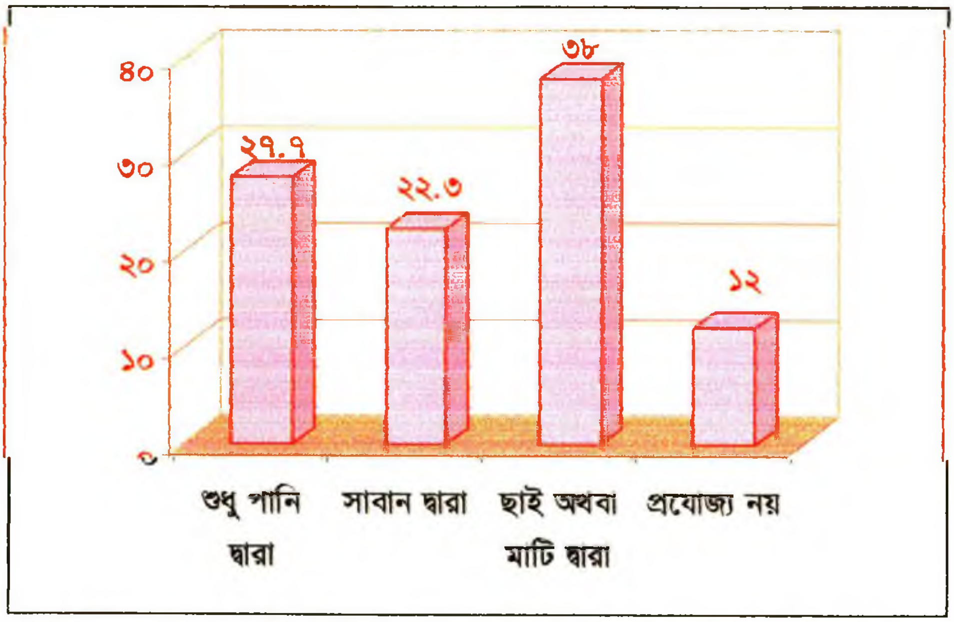

চিত্র ৮.১১ ঃ টয়লেট হতে ফেরার পর হাত পরিষ্কার করার উপায়সমূহ

সারণীতে লক্ষ্যণীয় ২৭.৭% রোগীই টয়লেট হতে ফিরে বিশেষভাবে হাত বা পা পরিষ্কার করে না। তারা শুধু পানি দ্বারা হাত পা ধুয়ে ফেলে। ছাই বা মাটি দ্বারা হাত পরিষ্কার করে

সবচেয়ে বেশী রোগী। অর্থাৎ ৩৮% রোগী পায়খানা হতে ফেরার পর ছাই অথবা মাটি দ্বারা হাত পরিস্কার করে। এক্ষেত্রে সাবান ব্যবহার করে খুব কম সংখ্যক রোগী। সারণীতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২২.৩% রোগী টয়লেট হতে ফেরার পর সাবান দিয়ে হাত ধৌত করে। টয়লেট হতে ফেরার পর ভালভাবে হাত পরিষ্কার করার বিষয়টা অনেক পূর্ব হতেই বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে আসছে। কেননা পায়খানা হতে ফেরার পর হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে পরিষ্কার না করলে বিভিন্ন ধরণের রোগ জীবানু হাত বা পা দ্বারা পেটে প্রবেশ করে। তথাপি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকারীদের মধ্যে অধিকাংশই টয়লেট হতে ফেরার পর তাদের হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে না। অনেকের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সচেতনার অভাবে, ২০০৬ সালে এসেও টয়লেট ফেরার পর শুধুমাত্র পানি দিয়ে হাত পরিষ্কার করে বা আদৌ করে না।

শিবচরের প্রত্যেকটি রোগীর বাড়ীতে আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়, তাহলো প্রায় প্রত্যেক ঘরেই দু/একটা ৫ বছরের কম বয়সী শিশু আছে। তাদের ব্যাপারে কেমন যত্নবান বা তারা যে পায়খানা প্রস্রাব করে সেগুলো কিভাবে পরিষ্কার করে বা কোথায় ফেলে? অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কতটুকু সে সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

সারণী ৮. ১৫ ঃ পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মল ফেলার স্থান

বাচ্চাদের মল ফেলার স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নির্ধারিত টয়লেটে	৪৩	১৪.৩
ঝোড় জঙ্গল	১৫৪	৫১.৩
যেখানে সেখানে	৬৪	২১.৩
অন্যান্য	৩৯	১৩.০
মোট	৩০০	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

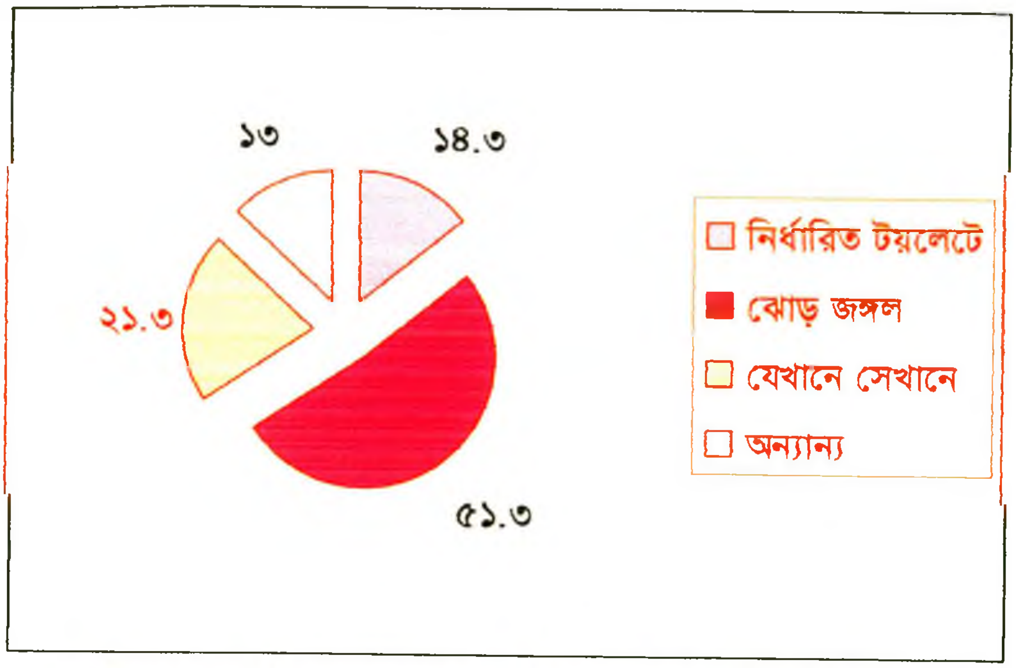

চিত্র ৮.১২ ঃ পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মল ফেলার স্থান

সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৪.৩% রোগী তাদের বা তাদের বাড়ীর বাচ্চাদের মল নির্ধারিত টয়লেট বা গর্তে ফেলে। যেখান থেকে কোন রকম দূর্গন্ধ বাইরে বেরুতে পারবে না। অর্থাৎ এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মোটামুটি সচেতন। ৫১.৩% রোগী বা তাদের পরিবারের লোকজন বাচ্চাদের মলমূত্র ঝোড়ে-জঙ্গলে বা আশে-পাশের বাগানে ফেলে। আর এই বাগান বা ঝোড় জঙ্গল হলো পরিপূর্ণ একটি খোলা ময়দান। শুধু তাই নয় ২১.৩% রোগী বা তাদের বাড়ির বাচ্চাদের পায়খানা ফেলেই না বা ফেললেও যেখানে সেখানে যত্রতত্র অবস্থায় ফেলে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে (৫১.৩ + ২১.৩) =৭২.৬% রোগী বা তাদের পরিবারই বাচ্চাদের মলমূত্র কোথায় ফেলতে হবে সে ব্যাপারে সচেতন নয়। এছাড়া আরো একটি বিষয় রয়ে গেছে তা হলো অন্যান্য জায়গায় শিশুদের মলমূত্র ফেলা। প্রায় ১৩% রোগী বা তাদের পরিবার বাচ্চাদের মলমূত্র পুকুর বা নদীর পানিতে ধুয়ে ফেলে, পার্শ্ববর্তী ডোবায় ধুয়ে ফেলে অনেকে নদীর স্রোতে ফেলে দেয়, অনেকে মাটির নীচে পুতে রাখে, এভাবে বিভিন্ন পন্থায় তারা বাচ্চাদের মল অপসারণ করে।

এরপর আসা যাক বাচ্চাদের মলমূত্র ফেলার পর হাত পরিষ্কারের বিষয়ে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৯০% লোক বা রোগীসহ তাদের পরিবারের লোক বাচ্চাদের মল ফেলার পর হাত পরিষ্কার করে এবং বাকী ১০% হাত পরিষ্কার করে না। যারা বাচ্চাদের মল পরিষ্কারের পর হাত পরিষ্কার করে না। তাদের সচেতনতা একেবারে নেই বললেই চলে। আর যারা হাত পরিষ্কার করে এবং কিভাবে কি দ্বারা করে সে বিষয়ের উপরও সচেতনতা নির্ভর করে। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি তথ্য প্রদান করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের মলমূত্র পরিষ্কারের পর যারা হাত ধৌত করে তাদের মধ্যে বেশ অসচেতনতা রয়েছে। অর্থাৎ শুধু পানি দ্বারাই অধিকাংশ লোক হাত পরিষ্কার করে। সাবান দ্বারা হাত পরিষ্কার করে খুবই কম সংখ্যক লোক। মাটি অথবা ছাই দ্বারা পরিষ্কার করে ২৪% রোগী বা রোগীর পরিবার। ৫২.৭% রোগী বা রোগীর পরিবার হাত পরিষ্কার করে শুধুমাত্র পানি দিয়ে, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে মাত্র ১৩.৩% লোক।

৭/৯. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা

স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাস্থ্যই সুখের মূল, প্রবাদটি যেমনই সুন্দর তেমনই কার্যকরী। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মন, প্রাণ, দেহ, কিছুই ভাল থাকে না, কোন কাজ কর্মে মন বসে না এবং কোন কাজকর্ম ঠিকমত করাও যায় না। অর্থাৎ স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। কাজেই এই সম্পদ আমাদের গড়তে হবে এবং গড়ার পর তার যত্ন নিয়ে রক্ষাও করতে হবে। শরীর যাতে বিভিন্ন ভাবে রোগাক্রান্ত না হয় সে দিকে পুরাপুরি যত্নবান হতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতনতার জ্ঞান, যেমন- কিভাবে বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়ায় এবং মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে? কিসের দ্বারা এ সকল রোগ জীবাণু সংক্রামিত হয় ? ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। প্রথমে আসা যাক নিরাপদ পানির ব্যাপারে। অর্থাৎ নিরাপদ পানি পান বা ব্যবহার না করলে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এ সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৮.১৬ ঃ নিরাপদ পানি পান / ব্যবহার না করলে কিকি রোগ হয় ? এ ব্যাপারে রোগীদের মতামত ঃ

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ডায়রিয়া হতে পারে	৩৯	১৩.০
আমাশয় হতে পারে	৪	১.৩
চর্ম রোগ হতে পারে	৪৮	১৬.০
ক্রিমি রোগ হতে পারে	৯	৩.০
জন্ডিস রোগ হতে পারে	১২	৪.০
আর্সেনিকোসিস হতে পারে	১৮	৬.০
উপরের সবগুলো	১৭০	৫৬.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

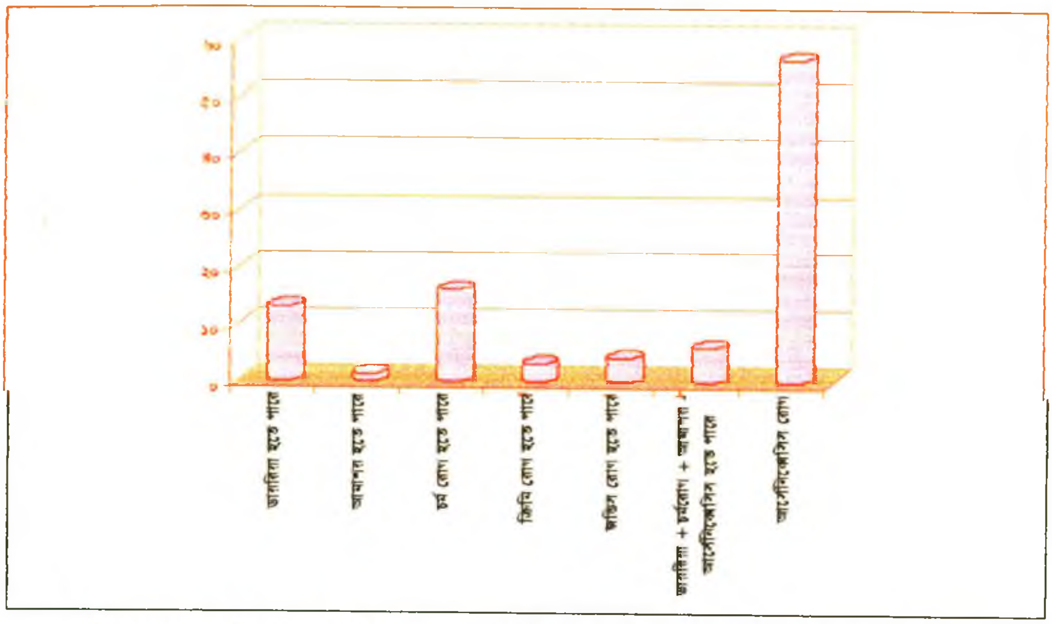

চিত্র ৮.১৩ ঃ নিরাপদ পানির অভাবে সৃষ্ট রোগ সম্পর্কে রোগীদের মতামত

সারণীতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৩% রোগীর ধারণা নিরাপদ পানি পান না করলে বা ব্যবহার না করলে ডায়রিয়া হতে পারে। বিষয়টি আরো বেশী হওয়া উচিৎ ছিল। অর্থাৎ সচেতন হলে প্রায় ১০০% লোকই বলতো নিরাপদ পানি পান না করে, দুষিত পানি পান করলে কলেরা রোগ হতে পারে। অবশ্য একাধিক রোগ হতে পারে একথা বলেছে প্রায় ৫৭% রোগীরা, তাদের মতে নিরাপদ পানির অভাবে ডায়রিয়া সহ, আমাশয়, চর্মরোগ, জন্ডিস ও আর্সেনিকোসিস রোগ হতে পারে। অবশ্য চর্ম রোগের কথা বলেছে অনেক রোগী। ১৬% রোগী বলেছে দূষিত পানি পান করলে চর্মরোগ হয়। অবশ্য এই চর্ম রোগের সাথে আর্সেনিকোসিসের একটা সম্পর্ক আছে। তারা অনেকেই আর্সেনিকোসিসকে চর্ম রোগ বলে আখ্যায়িত করেছে। নিরাপদ পানির অভাবে ক্রিমি ও জন্ডিস রোগ হতে পারে এরূপ তথ্য দিয়েছে খুব কম সংখ্যক রোগী। মাত্র ৩% রোগী বলেছে ক্রিমি রোগের কথা। ৪% রোগী বলেছে জন্ডিস রোগের কথা। তবে আমাশয় রোগের কথা বলেছে খুবই কম মাত্র ১.৩% রোগী। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর্সেনিকোসিসের কথা বলেছে মাত্র ৬% রোগী। এদের মতামত দূষিত পানি পান করলে আর্সেনিকোসিস হতে পারে। রোগীদের সচেতনতার বিষয়টি এখানেও স্পষ্ট।

পরিশেষে বলা যায় আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। আর এই স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সব বিষয়গুলো, (যেমন- সেনিটেশন সচেতনতা, নিরাপদ পানি পানের সচেতনতা, নিরাপদ পানির অন্যান্য ব্যবহারের সচেতনতা, পুষ্টিকর অপুষ্টিকর খাবার যাছাই বাছাই করে খাওয়া, সর্বপরি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো সম্পর্কে রোগীর এখন পর্যন্ত সচেতন হতে পারে নাই। কাজেই এ পর্যায়ের লোকদের তথা রোগীদের সচেতন করার ক্ষেত্রে আরো প্রচার প্রচারণা চালানো উচিৎ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

৯

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

১. আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা ও সচেতনতা

বর্তমান এটি সার্বজনিন যে, অতিরিক্ত মাত্রায় যে কোন ধরণের আর্সেনিক মানবদেহে অনুপ্রবেশ করলে বিষাক্ততার সৃষ্টি হয় এবং এ বিষাক্ততার দরুণ নানা প্রকার জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে আর্সেনিকোসিস উল্লেখযোগ্য ও মারাত্মক। শুধু স্বাস্থ্য সংকটই নয়, আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবার নানা ধরণের সামাজিক ও মানসিক সমস্যার ও মুখোমুখি হয় এবং হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ সমস্যা দেশের গ্রামীণ জনপদে ক্রমাগত ও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অজ্ঞানতা, তথ্যের অভাব, কুসংস্কারসহ বিভিন্ন কারণে পল্লী জনপদে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হওয়াকে আল্লাহর গজব বা অভিসাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। দেশের অনেক জনপদে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে কুষ্ট ও ছোঁয়াছে রোগ ভেবে ‘এক ঘরে’ করে রাখা হচ্ছে। এসব কারণে আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামগুলোকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে অনেকেই ভাল ভাবে মেলামেশা করতে চান না। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আর্সেনিকোসিস বড় ধরণের সংকট তৈরী করছে। অনেক এলাকায় আক্রান্ত মেয়েদের বিয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ছে। অপর দিকে বিবাহিত নারীদেরও আর্সেনিকোসিসের কারণে শশুর বাড়ী হতে বিতারিত হতে হচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশীরাও তাদের নলকূপের পানি পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীদের ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। এসব ঘটনা উক্ত গবেষণা এলাকায় তেমন একটা না থাকলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের নারীরা এমনিতেই পশ্চাদপদ, অনগ্রসর ও বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনার শিকার। আর্সেনিকোসিসের আক্রমণ তাদের জন্য আরো একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর্সেনিকোসিস গ্রামাঞ্চলের নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশী সংকটময় রূপ পরিগ্রহ করছে। আবার অনেকে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছে বা অনেকে আর্সেনিকোসিসের কথা স্বীকারই করছে না, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা হতে পারে এমনটি ভেবে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে যথাযথ প্রচারণার অভাবে আর্সেনিক দূষণ গ্রামাঞ্চলে বহুবিধ সংকট তৈরী করছে। ফলে আক্রান্তরা কারণে বা অকারণে বিভিন্ন নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. সামাজিক প্রতিক্রিয়া

আর্সেনিকোসিসের সামাজিক প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশে ব্যপক ও বিশাল আমেনা বেগম (৩৬) একজন আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী। তার ত্বকে দেখা দিয়েছে ঘন বাদামী রঙের দাগ, আর এজন্য প্রতিবেশীরা তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছে। এরূপ সমস্যা শুধু আমেনা বেগমের একার নয়, সারা দেশ জুড়ে তার মত অসংখ্য মানুষ নীরবে নিভৃতে মৃত্যুদূত আর্সেনিকের বিষে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক বঞ্চনা সহ্য করছে আর মৃত্যুর প্রহর গুনছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এরূপ দাগওয়ালা মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না। বাবা-মার কাছেও এই কষ্ট কি কম? আবার বিবাহিত মেয়ে যাদের শরীরে আর্সেনিকোসিসের নমুনা দেখা দিয়েছে, তাদেরকেও স্থায়ীভাবে না হলেও অস্থায়ীভাবে বাপের বাড়ী চলে আসতে হচ্ছে। আবার যে সব কর্মক্ষম পুরুষ ও নারীদের শরীরে আর্সেনিকোসিসের লক্ষণ ধরা পড়েছে তাদের নিজেদের তো কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছেই; অধিকন্তু অন্যান্যরাও কাজে তাদেরকে নিতে বা তাদেরকে কাজ দিতে, অপারগতা প্রকাশ করছে। এভাবে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত মানুষ অসুস্থ্য হয়ে বাড়ীর ও সামাজিক মর্যাদা দুইই হারাচ্ছে।

২.১. কর্মক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া

কর্মক্ষেত্রে শিবচর থানার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা বা কিরূপ সমস্যা হচ্ছে সে সংক্রান্ত দুইটি সারণী নিম্নে দেওয়া হলো ।

সারণী ৯.১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সমস্যার ধরণ

সমস্যা সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হাত, পা, শরীর ও মাথা ব্যথা থাকে	৫০	১৬.৭
শরীরে জ্বর থাকে	৪৪	১৪.৭
বমি বমি লাগে	৫৫	১৮.৩
চোখ জ্বালা পোড়া করে	৯	৩.০
হাত, পা, শরীর চুলকায়	৫৫	১৮.৩
কাজে নিতে চায় না	১৮	৬.০
কাজ করতে সমস্যা হয় না	৬৯	২৩.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

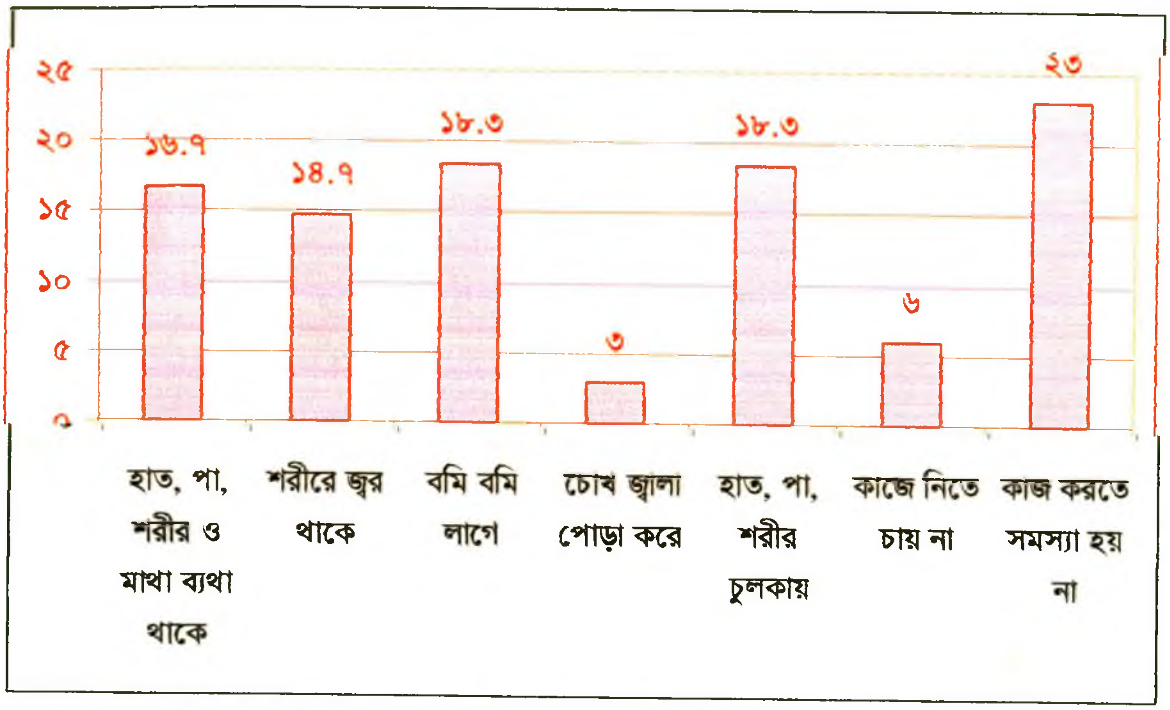

চিত্র ৯.১ ঃ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সমস্যার ধরণ

সারণী দুটিতে লক্ষণীয় আর্সেনিকোসিসের কারণে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে গিয়ে রোগীরা যে সকল সমস্যা সম্মুখিন হচ্ছে তা স্পষ্ট। ৭৭% রোগী বলেছে এই রোগের কারণে কাজ করতে সমস্যা হয়। যেমন- আর্সেনিকোসিসের কারণে, হাত, পা, মাথা এমন কি সমস্ত শরীর ব্যথা থাকে ফলে ১৬.৭% রোগীরা নিয়মিত কাজ করতে পারে না। শরীরে জ্বর থাকার কারণে ১৪.৭% রোগী নিয়মিত কাজ করতে পারে না। এই রোগের কারণে বমি বমি লাগে এমন কথাও বলেছে অনেক লোক প্রায় ১৮.৩%। এই রোগের কারণে চোখ জ্বালা পোড়া করে এমন সমস্যার কথা বলেছে ৩% রোগী। হাত, পা, শরীর চুলকায় এমনটি হয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে। ১৮.৩% রোগী এই সমস্যার কারণে নিয়মিত কাজ করতে পারছে না। সামাজিক সমস্যার ও সচেতনতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি বিষয় বেড়িয়ে এসেছে তা হলো ৬% রোগী বলেছে আর্সেনিকোসিস হওয়ার কারণে দিনমুজুর পর্যায়ের লোকদের কেউ কাজে করাতে নিতে চায় না। মাত্র ২৩% লোক যাদের আর্সেনিকোসিসের মাত্রাও একটু কম তারা বলেছে এই রোগের কারণে তাদের কাজকর্ম করতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।

ছাত্র পেশাধারী . সকল রোগী সহ সকল রোগীদের সামাজিক সচেতনতা যাচাইয়ের জন্য তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আর্সেনিকোসিস কোন রোগী যদি ছাত্র হয় তাহলে এই রোগের কারণে তাকে স্কুলে অথবা কলেজ থেকে বের করে দেয়া হয় কিনা ? বা তাকে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় কিনা ? এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে রোগীরা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৯.২ ঃ স্কুল থেকে ছুটি / বের করে দেওয়া হয় কিনা?

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
স্কুল হতে বের করে / ছুটি দেওয়া হয়	১৪	৪.৭
বাধ্যতামূলক ছুটি / বের করে দেওয়া হয় না	১৯২	৬৪.০
কি করা হয় জানিনা	৯৪	৩১.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, বেশীর ভাগ রোগীই বলেছে স্কুল বা কলেজ হতে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বের করে দেওয়া হয় না বা বাধ্যতামূলক ছুটি ও প্রদান করা হয় না। মাত্র ৪.৭% রোগীদের মতামত হলো এই রোগের কারণে স্কুলে বা কলেজ হতে বের করে দেওয়া হয়। তবে শুনেছি স্কুল বা কলেজের শিক্ষকরা অনেক সময় এই রোগাক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এদের স্কুল বা কলেজে না আসার জন্য পরামর্শ দেন। ৩১.৩% রোগীরা এ সংক্রান্ত কোন মতামত দেয়নি। তারা বলেছে মাস্টাররা কি করে তা আমরা জানিনা?

২.২ পারিবারিক ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া

সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবার। গবেষণা এলাকায় ২৬৮ টি পরিবারে রয়েছে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ৩০০ জন রোগী। রোগীদের প্রতি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচার-ব্যবহার কেমন তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে উক্ত গবেষণায়। যেমন- পারিবারিক ক্ষেত্রে রোগীদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন, রোগের হওয়ার ক্ষেত্রে নিজেস্ব কোন দোষত্রুটি, আক্রান্তকারীদের পরিবার থেকে কোন রোগীকে পৃথক করে রাখা, খাওয়া-পরার সমস্যা ইত্যাদি। আরো অসংখ্য সমস্যা, ফলশ্রুতিতে তাদের উপর অত্যাচার। নিম্নে আর্সেসিকোসিস হওয়ার কারণে রোগীরা তাদের পরিবার হতে কতটুকু বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সে সংক্রান্ত একটি টেবিল নিম্নে দেওয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৯.৩ ঃ আর্সেনিকোসিসের কারণে পরিবার হতে পৃথক করে রাখার মতামত।

পৃথক রাখা হয় কিনা ?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পৃথক করে রাখা হয় নাই	২৯৫	৯৮.৩
পৃথক করে রাখা হয়েছিল / হয়	৫	১.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে লক্ষণীয়, এই রোগের কারণে রোগীদের প্রতি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হিংস্রা, বিদ্বেশ, ঘৃণা নেই বললেই চলে। মাত্র ১.৭% রোগী বলেছে আর্সেনিকোসিস হওয়ার কারণে তাদেরকে তাদের সংসার হতে একটু ভিন্ন রাখা হয়েছিল। প্রথমত তারা (অন্যান্য সদস্য) এই রোগটিকে ছোঁয়াছে রোগ মনে করেছিল। তাই কিছুদিন আলাদা করে রেখেছেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আরো একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল এভাবে ; আপনি রোগাক্রান্ত, আপনার বেশী বেশী পুষ্টিকর খাবার ক্ষেতে হবে ; কিন্তু পরিবারের সকলের জন্য তেমন পুষ্টিকর খাবার যোগার করা সম্ভব নয়। শুধু মাত্র রোগী হিসেবে আপনাকে আলাদা ভাবে এসব পুষ্টিকর খাবার খাইয়েছে কিনা? জরিপকৃত এলাকার এরূপ তথ্য নিম্নরূপ।

সারণী ৯.৪ ঃ রোগীকে তার পরিবার আলাদাভাবে বিশেষ খাবার খাওয়ানো

বিশেষ খাবার খাইয়েছে কি ?	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিশেষ খাবার খাওয়ায় নাই	২৭১	৯০.৩
বিশেষ খাবার খাইয়েছে	২৯	৯.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে লক্ষ্যণীয় মাত্র ৯.৭% রোগীদের ডাক্তারী পরামর্শ অনুযায়ী আর্সেনিকোসিস নিরাময়ের জন্য কিছু পুষ্টিকর পোথ্য খাবার খাইয়েছে এবং বাকী ৯০.৩% রোগীদেরকে পরিবারের নিত্যদিনের স্বাভাবিক খাবার খাইয়েছে। অর্থাৎ ৯০.৩% রোগীদেরই বিশেষ রোগ নিরাময় জাতীয় খাবার খায়ানো হয়নি।

সমাজেরই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ পরিবার। যে পরিবারে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী আছে, সেই রোগী তাদের পরিবারে কেমন আছে বা এক্ষেত্রে তাদের কোন সমস্যা আছে কিনা ? পারিবারের সদস্যরা তার প্রতি কেমন ব্যবহার করছে সে সংক্রান্ত একটি সরণী নিম্নে দেওয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৯.৫ ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীর সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবহার

ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ভাল ব্যবহার	২১২	৭০.৭
খারাপ ব্যবহার	৮৮	২৯.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৭০.৭% রোগীদের ক্ষেত্রে, তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ভাল আচরণ করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে ২৯.৩% রোগী রয়েছে যারা তাদের পরিবার হতে ভাল ব্যবহার পায় না। পারিবারিক বিভিন্ন কাজ কর্মে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে না।

২.৩. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া

আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে রোগীদের বিবাহ-সাধী ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদীর ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা এই গবেষণায় উৎঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা বিবাহসাদী হলো একটি সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি অন্যতম মাধ্যম। সমাজে যে সকল মানুষের অবিবাহিত অবস্থায় আর্সেনিকোসিস হয়েছে অথবা অবিবাহিত অবস্থায় আর্সেনিকোসিস হলে সমাজে বিবাহ কার্যক্রমে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় বা হচ্ছে কিনা ? এ প্রশ্নের জবাবে, আক্রান্ত রোগীদের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল।

সারণী ৯.৬ ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা

আক্রান্ত রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে	৪২	১৪.০
বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে না	২৪২	৮০.৭
বলতে পারে না	১৬	৫.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

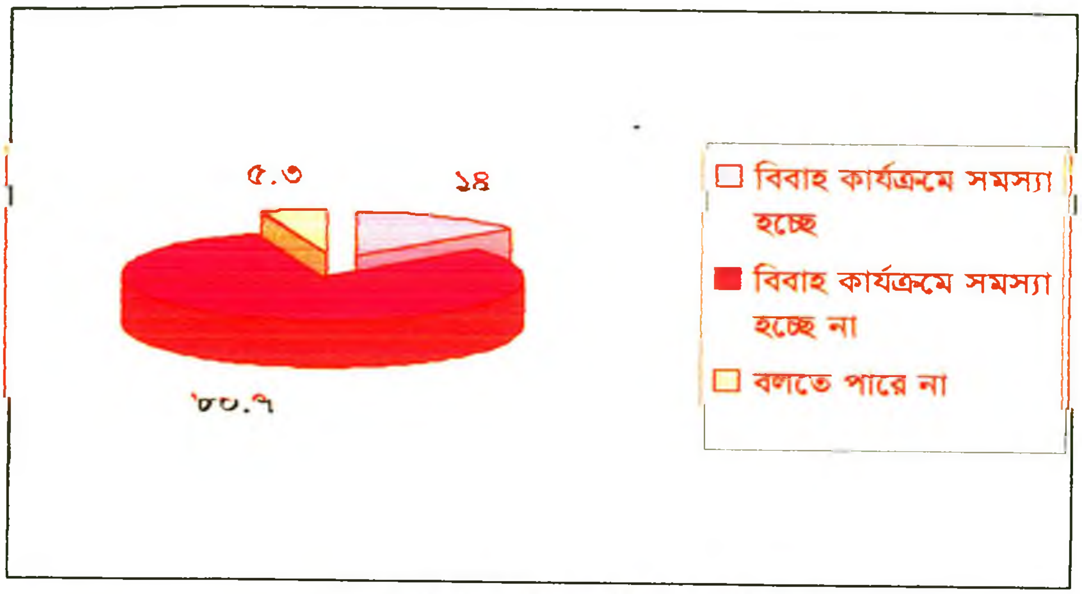

চিত্র ৯.২ ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা

সারণী থেকে বোঝা যাচ্ছে বিবাহ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আর্সেনিকোসিস রোগীদের তেমন একটা সমস্যার সৃষ্টি করছে না। ৮০.৭% রোগীদের মতামত হলো সমাজে আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে অন্তত বিবাহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু রোগীদের একটা বিরাট অংশ ১৪% রোগীদের বলেছে অবশ্যই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সমস্যাগুলো বেশ জটিল নিম্নে এই সমস্যা সম্বলিত একটি টেবিল দেওয়া হলো।

সারণী ৯.৭ ঃ আর্সেনিকোসিসের কারণে বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা সমূহ

সমস্যার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আর্সেনিকোসিস একটি ছোঁয়াচে রোগ	২০	৬.৭
অধিক যৌতুক দাবী করে	১৭	৫.৭
ঘা, পাচরা দেখে ফিরে যায়	৫	১.৭
প্রযোজ্য নয়	২৫৮	৮৬.০
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

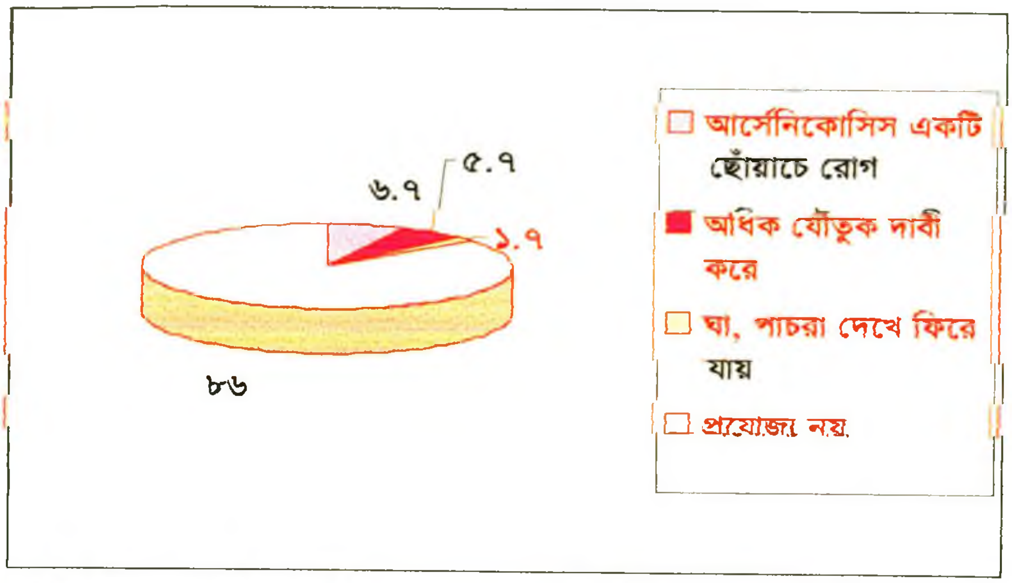

চিত্র ৯.৩ ঃ আর্সেনিকোসিসের কারণে বিবাহ কার্যক্রমে সমস্যা সমূহ

সারণীতে দেখা যাচ্ছে মোট রোগীর ১৪% বলেছিল বিবাহ কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা হয় এবং এই সমস্যাগুলো মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী। জামাই বা বর পক্ষের লোকজন আর্সেনিকোসিস রোগকে ছোঁয়াচে রোগ মনে করে। অনেক সময় বর পক্ষ কনের আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে তার চিকিৎসার অজুহাতে বা যে কোন স্বার্থে মেয়ে পক্ষের নিকট অধিক হারে যৌতুক দাবী করে। অবশ্য এটি হতে পারে বিবাহ না করার অজুহাত। প্রায় ৬% রোগী এরূপ মতামত পোষণ করেছে। হাত, পায়ের ঘা দেখতে বেশ খারাপ বা অমশৃন। তাই এরূপ অবস্থা দেখেও অনেকে বিয়ে করতে এসে ফিরে যায়। এরূপ মতামত পোষণ করছে ১.৭% রোগী।

এরপর আসা যাক বিয়ের পরের অবস্থায়। অর্থাৎ বিয়ের পরেও বেশ কিছু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে। অনেক রোগী অবলিলায় বলে ফেললেন সেকথা। যেমন- বিবাহ বিচ্ছেদ, বাপের বাড়ি ফিরে আসা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি। আর্সেনিকোসিসের কারণে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে কিনা এবং বাপের বাড়ি পাঠিয়ে জানতে চাইলে দেয় কিনা ? রোগীরা নিম্নোক্ত মতামত পোষণ করেন।

সারণী ৯.৮ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়া

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে	২৫	৮.৩
বিবাই বিচ্ছেদ হচ্ছে না|	২৪৮	৮২.৭
মোট	৩০০	১০০
বাপের বাড়ী ফিরতে হচ্ছে	২৭	৯.০
বাপের বাড়ী ফিরতে হচ্ছে না	২৪৬	৮২.০
জানিনা	২৭	৯.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

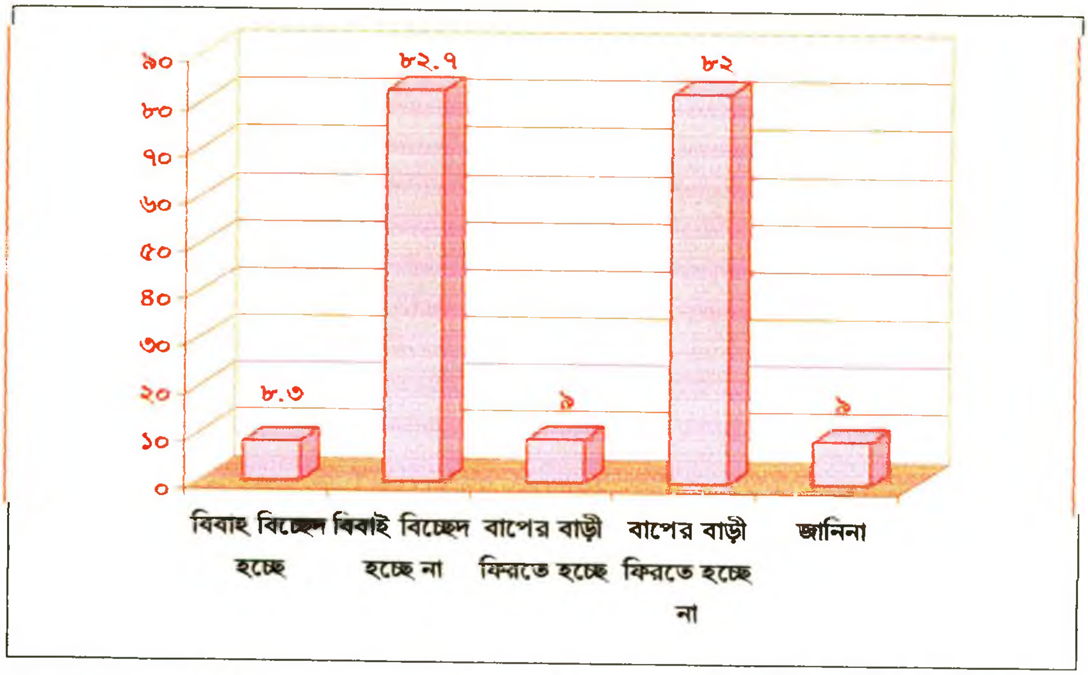

চিত্র ৯.৪ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়া

সারণীতে লক্ষণীয় আর্সেনিকোসিসের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া উভয় ক্ষেত্রেই বেশ কিছু নেতিবাচক মনোভাবের কথা উঠে এসেছে। উভয়ক্ষেত্রেই ৯% রোগীদের মতামত হলো তারা জানেনা। কিন্তু অন্যান্য যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে কি হচ্ছে না এবং বাপের বাড়ী ফিরতে হচ্ছে কি হচ্ছে না এসব ব্যাপারেও প্রায় একই ধরণের মনোভাবের কথা তারা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বিভিন্ন উৎসব উদ্দিপনায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদী করা এবং দাওয়াত খায়ানোর বা প্রীতিভোজের আয়োজন করা। এসব ক্ষেত্রে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের কীভাবে দেখা হয় বা মূল্যায়ন করা হয়। তা সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদীতে তাদেরকে দাওয়াত করা হয় কিনা জানতে চাইলে তারা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৯.৯ ঃ সামাজিক অনুষ্ঠানাদীতে নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে।

রোগীদের অভিমত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিমন্ত্রণ করা হয়	২৩৮	৭৯.৩
নিমন্ত্রণ করা হয় না	৫৭	১৯.০
জানিনা	৫	১.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণী দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আর্সেনিকোসিস রোগের ব্যাপারে যথেষ্ট অসচেতনতা রয়েছে। কেননা ১৯% রোগীই মতামত দিয়েছে বা তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে যে, সমাজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানাদীতে তাদেরকে দাওয়াত করা হয় না। এরূপ ঘটনা অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্গনের পর্যায়ভূক্ত। শুধু তাই নয় মানসিকভাবেও রোগীরা ছোট হয়ে যাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ।

২.৪. ধর্মীয় ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া

ধর্মীয় গোড়ামী আমাদের গ্রামীণ জনপদে উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাব বিস্তার করে আছে। বিবাহ সাধী রোগ-ব্যধি, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশিক্ষিত-কুশিক্ষীত মৌলভীরা বিভিন্ন ধরণের ফতুয়া দিয়ে থাকেন। জানা গেছে এই মরণ ব্যধি আর্সেনিকোসিস ফতুয়া বাজদের ভাষায় আল্লাহর গজব। সমাজের বিভিন্ন বন্ধন খন্ডানোর ক্ষেত্রে বা সমাজে বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনা-গঞ্চনা ও অশান্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফতুয়াবাজদের তুলনা হয় না। ধর্মীয় কুসংস্কার গোড়ামীও এর জন্য দায়ী। গবেষণায় জরিপকৃত এলাকার আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা কার্যক্ষেত্রে এরূপ ফতুয়াবাজদের সম্মূখীন হয়েছে কিনা জানতে চাইলে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৯.১০ ঃ আক্রান্ত রোগীরা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ কর্মে ফতুয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা?

আক্রান্তকারীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ফতুয়ার সম্মুখীন হন নাই	১৪৮	৪৯.৩
ফতুয়ার সম্মুখীন হয়েছেন	১৫২	৫০.৭
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

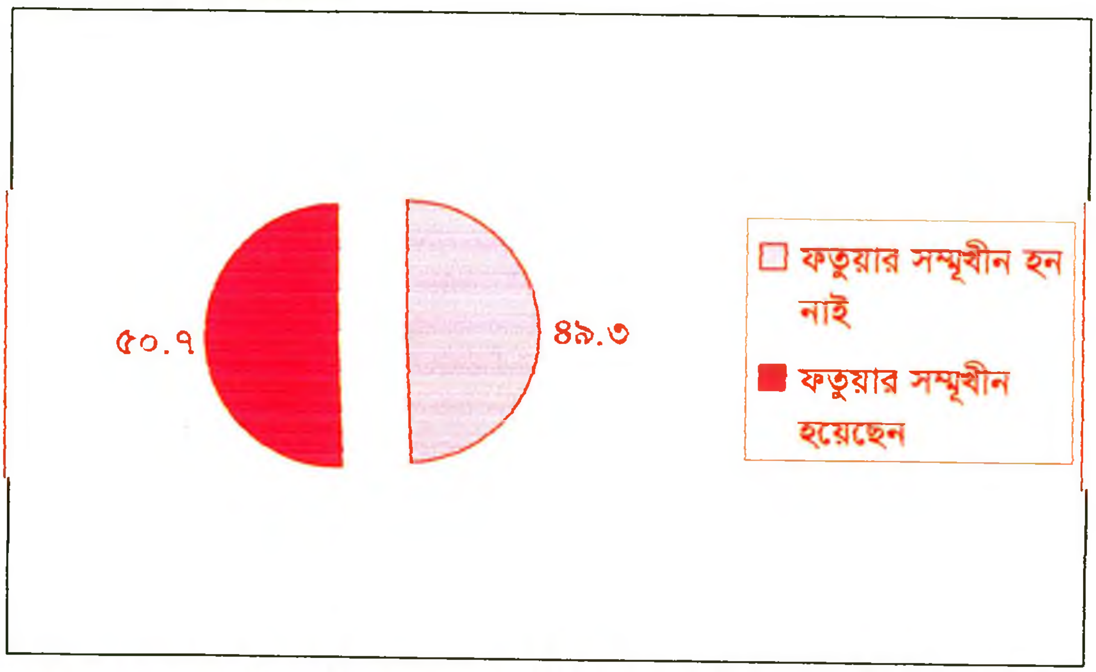

চিত্র ৯.৫ ঃ আক্রান্ত রোগীরা ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ কর্মে ফতুয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা?

সারণীতে প্রাপ্ত তথ্যে, আর্সেনিকোসিস রোগের সচেতনতা সম্পর্কে সমাজের একটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে ৫০% এরও অধিক রোগী সমাজের ফতুয়াবাজ ধর্মান্ধ লোকদের অপকর্মের শিকার। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী রোগী বিভিন্ন কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে ধর্মীয় অশিক্ষীত নেতারা সমাজকে কোথায় নিয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এ ব্যাপারে অবশ্য অবশ্যই আক্রান্তকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২.৫. আর্থিক ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিক্রিয়া

গবেষণা এলাকা শিবচরের আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বেশীর ভাগই গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এছাড়া রয়েছে কিছু ভ্যান চালক ও ছোট

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী। অর্থাৎ বেশীর ভাগ রোগীদের আয় রোজগার অনেক কম। এমতাবস্থায় আর্সেনিকোসিস রোগ চিকিৎসার পেছনে কত টাকা তারা খরচ করেছে বা আদৌ খরচ করার ইচ্ছা আছে কিনা ? বিষয়টি তাদের রোগ সচেতনতার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে। অনেকে এই রোগটিকে সাধারণ রোগ ভেবে বা গুরুত্বহীন রোগ ভেবে কোন চিকিৎসাই করান নাই। এ সম্পর্কীত একটি টেবিল নিম্নে দেওয়া হলো ।

সারণী ৯.১১ ঃ আর্সেনিকোসিস রোগের চিকিৎসায় রোগীদের মতামত

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
টাকা খরচ করেছে	৩৬	১২.০
টাকা খরচ করেন নাই	২৬৪	৮৮.০
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে লক্ষণীয় ১২% রোগী তাদের চিকিৎসার জন্য কোনরূপ টাকা পয়সা খরচ করেন নাই। অর্থাৎ তারা কোন প্রকার চিকিৎসা করান নাই। তবে অধিকাংশ রোগী তাদের রোগের

বাদ (গবেষণা এলাকা শিবচরের আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের বেশীর ভাগই গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। এছাড়া রয়েছে কিছু ভ্যান চালক ও ছোট ব্যবসায়ী। অর্থাৎ বেশীর রোগীদের আয় রোজগার অনেক কম। এমতাবস্থায় আর্সেনিকোসিস রোগ চিকিৎসার পেছনে কত টাকা তারা খরচ করেছে বা আদৌ খরচ করার ইচ্ছা আছে কিনা ? বিষয়টি তাদের রোগ সচেতনতার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে। অনেকে এই রোগটিকে সাধারণ রোগ ভেবে বা গুরুত্বহীন রোগ ভেবে কোন চিকিৎসাই করান নাই। এ সম্পর্কীত একটি টেবিল নিম্নে দেওয়া হলো ।)

ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তার চিকিৎসা করেছে এবং এর পেছনে টাকা পয়সা খরচ করেছে। তবে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে কে কতটুকু গুরুত্ব অনুধাবন করেছে সেটি ভয়াবহ বিষয়। অর্থাৎ এই রোগ চিকিৎসার জন্য কে কতটুকু আগ্রহ দেখিয়েছে; বিষয়টা আপাতত আর্থিক দিক থেকেই বিচার বিশ্লেষণ করা হোক। কেননা অর্থের ক্ষতিপূরণ দ্বারা মানুষের অনেকটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা আশা-আকাঙ্খা আগ্রহ-অনাগ্রহ ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। অপর পৃষ্ঠায় আর্সেনিকোসিসের খরচ বাবদ কে কত টাকা ব্যয় করেছে তার একটি তথ্য প্রদান করা হলো ।

সারণী ৯.১২ ঃ আর্সেনিকোসিস রোগের পেছনে রোগীদের খরচের পরিমাণ

রোগীদের খরচ (টাকা)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১০০ — ৫০০	১৫৭	৫২.৩
৫০১ — ১০০০	৫৭	১৯.০
১০০১ — ১৫০০	২৫	৮.৩
১৫০১ — ২০০০	১০	৩.৩
২০০১ — ২৫০০	৮	২.৭
২৫০০ +	৭	২.৩
প্রযোজ্য নয়	৩৬	১২.০
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

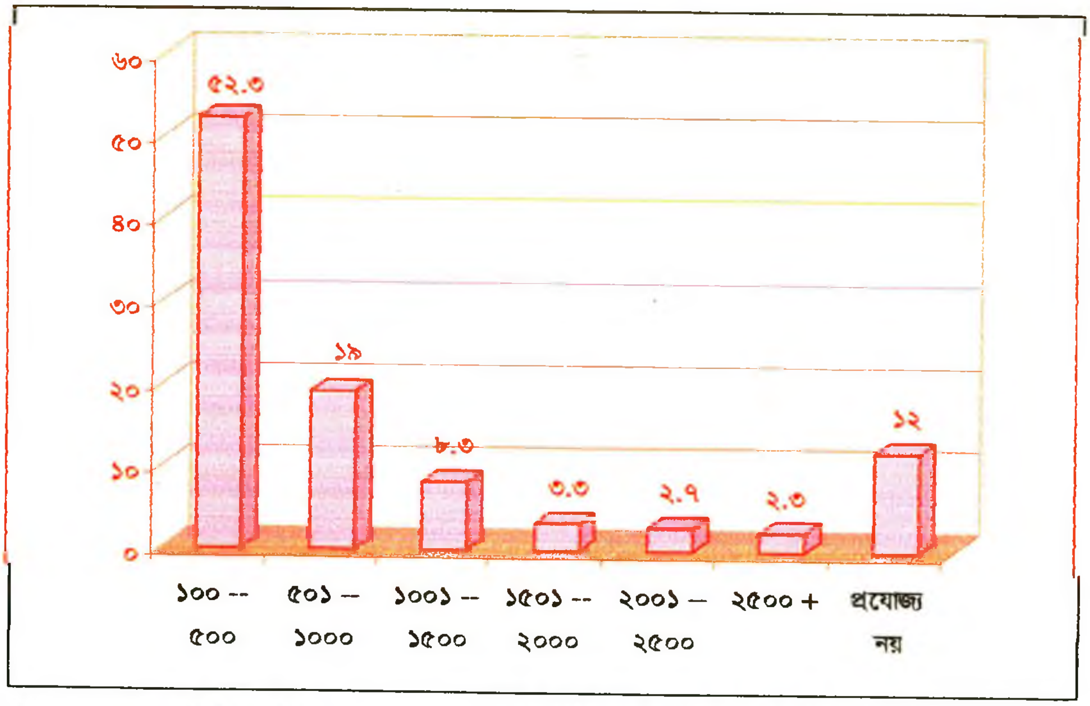

চিত্র ৯.৬ ঃ আর্সেনিকোসিস রোগের পেছনে রোগীদের খরচের পরিমাণ

উপরোক্ত সারণী হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে, যারা তাদের আর্সেনিকোসিস রোগের ভয়বাহতার গুরুত্ব দিয়েছে এবং তারাই শুধু এই রোগের চিকিৎসার জন্য খরচ করেছে। ৫২.৩% রোগী তাদের চিকিৎসার জন্য ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করেছে। ২০০১ টাকা হতে ২৫০০ বা তার অধিক। অর্থাৎ ২০০০ টাকার অধিক খরচ করেছে মোট ৫%

Dhaka University Institutional Repository

রোগী এবং অন্যান্য যেমন ৫০১ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করেছে মাত্র ১৯% রোগী। অবশ্য এটাই দ্বিতীয় সারির খরচ। ১০০১ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করেছে ৮.৩% রোগী এবং ১৫০১ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করেছে ৩.৩% রোগী এবং মোটেও খরচ করেন নাই ১২% রোগী। তথ্যে গড়, মধ্যক ও প্রচুরক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগীদের গড় খরচ ১০০০ টাকা। মধ্যমান খরচ ১২৫০ টাকা এবং সবচেয়ে বেশী রোগী খরচ করেছে ৫০০ টাকা। অর্থাৎ মোটের উপর ২১% রোগীই খরচ করেছে ৫০০ টাকা করে। অবশ্য টাকা-পয়সা খরচ করার সাথে আয় রোজগারের ব্যাপারটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। দেখা গেছে বেশীর ভাগ রোগীদের আয় ৫০০০ টাকার মত এবং তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জনের মত। এদের ভরণ পোষণ লেখাপড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচ করার পর তেমন কিছু বাকী থাকে না। বিধায় অনেক রোগীর চিকিৎসার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারণে চিকিৎসা করতে পারে না। আবার অনেকেই সাধ্য ও সামর্থমত আর্সেনিকোসিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে টাকা খরচ করেছে। কিন্তু তেমন কোন ফল হয় নাই।

২.৬. ব্যক্তিগত ও মানসিক প্রতিক্রিয়া

সামাজিক ক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হলো আক্রান্ত রোগীদের মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ এই রোগ ধরা পরার পর তারা ব্যক্তিগতভাবে অথবা মানসিকভাবে কেমন আছে তা জানা আমাদের একান্ত আবশ্যক। এ সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো তারা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৯.১৩ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে বাইরে বেরুতে রোগীদের মতামত

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বাইরে বেরুতে দ্বিধাবোধ করিনা	১৫১	৫০.৩
বাইরে যেতে দ্বিধাবোধ করি	১৪৯	৪৯.৭
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

টেবিলে লক্ষ্যণীয় যে প্রায় অর্ধেক রোগীই বাইরে যেতে বা আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি যেতে অথবা হাট-বাজারে যেতে নিজেরা সংশয় বোধ করে। অর্থাৎ মানসিকভাবে এ সমস্ত রোগীরা সর্বদাই বিভিন্ন দ্বিধাদন্দ্বে ভুগে। কেননা এই রোগকে আল্লার বা সৃষ্টিকর্তার দেওয়া গজব বলেও আখ্যায়িত করে। এসব কারণেই হয়ত রোগীরা মনে করেন বাইরে বেরুলেই সমস্যা। তাই তারা মানসিক কষ্ট নিয়ে এ ধরণের সমস্যা হতে দুরে থাকেন। আর বাকী ৫০% রোগী যারা বলেছে

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে বেরুতে আমরা কোন দ্বিধাবোধ করি না। তারা এক দিকে ভালই আছেন। এরূপ অপর একটি প্রশ্ন ছিল আক্রান্ত রোগীদের উপর তাহলো; নিজেকে সব সময় অন্যান্যদের হতে আলাদা করে রাখেন কিনা ? এ সংক্রান্ত একটি তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো।

সারণী ৯.১৪ ঃ নিজেকে আলাদা করে রাখার ক্ষেত্রে রোগীদের মতামত

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ নিজেকে একটু আলাদা করে রাখি	১৫৮	৫২.৭
না নিজেকে আলাদা করে রাখি না	১৪২	৪৭.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

এখানে দেখা যাচ্ছে, ৫২.৭% রোগীই এই রোগ হওয়ার কারণে নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখতে ভালবাসে। এখানে আলাদা করে রাখা বলতে বোঝানো হয়েছে পরিবার সহ অন্যান্য লোকদের হতে নিজেকে একটু আলাদা বা নিরাপদে রাখা। কেননা অনেকের মধ্যে এ ধারণাও আছে যে আর্সেনিকোসিস একটি ছোঁয়াচে রোগ। কাজেই এই রোগ যাতে অন্যান্যদের না হয় সে জন্যও অনেকে বা অনেক রোগী নিজেদেরকে অন্যান্যদের হতে একটু আলাদা করে রাখে বা রাখতে চায়। অবশ্য সারণীতে ৪৭.৩% রোগী বলেছে তারা রোগকে একটি সাধারণ রোগ মনে করে। তাই বলে এই রোগের কারণে নিজেকে আলাদা করে রাখার মত কিছু নেই।

রোগীদের মানসিক অবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাদের একাকিত্ব। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস হওয়ার ফলে রোগীদের একাকিত্ব লাগে কিনা ? কেননা একাকিত্বের জন্য মানুষের আরো অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে একাকিত্ব ও একটি রোগ। এ সম্পর্কে রোগীদের মতামত হলো।

সারণী ৯.১৫ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে রোগীদের একাকিত্বের মতামত

রোগদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
একাকিত্ব	১৬৭	৫৫.৭
একাকিত্ব লাগে না	১৩৩	৪৪.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৫৫.৭% রোগীদেরই এই রোগের কারণে একাকিত্ব লাগে, নিজেকে অসহায় মনে হয়, আর এই একাকিত্ব বা অসহায়ত্বের জন্য অনেক সময় মানুষের (Depression) বিষাদগ্রস্ত রোগের সৃষ্টিহয়।

নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি সারণী দেয়া হলো।

সারণী ৯.১৬ ঃ রোগীদের বিষাদগ্রস্ততা সংক্রান্ত মতামত

মতামত (সময়)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সর্ব সময়	৭২	২৪.০
মাঝে মাঝে	১৩১	৪৩.৭
বিষাদময় লাগে না	৯৭	৩২.৩
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

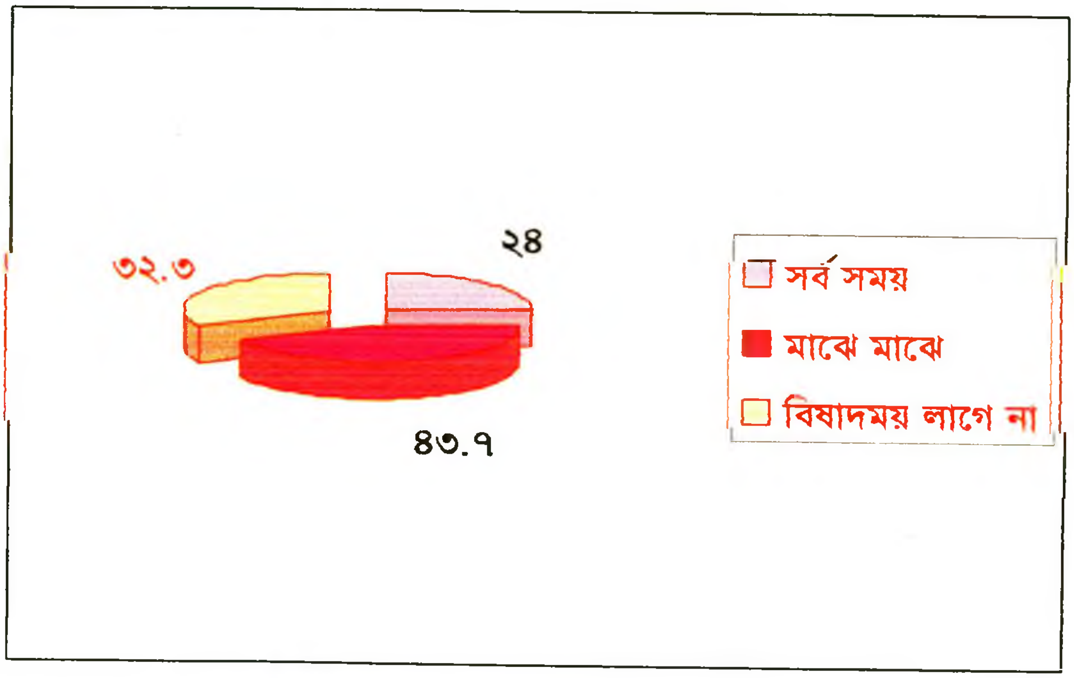

চিত্র ৯.৭ ঃ রোগীদের বিষাদগ্রস্ততা সংক্রান্ত মতামত

সারণীতে লক্ষণীয় ২৪% রোগী রয়েছে যাদের প্রায় সব সময়ই যন্ত্রণা দায়ক বিষাদতা লাগে। মাঝে মাঝে এরূপ যন্ত্রণার শিকার হয় বা হচ্ছে ৪৩.৭% রোগী। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগ মানুষকে বড় ধরনের মানসিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। মাত্র ৩২.৩% রোগীরা বলেছে তাদের এরূপ বিষাদময় যন্ত্রণা দেখা দেয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

এই রোগের কারণে নিজেদের বা রোগীদের মন কতটুকু স্বতস্ফুর্ত বা মনে কত টুকু ফুর্তি বা আনন্দ আছে তা জানার জন্য প্রশ্ন করলে রোগীরা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

সারণী ৯.১৭ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে রোগীদের স্বতঃস্ফূর্ততা পরিমাণ

স্বতঃস্ফূর্ততা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ভাল	১৬৪	৫৪.৭
খুব ভাল	৩৬	১২.০
খারাপ	১০৬	৩৫.৩
খুব খারাপ	২২	৭.৩
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

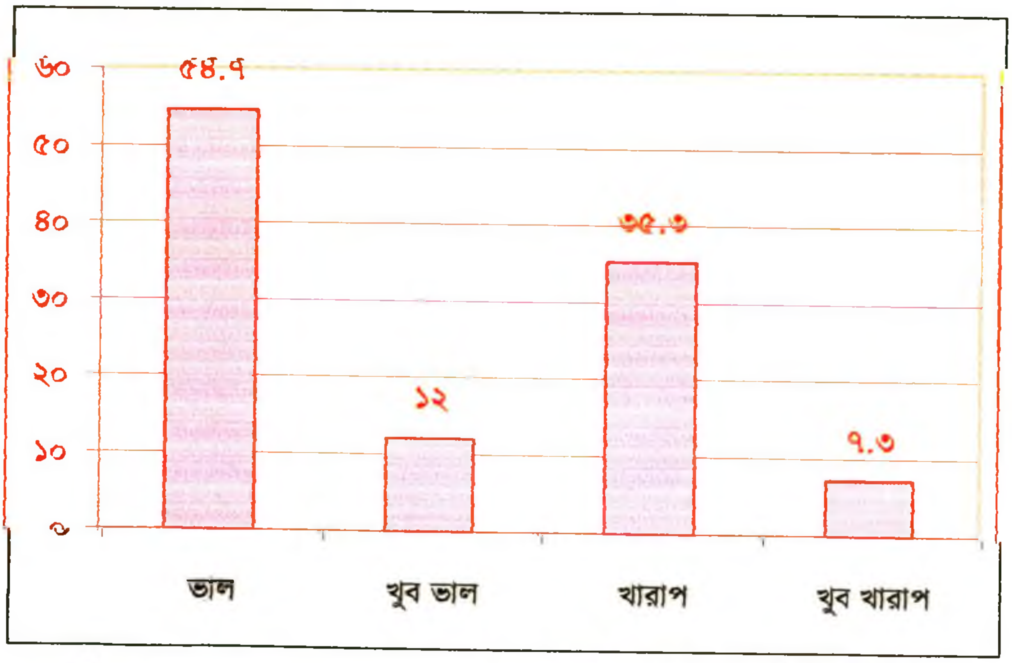

চিত্র ৯.৮ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে রোগীদের স্বতঃস্ফূর্ততা পরিমাণ

সারণীতে ভালর সংখ্যাই বেশী। কিছু খারাপ ও খুব খারাপের সংখ্যাও রয়েছে। ৭.৩% রোগী বলেছে তাদের কোন স্বতঃস্ফূর্ততা নেই বললেই চলে। আর ৩৫.৩% রোগী বলেছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততার পরিমাণ খুবই কম বা খারাপ। অর্থাৎ তাদের মানসিক অবস্থাভাল নেই।

আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের হৃদয়ঘটিত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো; পরিবারের সদস্যকর্তৃক মনে আঘাত পাওয়ার বিষয়টা, এবং সেটি কাদের দ্বারা ? বিষয়টি জানার জন্য প্রশ্ন করলে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৯.১৮ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে রোগীদের হৃদয়ে আঘাত

রোগীদের আঘাত প্রদানকারী	গণসংখ্যা	শতকরা হার
স্বামী বা স্ত্রী	৬৮	২২.৭
ছেলে মেয়ে	২৬	৮.৬
প্রতিবেশী	৯৪	৩১.৩
আত্মীয়-স্বজন	৭৪	২৪.৭
আঘাত পান নাই	৩৮	১২.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫ ।

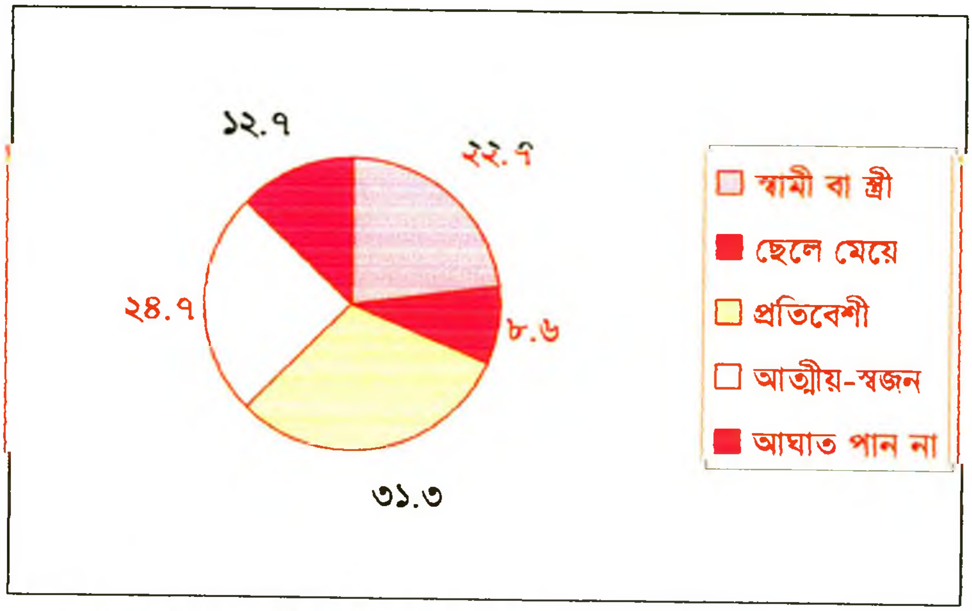

চিত্র ৯.৯ ঃ আর্সেনিকোসিস এর কারণে রোগীদের হৃদয়ে আঘাত

এই সারণীটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কেননা যে কারণেই হোক পরিবার, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন দ্বারা মনে আঘাত পেলে সেটা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। রোগীদের মধ্যে ২২.৭% বলেছে স্বামী তাদের স্ত্রীর দ্বারা এবং স্ত্রী তাদের স্বামীর দ্বারা পরস্পর আঘাত পেয়েছে। এরূপ ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার দ্বারা মনে আঘাত বা কষ্ট পেয়েছে ৮.৬% রোগীরা। তবে সবচেয়ে বেশী আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে প্রতিবেশীদের দ্বারা। প্রায় ৩১% রোগী আর্সেনিকোসিস রোগের জন্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। অনুরূপ আত্মীয় স্বজন দ্বারা প্রায় ২৩.৭% রোগীরা মনে আঘাত পেয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন যারাই হোক না কেন ?

মূলত তাদের রোগের কারণেই আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে। এবার জানা যাক, আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের প্রতি উক্ত রোকদের সচরাচর ব্যবহার কেমন ছিল ?

সারণী ৯.১৯ ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের প্রতি অন্যান্যকার ব্যবহার

রোগীদের প্রতি ব্যবহার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ভাল ব্যবহার	১৫২	৫০.৭
মোটামুটি ভাল ব্যবহার	১১৪	৩৮.০
মোটেও ভাল ব্যবহার নয়	১৮	৬.০
উত্তর দেয় নাই	১৬	৫.৩
মোট	৩০০	১০০.০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

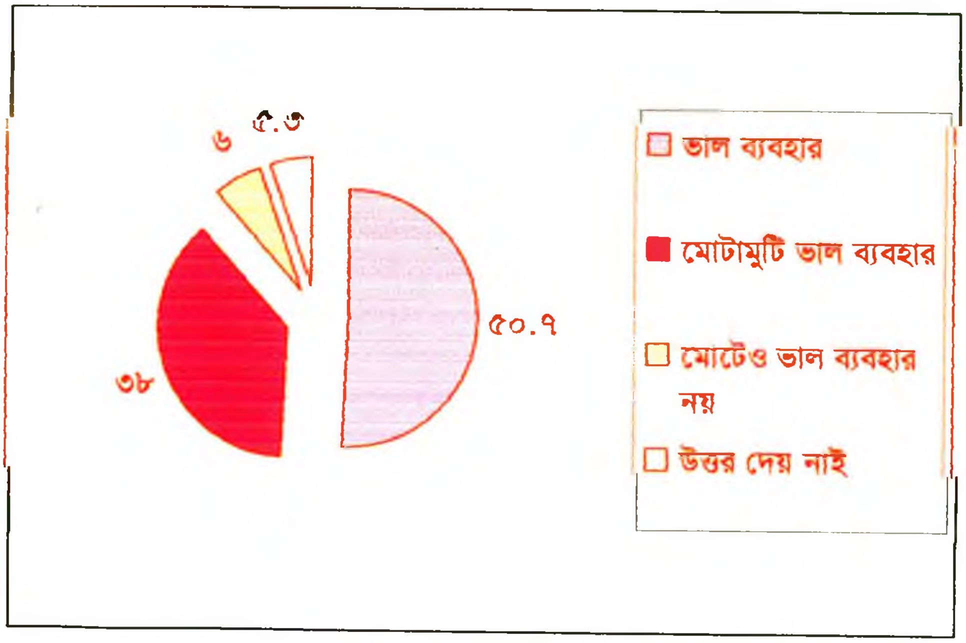

চিত্র ৯.১০ ঃ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের প্রতি অন্যান্যকার ব্যবহার

সারণীতে লক্ষণীয়, পরিবার, পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের ব্যবহারের মাধ্যমে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীরা আঘাত পেত, সে সব আঘাতের তীব্রতাই কিন্তু রোগীদের মানসিক বিষাদগ্রস্থ, মানসিক কষ্ট ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ এবং এর ঠিক উল্টো দিকটা হলো রোগীদের প্রতি ভাল বাসার বহিঃপ্রকাশ। সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৫০.৭% রোগীদের প্রতি সবাই ভাল ব্যবহার করে। মোটামুটি ভাল ব্যবহার করে ৩৮% রোগীদের প্রতি এবং মোটেও ভাল

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করে না ৬% রোগীদের প্রতি। এক্ষেত্রে উত্তর দানে বিরত ছিল ৫.৫% রোগী। অর্থাৎ এই অজানা ব্যবহারটি খুব ভাল আবার খুবই খারাপ ব্যবহার হতে পারে।

এরপর আসা যাক ব্যক্তিত্বের বিষয়ে। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস হওয়ার কারণে আক্রান্ত রোগীদের ব্যক্তিত্বের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয় জানা একান্ত প্রয়োজন। এই রোগের কারণে রোগীদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হচ্ছে কিনা ? সে সংক্রান্ত মতামতের ভিত্তিতে একটি টেবিল নিম্নে দেওয়া হলো।

সারণী ৯.২০ ঃ আর্সেনিকোসিস-এর কারণে রোগীদের ব্যক্তিত্বের আঘাত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ব্যক্তিত্ব নষ্ট হচ্ছে	১৫৫	৫১.৭
ব্যক্তিত্ব নষ্ট হচ্ছে না	১৪৫	৪৯.৩
মোট	৩০০	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

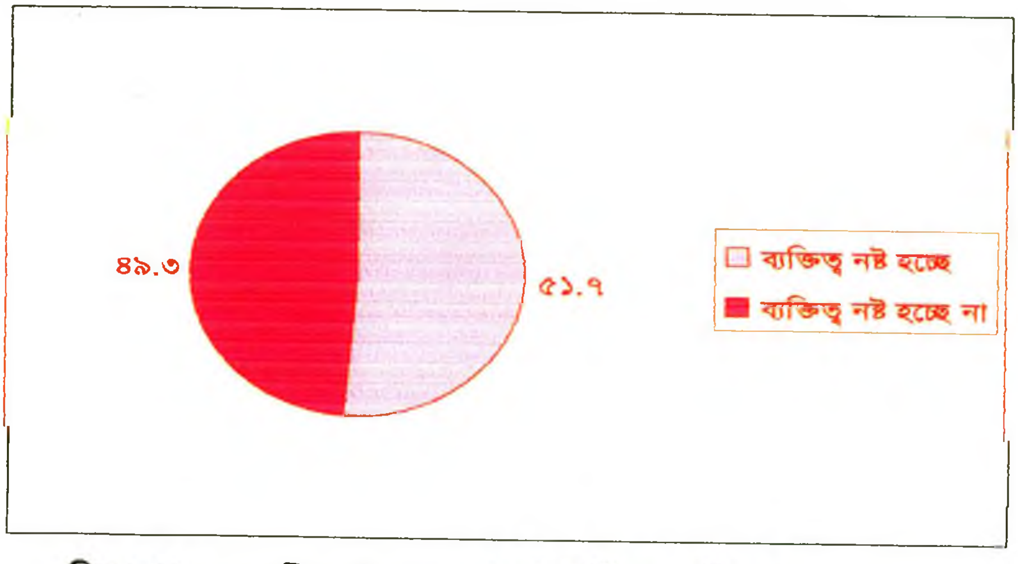

চিত্র ৯.১১ ঃ আর্সেনিকোসিস-এর কারণে রোগীদের ব্যক্তিত্বের আঘাত

ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের ব্যাপারে প্রায় অর্ধেক অর্ধেক উত্তর এসেছে মোট রোগীদের নিকট হতে। অর্থাৎ ৫১.৭% রোগীরা বলেছে এই রোগের কারণে তাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হচ্ছে এবং ৪৯.৩% রোগীর আর্সেনিকোসিস ব্যক্তিত্বের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি।

এবার রোগীদের সচেতনতার দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। অনেক দিন পূর্ব হতেই বিভিন্ন, নাটক, ছোট পর্দার সিনেমা সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা আমরা জেনে এসেছি আর্সেনিকোসিস রোগের কথা এবং এর ভয়াবহতার কথা। আবার এমন কথাও জেনেছি অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ, অসচেতন লোক এই রোগটিকে আলস্নাহ প্রদত্ত গজব বলে আখ্যায়িত করে। এবার দেখা যাক আমার আলোচ্য রোগীরা কি বলে।

সারণী ৯.২১ ঃ আর্সেনিকোসিস আল্লাহ প্রদত্ত গজব রোগীদের মতামত সংক্রান্ত

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
এটি আল্লাহ প্রদত্ত গজব	৭৬	২৫.৩
এটি আল্লাহ প্রদত্ত গজব নয়	১৮৬	৬২.০
উত্তর দানে বিরত	৩৮	১২.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

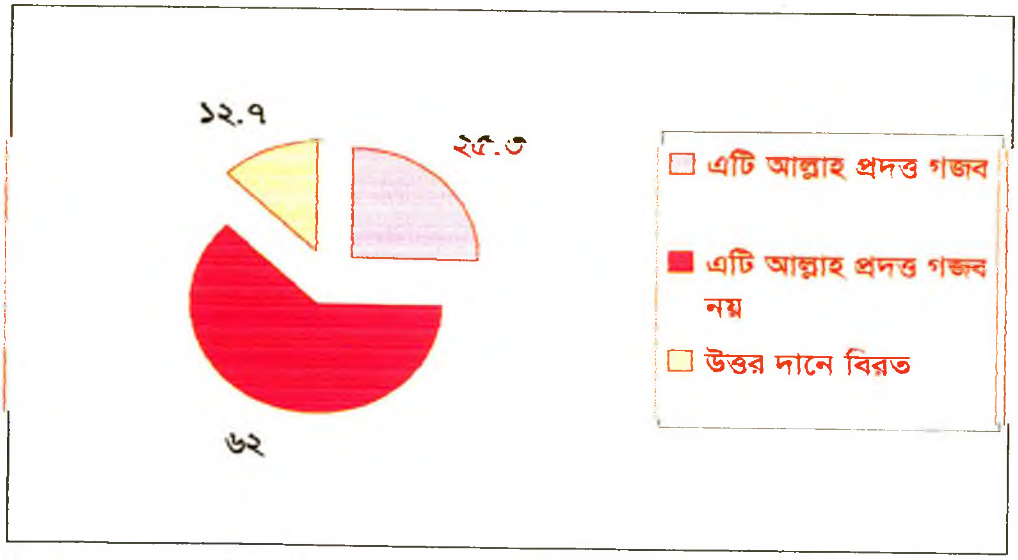

চিত্র ৯.১২ ঃ আর্সেনিকোসিস আল্লাহ প্রদত্ত গজব রোগীদের মতামত সংক্রান্ত

সারণীতে যে মতামত আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার আলোচ্য রোগীদের মধ্যে এ ব্যাপারে ভাল সচেতনতা রয়েছে। কেননা ৬২.০% রোগীর মতামত আর্সেনিকোসিস আল্লাহর গজব নয়। অপর পক্ষে উত্তর দানে বিতর রয়েছে ১২% রোগী। এটি আল্লাহর গজব। এমন কথাও বলেছে বেশ কিছু রোগী। অর্থাৎ ২৫.৩% রোগীর মতামত আর্সেনিকোসিস রোগ আল্লাহ প্রদত্ত গজব।

এবার দেখা যাক আর্সেনিকোসিস কে রোগীরা একটি সাধারণ রোগ হিসেবে দেখে নাকি ভাইরাস জনিত ছোঁয়াচে রোগ হিসেবে দেখে। যার কারণে রোগীরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে বা একে অপর হতে দুরে সরে থাকে। নিম্নে আর্সেনিকোসিস কোন ধরণের রোগ সে বিষয়ের রোগীদের মতামত সম্বলিত একটি সারণী উল্লেখ করা হলো

সারণী ৯.২২ ঃ আর্সেনিকোসিস রোগের ধরণ সম্পর্কে রোগীদের মতামত

রোগীদের মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
আর্সেনিকোসিস একটি ছোঁয়াচে রোগ	৪৯	১৬.৩
আর্সেনিকোসিস ছোয়াচে রোগ নয়	২৫১	৮৭.৭
মোট	**৩০০**	**১০০.০০**

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে জরিপ, ২০০৫।

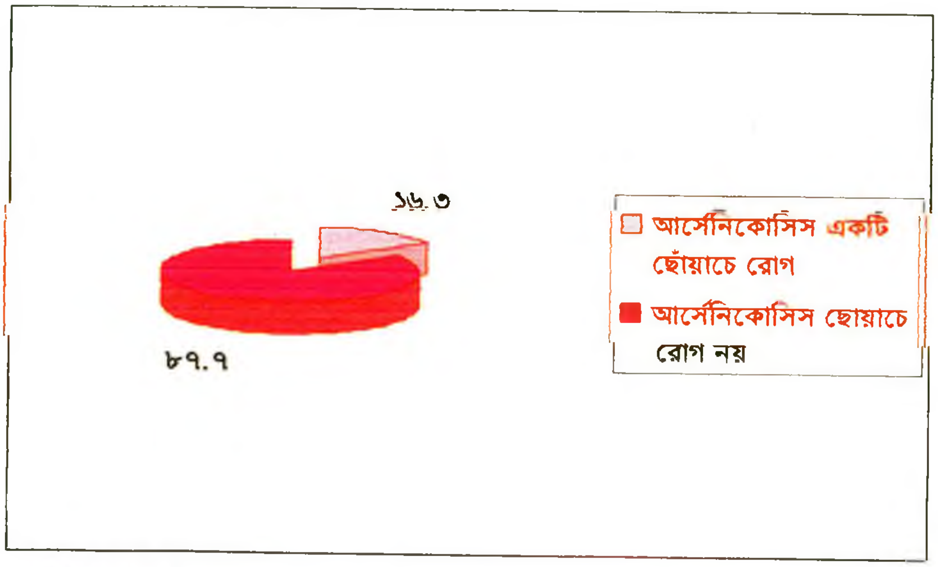

চিত্র ৯.১৩ ঃ আর্সেনিকোসিস রোগের ধরণ সম্পর্কে রোগীদের মতামত

সারণীতে লক্ষ্যণীয় বেশীর ভাগ রোগীই আর্সেনিকোসিসকে একটি ছোঁয়াছে রোগ মনে করে না। ৮৭.৭% রোগীর মতামত হলো আর্সেনিকোসিস একটি সাধারণ রোগ এই রোগ একজনের হলে অপর জনেরও হবে এমনটি নয়। তবে আক্ষেপের বিষয়, আমার আলোচিত ৩০০ জন রোগীর মধ্যে ৪৯ জন রোগী বলেছে আর্সেনিকোসিস একটি ছোঁয়াছে রোগ, অর্থাৎ ১৬.৩% রোগী এখনও দারুণভাবে অসচেতন, আর এই অসচেতনতার কারণে এই রোগ হতে আরোগ্য লাভেরও কোন সুযোগ গ্রহণ করে না বা সুযোগ পায় না। সর্বপরি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক অবস্থা খুবই বেহাল। জানিনা এ অবস্থার ফাঁদ হতে আমরা কবে বের হয়ে আসতে পারবো।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১০

দশম অধ্যায়

১.আর্সের্নিকোসিস রোগীদের সামাজিক, মানসিক ও ভূ-পরিবেশিক সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য পতিকার

গবেষণা এলাকার আর্সেনিক সমস্যা দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এখানকার অধিকাংশ নলকূপেই রয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীও পাওয়া গেছে অনেক। রোগীদের এই পরিসংখ্যান দিন দিন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্র এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে রয়েছে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি যা এলাকার জনগণ গণহারে পান করাসহ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় আক্রান্তকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই গরীব তাই তারা ভালভাবে পুষ্ঠিকর খাদ্য খেতে পায় না। এমতাবস্থায় মানুষের জীবন সত্যিই হুমকির সম্মুখিন। শুধু শিবচরের একটি জনপদে নয় সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামীণ জনপদে আর্সেনিকের আতংক ছড়িয়ে পরেছে। বর্তমান বাংলাদেশের জন্য এটাকে আর্সেনিক দূর্ষণ মহাদূর্যোগ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এই মহা দুর্যোগের মোকাবেলা করা কারো একার পক্ষে বা শুধু সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই শুধু সরকার ও বিদেশী সাহায্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং মহাপ্রলয় প্রতিরোধ করার জন্য। আর্সেনিক দুষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। কেননা আর্সেনিকাসিস রোগের কারণে সমাজেও সৃষ্টি হচ্ছে নানা রকম সমস্যা। যে সমস্যা খুবই হৃদয়বিদারক ও মানসিক যন্ত্রণাদায়ক। সমাজের ও মানুষের এ সমস্যা দুর করতে হলে প্রথমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে অতপর সেই অনুসারে আশু-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. গবেষণায় উদঘাটিত বিষয় সমূহ

আর্সেনিকোসিসের সামাজিক, মানসিক ও ভূ পরিবেশিক প্রতিক্রিয়া বিশাল ও ব্যাপক। একদিকে মানুষ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হলে তা খুব বেদনাদায়ক অপর দিকে এর পরিণতি এক পর্যায়ে মৃত্যুর কারণ ও হতে পারে। অন্যদিকে রোগীরা জীবিত আক্রান্তবস্থায় প্রতিবেশী ও সমাজ কর্তৃক বয়কট বা আরও বয়কট হতে পারে। ফলে আর্সেনিকোসিস রোগীরা আর্সেনিক দোষে দুষ্ঠ হয়ে তাদের বাড়ী ও সামাজিক মর্যাদা দুই-ই হারাচ্ছে। মানসিক ভাবেও তারা ভাল নেই

Dhaka University Institutional Repository

বিষণ্ণতা তাদের চোখে, মুখে, সমস্ত অঙ্গে। এটি মারাত্মক একটি সামাজিক বিপর্যয় ও মানষিক যন্ত্রণা। বর্তমান এই সমস্যার সমাধান খোঁজা হচ্ছে। তার নিমিত্তেই আমার এই গবেষণা । আর গবেষনায় প্রাপ্ত সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো অতি সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

❖ গবেষণা এলাকা শিবচর একটি কৃষি প্রধান এলাকা। এখানকার কৃষি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যাপক হারে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হয়। অর্থাৎ পারিবারিক নলকূপ ও কৃষি ক্ষেত্রে সেলো নলকূপের গণ ব্যবহারের ফলে, আর্সেনিক দূষণ, কৃষি, কৃষক ও গোটা কৃষি সমাজের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

❖ গবেষণা এলাকায় অধিকাংশ টিউবয়েল আর্সেনিক দুষণের কারণে সীল করা হয়েছে। কিন্তু নিরাপদ খাবার পানির কোন বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবার তথা রোগীরা বাধ্য হয়ে সেই ঝুকি পূর্ণ আর্সেনিক দুষিত পানি অবলিলায় পান করে যাচ্ছে। এতে আর্সেনিকোসিস সমস্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❖ গবেষণা এলাকার গ্রামীণ জনপদে আর্থিক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নতুন করে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করছে না। ফলে তারা এখনও পান করা সহ গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে আর্সেনিক দুষিত পানি ব্যবহার করছে।

❖ বেশীরভাগ আর্সেনিকোসিস রোগীরা তাদের আর্সেনিক আক্রান্তের কথা জানতে পেরেছে মাত্র ২ বছর আগে। অর্থা ২০০২ সালের পূর্বে রোগীরা আর্সেনিকোসিসের নাম শোনেনি। ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতালের ইনভেসটিগেশন দলের কর্মিরা তাদের আর্সেনিকোসিস সণাক্ত করেছে।

❖ গবেষণা এলাকায় মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশী আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

❖ গবেষণা এলাকার সাধারণ মানুষ তথা আক্রান্ত রোগীদের খাবার পানির প্রধান উৎস নলকূপ। আর অধিকাংশ নলকূপের পানিতে মিশে আছে অতিরিক্ত মাত্রায় অদৃশ্য বিষ আর্সেনিক।

Dhaka University Institutional Repository

❖ নলকূপে আর্সেনিক দুষণের মাত্রা (গবেষণা এলাকার) নদীর কাছাকাছি অপেক্ষা দুববর্তী এলাকাগুলো বেশী।

❖ গবেষণা এলাকায় ৫০ বছর বয়সী লোকেরাই বেশী এই মরণ ব্যধি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

❖ আর্সেনিকোসিস সণাক্তকৃত রোগীদের মধ্যে, হাত-পায়ের তালু শক্ত, খসখসে ও পুরু হয়ে যাওয়া চামড়া। এমন রোগীর রোগীর সংখ্যা বেশী। অথ্যাৎ কেরাটোসিস রোগীর সংখ্যা বেশী।

❖ আর্সেনিকোসিসের তীব্রতার দিক থেকে বেশীর ভাগ রোগীই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তীব্রতার মধ্যে অবস্থান করছে।

❖ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা বেশীর ভাগই পরিবার প্রধান ।

❖ ৫ থেকে ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারেই আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশী।

❖ কৃষি ও ভ্যান চালক পেশার সাথে জড়িত স্বল্প আয়ের লোকেরাই বেশী আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

❖ গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক লক্ষণীয় তাহলো সমাজের অশিক্ষীত লোকরাই বেশী আর্সোনিকোসিসে আক্রান্ত ।

❖ গবেষণা এলাকার বিবাহিত লোকেরাই বেশী আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত।

❖ গবেষণা এলাকার অধিকাংশ আর্সেনিকোসিস রোগী এই রোগকে অধিক ঝুকিপূর্ণ রোগ মনে করে না।

❖ তবেএকটা সচেতনতার বিষয় হলো গবেষণা এলাকার অধিকাংশ রোগীই। তার এই রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ অধিকাংশ রোগীই তাদের আর্সেনিকোসিস হওয়ার পেছনে ভূগর্ভস্থ আর্সেনিক দূষিত পানির কথা বলেছে।

❖ গবেষণা এলাকার বেশীর আর্সেনিকোসিস রোগী তাদের খাদ্যভাস সম্পর্কে সচেতন নয়। অর্থাৎ তারা বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান সর্ম্পকে কিছুই জানে না।

❖ রোগ সণাক্তের পর অনেকেই খাদ্যাভাসের কিছু পরিবর্তন করেছে। ডাক্তারদের পরামর্শ অনুসারে অনেকেই আর্সেনিক দুষিত পানি পান করছে না, শাক সবজি খাওয়া একটু বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকে পূর্বের তুলনায় বর্তমান পানিও একটু বেশী পান করছে।

❖ শাকের মধ্যে বেশীর ভাগ রোগী পুঁই ও ডাটা শাক বেশী খাচ্ছে।

❖ অনেক রোগী পূর্বের তুলনায় প্রতিদিন পানি বেশী পান করছে।

❖ আক্রান্তকারী রোগীরা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে পুরুষ ও স্ত্রীরা যথাক্রমে ২৪৮০-২৬২০ কিলো ক্যালোরী ও ১৮০০-১৯০০ কিলো ক্যালোরী গ্রহণ করার কথা থাকলেও আক্রান্তকারী গ্রহণ করছে মাত্র ১৫০০ থেকে ১৫৫০ কিলো ক্যালোরী।

❖ অধিকাং রোগীদের বাড়ীঘর অস্বাস্থ্যকর।

❖ অধিকাংশ আর্সেনিকোসিস রোগীদের ব্যবহৃত নলকূপের গভীরতা ৪০ ফুট। অর্থাৎ এই স্তরে আর্সেনিকের মাত্রা সবচেয়ে বেশি।

❖ বেশীর ভাগ রোগীদের আর্সেনিক যুক্ত পানি পানের স্থিতিকাল ১১ থেকে ২০ বছর।

❖ নিজেদের নলকূপে আর্সেনিক আছে এবং নিজেও একজন আর্সেনিকোসিস রোগী। এতদ্বাসত্ত্বেও একন আক্রান্ত নলকূপের পানি পান করে যাচ্ছে অবলিলায়। এক্ষেত্রে প্রধান কারণ হলো। অর্থাভাবে নতুন আর্সেনিক যুক্ত গভীর নলকূপ দেয়ার সামর্থ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

❖ আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা কম এবং সেনিটেশন ব্যবস্থাও অস্বাস্থ্যকর।

❖ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের সবচেয়ে বড় সামাজিক সমস্যা হলো তাদের কেউ কাজ করতে নিতে চায় না এবং কাজ করতেও তাদের বেশ অসুবিধা হয়।

❖ আর্সেনিকোসিসের কারণে সমাজে বিবাহ কার্যকমে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। বর পক্ষ অধিক যৌতুকের দাবী করছে মেয়ে পক্ষের কাছে। অনেককে বিবাহোত্তর বাপের বাড়ী ফিরতে হচ্ছে।

❖ আর্সেনিকোসিসের কারণে আক্রান্ত রোগীকে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদীতে দাওয়াত করা হচ্ছে না। ফলে তারা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় ভোগে।

❖ গ্রামীণ জনপদের আনেক আর্সেনিকোসি রোগী ফতুয়াবাজদের সম্মুখিন হচ্ছে।

❖ অনেক রোগী আর্সেনিকোসিসের কারণে বাইরে বের হতে, অন্যান্যদের সাথে মিশতে দিধাবোধ করছে এবং ব্যক্তিত্বও নষ্ট হচ্ছে।

❖ অনেক রোগীর সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এমনকি নিজের বউ পর্যন্ত ভাল ব্যবহার করছে না। ফলে সে মানসিক দিক থেকে আঘাত পাপ্ত হচ্ছে।

❖ অত্র এলাকায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হলো বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহ সমস্যা। আর্সেনিকোসিসের কারণে সমাজে পৃথকীকরণ, বৈসাদৃশ্যতা না থাকলে উক্ত সমস্যাগুলো রয়ে গেছে।

❖ গবেষণা এলাকার অনেক রোগী ও পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে এই ধারণা রয়ে গেছে যে, আর্সেনিকোসিস ও কুষ্ঠ রোগের মত একটি ছোয়াচে রোগ। অথবা এটি রোগীদের কর্মফল বা আল্লাহ প্রদত্ত গজব।

❖ বাংলাদেশে আর্সেনিকোসি আক্রান্ত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে। স্বাস্থ্যবান মানুষের চেয়ে অপুষ্ঠির শিকার রুগ্ন মানুষকে দ্রুত আর্সেনিকের বিষক্রিয়া আক্রান্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেস করে গ্রামাঞ্চলের কৃষক, শ্রমজীবি, ভূমিহীন, জেলে পরিবারের মানুষ এ বিষক্রিয়ায় বেশী আক্রান্ত। গবেষণা এলাকা ও তার ব্যতিক্রম নয়। জরিপকৃত তথ্যে দেখা যায় বেশীর ভাগ রোগীদের বাড়িই গ্রামে এবং তাদের প্রধান পেশা কৃষি। এছাড়া রয়েছে ভ্যান চালক, দিন মুজুর, তথা গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ। এরা অধিকাংশই অর্থাভাবে ভালভাবে পুষ্ঠিকর খাদ্য খেতে পায় না।

❖ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত মানুষের জীবনে নেমে আসছে ঘোর অন্ধকার। এদেরকে সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলা হচ্ছে। আক্রান্ত মেয়েদের কেউ বিয়ে করতে চাচ্ছে না, কাজে কর্মে নিতেও নারাজ হচ্ছে অনেকে। আবার কাজ কর্ম করতেও তারা স্বাচ্ছন্ন পাচ্ছে না। বিশেষ করে মেয়েদের দুর্বলতাটা বেশী কার্যকরী হচ্ছে। শরীর নির্জীব হয়ে আসার কারণে মেয়েদের সন্তান ধারণ, সন্তান পালন স্বামীর চাহিদা অথবা তার প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি হারিয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থালির কাজকর্ম ও ঠিকমত হচ্ছে না বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তারা পদে পদে। ২০ থেকে ৫০ বছরের কর্মক্ষম মানুষগুলো আর্সেনিকোসিসের কারণে হারিয়ে ফেলেছে তাদের কর্মশক্তি। আক্রান্ত কদর্য পরিবর্তিত কুৎসিৎ চেহারার স্ত্রীকে ফেলে অনেক পুরুষ নতুন বিয়ে করার ঘটনাও ঘটেছে গ্রাম বাংলায়। তাই আর্সেনিকের ছোবলে মানুষ দিশেহারা।

❖ আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যারা মোটামুটি সচেতন তারা অনেকেই বলেছেন, "এই রোগ ১৯৯৫ সালের দিকে আমার শরীরে দেখা যায়। কিন্তু তখন আমরা আমাদের শরীরের দাগ, হাত ও পায়ের সাদা কালচে ফোসকা পরে ঘা হওয়াকে কুষ্ঠ রোগ হিসেবে দারণা করেছিলাম। তাই তখন এই রোগের প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এছাড়া এরোগে চিকিৎসা বা রোগ প্রতিরোধের পরামর্শ তখন কেউ দিত না বা জানতো না।" ফলে বর্তমান আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

❖ যেহেতু মানুষের খাদ্যাভাস, মদ্যপান ও ধুমপানের উপর আর্সেনিক বিষক্রিয়া প্রভাবিত হয় । সেহেতু উক্ত বিষয়গুলোর অবশ্যই যথাযথ ব্যবহার আবশ্যক।

❖ আর্সেনিকোসিসের মেলানোসিস ও ক্যারাটোসিস পর্যায়ে শরীরের বা হাতে পায়ের চামড়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। ফলে আক্রান্ত রোগী চেহারা কদাকাররূপে পরিণত হয়। ফলে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নির্মম ও করুণ বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। এই অবস্থায় ছেলে মেয়েদের বিয়ে করানো দায় হয়ে পরে। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙ্গে ও যায়। শুধু তাই নয় আসেনির্কোসিসে আক্রান্ত পুরুষ হাট-বাজারে যেতে দ্বিধা বোধ করে। কেননা তার হাত পায়ের অবস্থা দেখে বা আর্সেনিকোসিসের কথা শুনে তাকে কোন চায়ের দোকান বা হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বন্ধু-বান্ধবরাও গল্পগুজব করতে নারাজ থাকে।

❖ গবেষণায় আরো উল্লেখ্য যে, অজ্ঞানতাবশত আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত চর্ম রোগীকে কুষ্ঠ বা অন্য কোন ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত রোগী ভেবে ভুল তাদেরকেদুরে রাখা হচ্ছে ফলে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজে স্বাভাবিকভাবে স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে না। অক্রান্ত স্কুল, কলেজ পড়ুয়াদের ও স্কুল কলেজে যাওয়া বারণ করা হচ্ছে। আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না। বরং বাধা দেওয় হচ্ছে। শুধু তাই নয় যে পানি না হলে জীবন বাঁচে না; পানি দিয়ে সাহায্য করলে নেকি বা সওয়াব পাওয়া যায়। সে ধারণা বদলে দিয়ে আর্সেনিকের কারণে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ধারণা। তাহলো আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিবেশীর নলকূপ হতে পানি আনতে বারণ করছে। অবিবাহিত আক্রান্ত যুবক যুবতীদের বিবাহ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আর্সেনিক আক্রান্ত বিবাহিত নারীদের অনেক সময় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাকরীজীবিদের অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটি কাটাতে বাধ্য করছে। এম'নকি চাকরীচ্যুত হচ্ছেও অনেকে। সবমিলিয়ে এক ভয়াবহ ও করুণ সামাজিক চিত্রের অবতারণা ঘটছে আর্সেনিকোসিসের কারণে।

৩. সুপারিশ সমূহ

আর্সেনিক সমস্যার তুলনায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা এখনো খুবই সীমিত। আরো বড় যে সমস্যা তা হচ্ছে প্রচারের অভাব। আর্সেনিক সমস্যা যেভাবে আমাদের গ্রামীণ জনপদে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সেই তুলনায় এই রোগ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে প্রচারণা খুবই কম। আর্সেনিক একটি ছোঁয়াচে রোগ'। এই ধারণা গ্রামে অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে। কিন্তু আসলে এই রোগ যে ছোঁয়াচে নয় অনেকে তা ভালভাবে জানে না। এই না জানার কারণে কোন পরিবারের একজন লোক আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হলে অন্যান্যরা এমনকি পাড়া প্রতিবেশীরাও তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। উপদেশ হিসেবে বলে "সেরে না উঠা পর্যন্ত ঘর হতে বের হসনে বা অন্য কারো সাথে মিশাবিনে।" পরিবারে আক্রান্ত একজন সদস্যের কারণে অন্যান্যদের ও বাইরে কাজ করতে

Dhaka University Institutional Repository

অসুবিধে হয়, অনেকের স্কুলে কলেজে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি বিয়ে পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। শুধু মাত্র অজ্ঞানতার কারণে সমাজে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এক সময় কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা ছিল এখন অনেকের মধ্যে আর্সেনিকোসিসকে কুষ্ঠরোগের ধারণায় প্রতিফলিত করছে। উক্ত সব সমস্যার কথা চিন্তা করেই

❖ আর্সেনিক দূষণযুক্ত নলকূপগুলো আলাদা করার জন্য আর্সেনিক প্রবণ এলাকার সকল নলকূপগুলো প্রাথমিকভাবে Filed kit দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে।

❖ নিরাপদ পানি সংস্থানের জন্য নিরাপদ ভূগর্ভস্থ পানির নলকূপগুলোকে আলাদা করতে হবে।

❖ আর্সেনিকমুক্ত পানির নলকূপগুলো ব্যবহারের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ যোগাতে হবে।

❖ যদি আর্সেনিকমুক্ত পানির নলকূপ পাওয়া না যায় তবে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করতে হবে এবং সারা বছর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

❖ নিরাপদ পানি বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে সস্তায় নিরাপদ পানি পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ জনসাধারণকে অন্তত পক্ষে খাবার ও রান্না করার পানি বিশুদ্ধ করণের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে।

❖ সরকারকে নলকূপের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে মনিটরিং করতে হবে।

❖ পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য মৌলিক রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিৎ।

❖ ভূ তাত্ত্বিক জরিপ এবং পরিবেশের অবস্থা না জেনে ব্যক্তিগতভাবে বা সাহায্য দাতাদের নলকূপ স্থাপন করার অনুমতি প্রদান সঠিক কিনা? তা মনিটরিং করতে হবে। জনসাধারণকে খাবার পানি নিরাপদ করতে ৩-৪ কলসি পানি নিয়ে কলসি পদ্ধতির ব্যবহার শেখাতে হবে। নিরাপাদ পানির জন্য নদী পুকুর এবং হ্রদের পানি দুষণ মুক্ত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ আর্সেনিক মুক্ত পানি অথবা নিরাপদ পানি পাবার জন্য প্রয়োজনে ব্যয় বহুল পদ্ধতির জন্য যাকাত গ্রহণ করা যেতে পারে।

❖ সচেতন নাগরিকদের দ্বারা গ্রামের দুস্থ মানুষদের সাহায্য করার জন্য সম্প্রদায় ভিত্তিক আর্সেনিক মুক্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ সরকার অথবা বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সস্তায় ও সহজে আর্সেনিক মুক্ত পানি জনগণের জন্য সরবরাহ করা এবং আর্সেনিক দূষিত পানি জনগণকে ব্যবহার করতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

❖ সারা বছর সর্বাবস্থায় ফিল্টারে পরিশোধিত নিরাপদ পানি এবং প্রয়োজনে বৃষ্টির পানি পান করার সুব্যবস্থা করা এবং জনগণকে বেশী করে সস্তায় প্রাপ্ত দেশীয় পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা ও উৎসাহিত করা।

❖ আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদেরকে সণাক্ত করার পর অবিলম্বে স্বাস্থ্য সেবার অধিনে নিয়ে আসা।

❖ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে আর্সেনিক মিশ্রিত ভূগর্ভস্থ পানি ও এর বিপদ থেকে হুমকি বিনাশে ও যন্ত্রণা লাঘবে কি কি করণীয়? সে ব্যাপারে গ্রামীণ ও সিভিল সমাজে সচেতনতা তরান্বিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

❖ আর্সেনিক মিটিগেশন প্রজেক্ট কর্তৃক নির্মিত, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য ছাকন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্সেনিক সমস্যার কিছুটা দুর করা যেতে পারে। কেননা এটি পরিবারে ব্যবহার সহজ সুবিধাজনক।

❖ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগী দীর্ঘদিন আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ পানি ও পুষ্টিকর খাবার খেলে, সে পুনরায় স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। এ ব্যাপারে আক্রান্তকারীদেরকে ভালভাবে বোঝাতে হবে।

❖ আর্সেনিকোসিস ধরা পরার প্রথম অবস্থাতেই বিশুদ্ধ পানি পানের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র সরবরাহ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ গ্রামের হাতুরে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে সরাসরি গেজেটেডকৃত সরকারী (MBBS) ডাক্তাদের পরামর্শ নিতে হবে। কেননা গ্রাম্য হাতুরে ডাক্তারদের পানির বিশুদ্ধতা আর্সেনিকের সঠিক চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান নেই। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

❖ বৃটেনে 'ম্যাডকাউ' রোগের জন্য যে রূপ ক্ষতি পুরণ দেওয়া হয় বা হচ্ছে অনুরূপভাবে আমাদের দেশের আর্সেনিক সমস্যা দুর করণের জন্য আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই" নামক প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ গ্রামীণ জনগণকে নলকূপ ব্যবহার কালচার ত্যাগ করে পানির বিকল্প ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

❖ আমাদের দেশের আর্সেনিকোসিস রোগীরা বিদেশী ডাক্তারদের নিকট গিনিপিকের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ বিদেশী ডাক্তাদের দ্বারা চিকিৎসা করলে তারা এদেশের রোগীদের উপর প্রশিক্ষণ চালায়।এতে অনেক রোগী ভূল চিকিৎসায় মারাও যায়। এ সমস্যা দুর করার জন্য সরকারকে দ্বায়িত্ব নিতে হবে,যাতে করে আমাদের দেশের ডাক্তাররা বিদেশ গিয়ে আর্সেনিকোসিস চিকিৎসার উপর ভাল প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে পারে।

❖ বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ মানব সৃষ্টি অথবা প্রাকৃতিক যাই হোক না কেন এ দুষণ ভূগর্ভস্থ পানিতে আস্থা গেড়ে বসেছে এবং আর্সেনিকোসিস মানব জীবনে হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। কাজেই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে অবিলম্বে এ সমস্যা দুর করতে হবে।

❖ আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ বসানোর ইচ্ছা অনেকের থাকলেও শুধু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যারা এখনও আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করছে। সরকারী সহয়তার মাধ্যমে মহল্লা ভিত্তিক আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ বা পানির ব্যবস্থা করলে ভয়াবহ আর্সেনিকোসিসের ছোবল হতে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ আর্সেনিকোসিসের মাত্রা প্রথম পর্যায় অর্থাৎ মেলোনোসিস থেকে দ্বিতীয় পর্যায় বা লিউকোনেলানোসিস পর্যায়ে গেলে তা নিরাময় করা সহজ। এক্ষেত্রে আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান করতে হবে এবং পরবর্তী কয়েক মাস পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

❖ আর্সেনিকোসিস যতটা প্রতিরোধক, ততটা প্রতিষেধক নয়। কাজেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা আর্সেনিক এমন পদার্থ যা দেখা যায় না, গন্ধ নাই। শুধুমাত্র আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর বাহ্যিক কিছু লক্ষণ দেখে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তকে চিহ্নিত করা যায়। আর এ অবস্থা হলো রোগাক্রান্ত হওয়ার পর। কাজেই এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে রোগীদের ও অন্যান্যদের সচেতনতার বিকল্প নাই।

➫ প্রথম ও প্রধান সচেনতা হলো আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান করা। আর এর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো নলকূপ পরীক্ষা করা এবং সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে আর্সেনিক মুক্ত পানির ব্যবস্থা করা তথা আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপনে সহায়তা করা।

❖ যেহেতু আর্সেনিক পরীক্ষা করে, আক্রান্ত নলকূপগুলোতে বিপদসংকেত স্বরূপ লাল চিহ্ন এবং আর্সেনিক মুক্ত নলকূপগুলোতে সবুজ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। সেহেতু লাল রঙের নলকূপের পানি পরিহার করে সবুজ রঙের নলকূপের পানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিকল্প হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করতে হবে। কেননা বৃষ্টির পানি আর্সেনিক মুক্ত ও নিরাপদ।

❖ সম্প্রতি অতি অল্প খরচে দেশজ উপাদান ব্যবহার করে পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করার একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছেন বেসরকারী সংস্থা আরসকির সভাপতি এবং প্রধান বিজ্ঞানী ডা. এম. এ. হাসান। তার উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে নারিকেলের ছোবড়া, মালা এবং ধানের তুষ থেকে এক দরণের এবজরবেন্ট ব্যবহার করে মাত্র ১২ ঘন্টায় পানিকে আসেনিক মুক্ত করা যায়।

➫ এক্ষেত্রে প্রথমে নারিকেলের ছোবড়া, মালা এবং ধানের তুষ পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। সে ছাই চালুনিতে ছেকে শুকনো পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। ছাইয়ের সঙ্গে আধমুঠো ফিটকিরি আর্সেনিক যুক্ত ৪ টিলার পানিতে মিশিয়ে ১২ ঘন্টা রেখে দিলেই পানির আর্সেনিক আলাদা হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ নোয়াখালীর শান্তিনগর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা যেভাবে আর্সেনিক যুক্ত পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করেছেন তা হলো ৪ গ্রাম ফিটকিরি এবং খুব সামান্য পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত ছোট এক প্যাকেট এক বালতি বা ২০ লিটার পানির মধ্যে ছেড়ে দিলে ২ ঘন্টার মধ্যে পানি আর্সেনিক মুক্ত হয়। এভাবে প্রতিদিন দুইবার পানি বিশুদ্ধ করে পান করলে খরচ ও খুব একটা হয় না। উক্ত বিষয়টি অন্যান্য সকল আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় পৌছে দিতে হবে।

❖ পশ্চিম বঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতালের মোট ১৫ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের যৌথ মতে "যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আর্সেনিক দূষিত পানি ব্যবহার করেছেন বা পান করেছেন, যারা বর্তমানে আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত, তাদের আরোগ্য লাভের ঔষধ হলো নিরাপদ পানি ব্যবহার ও গ্রহণ নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রামের জনগণকে বোঝাতে হবে যে, মওসুমী ফলমূল ও শাকসবজি খেলে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

❖ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত গ্রাম বাসীকে আরো বোঝাতে হবে যে, যাদের শরীরে আর্সেনিক জনিত চর্মরোগ আছে, তাদের দেহে ব্যাপকভাবে ভিটামিন'বি'-এর ঘাটতি আছে। ফলে তাদের এ রোগ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন'বি' সমৃদ্ধ শাকসবজি ও ভোজ্য লতা পাওয়া যায়, যা খেলে শরীরের ভিটামিন'বি'এর অভাব পুরণ করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয় খোজ নিয়ে জানা গেছে গ্রাম বাসিরা যে শাক সবজি খায় তা রান্না করতে গিয়ে খুব বেশী সেদ্ধ করে ফেলে এবং বেশী উপাদেয় করার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় মসলা ব্যবহার করে। এতে খাবার সুস্বাদু হলেও শাকসবজির খাদ্যগুণ তথা ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তাদের ভিটামিন 'বি' এর অভাব পুরণ হয় না। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেশী করে ভিটামিন 'বি' যুক্ত শাক সবজি খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে এবং রান্নার ক্ষেত্রে শাক সবজির খাদ্যগুণ যাতে নষ্ট না হয় সে ক্ষেত্রেও গ্রামীণ জনগণকে পরামর্শ দিতে হবে।

❖ আর্সেনিকোসিস রোগীদের প্রথমত ভিটামিন 'এ,' 'সি', এবং 'ই' দেওয়া যেতে পারে। এর সাথে পেনিসিলিন 'ডি ক্যাপসুল ও মলম ব্যবহার করলেভাল হবে।[ডা. এমএম হক, ২০০২:৩৬]

❖ অনেক গ্রামে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে এইডস কিংবা কুষ্ঠ রোগী ভেবে অনেকেই তাদের সাথে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করছে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিকভাবে একঘরে হচ্ছে। মানসিক ভাবেও তারা হচ্ছে বিপর্যস্ত । কেননা অনেকেই এই রোগকে আল্লাহর দেওয়া গজব বা তার দুঃস্কর্মের বা পাপের ফল হিসেবেও আখ্যায়িত করে। কাজেই এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর যৌথ উদ্যোগে একটি সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি যেখানে আর্সেনিকোসিস রোগী বেশী পাওয়া যায় সেখানেই স্পট চিকিৎসা এবং বিকল্প পানির ব্যবস্থা করা অথবা সচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আক্রান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে। আর এ কাজগুলো করতে হবে অতিদ্রুত।

❖ যেহেতু গবেষণা এলাকার অধিকাংশ নলকূপ আর্সেনিক আক্রান্ত। এবং আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও অনেক। সেহেতু পানির সমস্যা মোকাবেলার জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনের পাশাপাশি রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ) প্রকল্পের কার্যক্রম আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

❖ গ্রামীণ জনপদে যেভাবে আর্সেনিক দুষণ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি দেশের সকল শিক্ষিত বিবেকবান মানুষকে আজ হতেই এই আর্সেনিকোসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। সচেতন করে তুলতে হবে সকলকে। বিশেষ করে নারীদের প্রতি দিতে হবে সজাগ দৃষ্টি। কারণ তারা এ সমাজে বেশী পিছিয়ে আছে। কুসংস্কার আর সচেতনতার অভাব তাদেরকে অক্টোপাসের মত গ্রামীণ জনপদে জড়িয়ে রেখেছে। কাজেই এই কুসংস্কারকে গুড়িয়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই মোকাবেলা করতে হবে এই মহাদূর্যোগ।

❖ জনগণকে আর্সেনিকোসিসের ঝুঁকি কমাতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান করানো । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমাতে হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার হবে না এবং আর্সেনিক দুষণ প্রক্রিয়াও কম হবে।

❖ আর্সেনিকোসিসের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এটা সর্বজন স্বীকৃত। তবে গণমাধমের এ বার্তা শেকর পর্যায়ে বসবাসরত মানুষের কাছে পৌচ্ছায় কিনা ? প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা আমাদের দেশে এমন অনেক জনপদ আছে সেকানে অদ্যবধি বিদ্যুৎ পৌছায়নি এবং ভাল রাস্তাঘাট ও তাদের নেই। এমন জনপদের বসবাসকারী মানুষকে আর্সেনিক সচেতন, সামাজিক ও মানসিক সচেতন করে তোলার জন্য অবশ্যই

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মিনা-রাজুর গল্পের মত গল্প করে গণশিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি উক্ত বিষয়ে সামাজিক শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে।

❖ যেহেতু গ্রামীণ জনপদের অধিকাংশ নলকূপই আর্সেনিক আক্রান্ত। সেহেতু খাওয়ার পানির সমস্যার মোকাবেলার জন্য সকলকে উদ্যোগী ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে নিরাপদ পানির বিকল্প হিসেবে যে সমস্ত নলকূপের পানির আর্সেনিক মুক্ত সে সকল নলকূপের পানি এলাকার সকল পরিবারের মধ্যে বন্টনের সুব্যবস্থা করতে হবে।

❖ আর্সেনিক আক্রান্ত গ্রামগুলোতে আর্সেনিকের স্বাস্থ্যহানী সংক্রান্ত সর্তকবাণী সমাজের সবার মধ্যে পৌছে দিতে হবে। অকারণে সমাজের আর্সেনিক ভীতি দুর করা ও ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সর্বপরি স্বল্পমূল্যে আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা বা উৎস উদ্ধারণ করা।

❖ আমাদের দেশে মনো ক্রপিং হিসেবে ধানের চাষ বেশী হয়। এই ধান চাষ সম্পূর্ণভাবেই বর্তমান সেচের উপর নিভর করে। ফলে প্রচুর ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করতে হয়। আর অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দুষণ বেশী হয়। এমতাবস্থায় সরকার ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে ধান চাষের পরিবর্তে অন্যান্য লাভজনক ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করলে আর্সেনিক দুষণ কম হবে।

❖ ফ্লরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. লিনামার মতে, ফার্ন এবং মৃত্তিকার মাধ্যমে আর্সেনিক দুর করণ সম্ভব।[F Rashid, 2005]

❖ মসজিদের ঈমাম গ্রামীন জনপদে আর্সেনিক সচেতনতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি প্রতি শুক্রবারে আর্সেনিক ও আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবেন।

সর্বোপরি জনগণকে অধিক বিশ্বাসের সাথে সচেতন করতে সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সংবাদ পত্র সহ অন্যান্য সকল গণ মাধ্যমগুলো।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানির বিকল্প ব্যবস্থা

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ যেভাবে আর্সেনিক আগ্রাসনে টতস্থ এবং আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের যে ভয়াবহ অবস্থা তাতে আর্সেনিকোসিস সমস্যা এখন আর কারো ব্যক্তিগত বাপারিবারিক সমস্যা নয়। এটি মূলত একটি জাতীয় সমস্যা। কাজেই এসমস্যা সমাধা কল্পে সবার এগিয়ে আসতে হবে। আর এই রোগের প্রধান উৎস যেহেতু পানি সেহেতু এই রোগাক্রান্ত পান পরিহার করে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমান সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করণের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবণ ও চালু করেছেন। এর এক একটি পদ্ধতি অঞ্চলভেদে পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে অধিক কার্যকরী। (অধিক ব্যবহার উপযোগী কয়েকটি পদ্ধতি গবেষণা এলাকার বিকল্প বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা যেতে পারে।

৪.১. পাত কুয়া খনন

কুয়া খনন করে ভূগর্ভের পানি ব্যবহারের পদ্ধতিটি আমাদের দেশসহ পৃথিবীল অনেক দেশেই চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কুয়ার পানি আর্সেনিক মুক্ত। কুয়ার পানি সংগ্রহ করে পান করাসহ পরিবারের অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা নিরাপদ। কুপটি কমপক্ষে ১ মিটার ব্যাসাধ্য করে নিচের দিকের বা নিকটস্থ পানিস্তরের ১ মিটার গভীরে খনন করতে হবে। তবে আরো প্রশস্ত ব্যাস ও অধিক গভীরতা বিশিষ্ট কুপ খনন করলে একটি মহল্লা ও পাড়ার জনগোষ্ঠির আর্সেনিক মুক্তপানির চাহিদা পূরণ করা সম্বব। এই কুয়া রিং দ্বারা এবং রিং ছাড়া উভয় ভাবেই নির্মাণ করা যায়। রিং ছাড়া কুয়াকে বলা হয় কাচা কুয়া। তবে এটিতে জীবানু ও ময়লা আবর্জনা থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। অপর পক্ষে রিং দিয়ে কুয়া নির্মাণ করলে কিছুটা স্বাস্থ্যপদ হয়। এক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন-কুয়ার নিকটে মলত্যাগ করা যাবে না বা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। স্বাস্থ্য সম্মত স্থানে কুয়া খনন করে তার মুখটি ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার কুয়ার পানিতে ছেড়ে দিয়ে পানি জীবাণূমুক্ত রাখা যায়। (চিত্র: ১০.১,১০.২) [এইচ. কে. ডাস,২০০০:২২৭]।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২. ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারী

বর্ষজীবি নদী, অথবা সংরক্ষিত কোন পুকর, জলাশয় পাওয়া গেলে তার নিকটে ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারী বা কুয়া খনন করে, ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয়ের পানি কুয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করে আর্সেনিকমুক্ত পানির অভাব দুর করা যায়। এই পদ্ধতিতে পুকুর বা নদীর পানি বালির ফিল্টারের বা বালিময় মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে পাশ্ববর্তী কুপ বা গ্যালারীতে সংগ্রহকরা হয়। এই পদ্ধতিতে পানি সংগ্রহ করলে সহজে পানিতে ভাসমান স্বাভাবিক বর্জদ্রব্য ও জীবাণু মুক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে পুকুর ও গ্যালারীর মধ্যে পানির গতি জোড়ালো রাখতে মাটির অভেদ্য স্তর সরিয়ে বালি ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের পানি যেহেতু আর্সেনিকমুক্ত সেহেতু গ্যালারীর পানিও আর্সেনিক মুক্ত হবে। (চিত্রঃ ১০.৪)[এইচ. কে. ডাস,২০০০:২৩০]।

৪.৩. পারিবারিক ফিল্টার পদ্ধতি বা কলসী পদ্ধতি

পারিবারিকপর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের পানি কলসি ফিল্টারের মাধ্যমে দুষণ মুক্ত করা যায়। এ পর্যায়ে পরপর কয়েকটি মাটির কলসিকে সোজাসোজি উপর হতে নীচে সাজিয়ে কলসির মধ্যে বালি, খোয়া, কাঠ, কয়লা, নারিকেলের ছোবরা ইত্যাদি ব্যবহার করে ছাকনি তৈরী করে পানিকে বিশুদ্ধ করা যায়। মূলত এটি একটি পুরাতন পদ্ধতি। যখন নলকূপের ব্যবহার ছিল না তখন এই পদ্ধতিতে মানুষ পানি পরিস্কার করতো। কালের টানে নলকূপ বিপ্লবের ফলে এটি হারাতে বসেছিল। বর্তমান পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য একটু উন্নত সংস্করণে এই পদ্ধতি পুনরায় চালু করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির নাম পারিবারিক ফিল্টার পদ্ধতি বা কলসি পদ্ধতি। (চিত্রঃ ১০.৬) [এইচ. কে. ডাস,২০০০:২৩৪ এবং ডা. এম.এম. হক, ২০০২:৪৩] ।

৪.৪. বালতি পদ্ধতি (বাকেট ট্রিটমেন্ট ইউনিট, BTU)

এই পদ্ধতিতে ফিটকিরি ও পটাশের একটি রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরী করতে হবে ১০০ ঃ ১ অনুপাতে। এই মিশ্রণ আর্সেনিক যুক্ত পানিতে মিশিয়ে পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিতে ২০ লিটারের একটি লাল বালতিতে আর্সেনিক যুক্ত পানি ভর্তি করে নিয়ে সেই পানিতে ফিটকিরি ও পটাশের মিশ্রণ ১ চামচ কাঠি দ্বারা ভালভাবে মেশাতে হবে। অতপর লাল বালতিটি আকেরটি সবুজ বালতির উপর রাখতে হবে। ২ ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর লাল বালতি হতে ট্যাপের মাধ্যমে সবুজ বালতিতে পানি ফেলতে হবে। নীচের সবুজ বালতির মধ্যে থাকবে ১০ ইঞ্চি পারিমান বালির স্তর। এই বালির স্তরের বা ফিল্টারের মাধ্যমে পানি চূড়ান্তভাবে পরিশোধিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সবুজ বালতির নীচে ও থাকবে একটি ট্যাপ এই ট্যাপের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা যাবে। লাল বালতিতে এমনভাবে ট্যাপ লাগানো হয় যাতে বালতির উপরের দুই-তৃতীয়াংশ পানি নীচের সবুজ বালতিতে নামতে পারে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক মিশ্রণ নেওয়ার জন্য একটি বিশেষ চামচ ও নাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ কাঠি ব্যবহার করতে হবে এবং এগুলো দিয়ে আর অন্য কোন কাজ করা যাবে না। লাল বালতির তলানি গোবর গাদায় অথবা টয়লেটে ফেলে দিতে হবে। এ পর্যায়ে দিনে দুইবার পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করা যায়। রাসায়নিক মিশ্রণটিকেও চামচসহ সূর্যের আলো থেকে দুরে ও ভান্ডা শুকণা জায়গায় রাখতে হবে। এ পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যাবহার করা যাবে।(চিত্র: ১০.৭) [ডা. এম. এম. হক, ২০০২: ৪২]

৪.৫. রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টিং সিস্টেম (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি)

বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতেই নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। কেননা বাংলাদেশের সর্বত্রই বৃষ্টিপাত হয়। খাবার ও রান্নার কাজে বৃষ্টির পানির ব্যবহার আমাদের দেশের পুরানো ধারণা। বৃষ্টির পানি সাধারণত আর্সেনিক মুক্ত। বৃষ্টি শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পর পানি সংগ্রহ করতে হয়। তার পর সেই পানি সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই পানি কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে তা নির্ভর করে সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে এই পানি ৬ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। বাড়ির ছাদ, টিনের বা টালির চাল পরিষ্কার রাখলে এবং এই সকল ছাদ বা চালের উপর কোন গাছ না থাকলে সেখান থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির পানি বড় পাত্রে সংগ্রহ করে রাখা যায়। আবার ফাকা জায়গায় চারটি খুঁটি পুতে এতে পরিস্কার বড় কাপড় বা পলিথিন টাঙ্গিয়ে ও বৃষ্টিরপানি সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে কাপড় বা পলিথিনের কেন্দ্রে ভারী কোন বস্তু ঝুলিয়ে দিতে হয় যেন পলিথিন বা কাপড় উল্টানো ছাতার মত দেখায়। ভারী বস্তুটি যেখানে বাঁধা হবে তার পাশেই একটি ছোট ছিদ্র করতে হয়। এই ছিদ্রের নীচে পরিষ্কার পাত্র বসিয়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা যায় অথবা কোন নল লাগিয়ে ট্যাংকের মধ্যে ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা যায়।

(চিত্র: ১০.৮)[ডা.এম.এম.হক,২০০২:৪০]

৪.৬. অ্যালকেন এনহেনসড একটিভেটেড এলুমিনা ফিল্টার

বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেকট (বামওয়াসপ) এই পদ্ধতিতে পানি আর্সেনিক মুক্ত করণে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটি যে কোন

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রার আর্সেনিক দুষিত পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করতে পারে। এটি প্রতি ঘন্টায় ৩০০ লিটর পানি শোধন করতে পারে যা ৭ সদস্য বিশিষ্ট মোটামুটি ১০০টি পরিবারের জন্য যথেষ্ট। এই পদ্ধতির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৮০,০০০ লিটার পানি আর্সেনিক মুক্ত করা যায়। এরপর এটির ফিল্টার পরিবর্তন করতে হয়। এছাড়াআরো কিছু দেশী বিদেশী ফিল্টার বাংলাদেশে পাওয়া যায়। তবে এগুলোর ফলাফল আশানুরূপ নয়। এই সকল ফিল্টারগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে এবং তারপর এর আর্সেনিক মুক্ত করার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এই ফিল্টার পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। [ডা. এম.এম.হক, ২০০২ : ৪৪]

৪.৭. আর্সেনিক অপসারণ ইউনিট স্থাপন

কোয়াগুলেশন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে আর্সেনিক অপসারণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক যুক্ত পানি প্রতি লিটারে ১০০ হতে ১৫০ মিলিগ্রাম ফিটকিরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং অক্সিডেন্ট হিসেবে সৌর কিরণ ব্যবহার করা হয়। এতে অন্য আর কোন রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয় না। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক অপসারণে সাফল্যের মাত্রা শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। তবে পরিশোধনের মাত্রা বাংলাদেশের আঙ্গিকে সহণীয় মাত্রার নিচে। অর্থাৎ Who এর মতে বাংলাদেশে প্রতি লিটার পানীয় জলে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ মাত্রা ০.০৫ মিলিগ্রাম।যদি প্রতি লিটার পানিতে ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম এ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে পানি পরিশোধন করা হয় এবং আর্সেনিক অপসারণ ইউনিট থেকে জনপ্রতি দৈনিক ২৫ লিটার করে ২৫টি পরিবারের আর্সেনিকমুক্ত পানির চাহিদা মেটানো যায় তাহলে প্রতিটি পরিবারের মাসিক খরচ পড়বে মাত্র ১০ টাকা। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিরাপদ পানির চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিটি পাড়া ও মহল্লাতে একটি করে হস্ত চালিত নলকূপের মাধ্যমে আর্সেনিক ও আয়রণ অপসারণ ইউনিট স্থাপন করে, আর্সেনিক দুষ্ট ভূগর্ভস্থ পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করা যেতে পারে।(চিত্র: ১০.৩) [এইচ. কে. ডাস, ২০০০ : ২৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮. ছাঁকনির মাধ্যমে নলকূপের আর্সেনিক অপসারণ

জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সফিউল্লাহ (১৯৯৮) ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরের আর্সেনিক অপসারণের জন্য এই বিশেষ ধরণের নলকূপের ছাঁকনি উদ্ভাবন করেন। এ ছাকনির সাহায্যে বা এই ছাকনি ব্যবহার করে ১.৬ পিপি এম আর্সেনিক দক্ষতার সাথে অপসারণকরা যায়। এই ছাঁকনি ব্যবহার করলে নলকূপের পানি উত্তোলনের স্বাভাবিক প্রবাহ প্রায় একই থাকে। অর্থাৎ এই ছাঁকনি ব্যবহার করে প্রতি মিনিটে ১.৫ লিটার পানি উত্তোলন করা সম্ভব। বর্তমান এই ছাঁকনিটি লোহার হাইডোক্সাইড, প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা ও মাঠে ব্যবহার করে আরো বিশেষ সুবিধা, এমন কি কিছু অসুবিধা নিয়ে গবেষণাধীন রয়েছে। এই ছাঁকনির মূল্য পরবে প্রায় ১২০ আমেরিকান ডলার এবং আশা করা যাচ্ছে এই ছাঁকনির স্থায়ীত্ব কাল হবে ২০ বছর। [এইচ. কে. ডাস, ২০০০: ২৫৯]

৪.৯. কলাম ফিল্টার (সফি ফিল্টার)

এডসরবশন ফিল্টারের ফিলট্রেশন পদ্ধতি অনুসরণ করে অধ্যাপক সৈয়দ সফিউল্লাহ (১৯৯৮) সালে সল্প ব্যয়ের এই কলাম ফিল্টার উদ্ভাবন করেন। এই ফিল্টারের প্রাথমিক উপাদান হলো বালুর বিভিন্ন উপাদান, যেমন- লোহার অক্সাইড (Fe_2O_3) ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (MnO_2) ও সাভার অঞ্চলের লালমাটি। আর্সেনিক অপসারণের অন্যান্য উপাদানগুলো হলো $Fe\ (OH)_2$, MnO_2,Fe_2O_3,$Al\ (OH)_3$ এবং $Mn\ (OH)_2$ । এই উপাদানগুলো লালমাটির সাথে মিশিয়ে বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বশেষ ১২০০ ডিগ্রি তাপে পোড়াতে হবে। এই ফিল্টারে সূক্ষ্ম ছাঁকনি হিসেবে থাকবে বিশিষ্ট দেশীয় পোড়া ইটের ঝামা। এবং প্রয়োজন অনুপাতে এই সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ঝামা ইট ভেঙ্গে টুকরো করে নিতে হবে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমেপরিস্কার বোঝানো হলো। এই ফিল্টারের মাধ্যমে পানিতে ০.০৫ থেকে ২ পিপি এম পরিমাণের আর্সেনিক সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা যায় এবং পানির প্রবাহ মাত্রা থাকে মিনিটে ২৫০ মিলিলিটার। প্রতিটি কলাম ফিল্টারে প্রতিদিন ৩০ লিটার পানি আর্সেনিক মুক্ত করা যায়। এই ফিল্টারের স্থায়ীত্ব ২ বছর ধারণা করা হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় গুণ হলো এটাতে আর্সেনিক এবং আয়রণ উভয়ই দুর হয়(চিত্র: ১০.৫) [এইচ কে. ডাস ২০০০ ঃ ২৫৩, ২৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

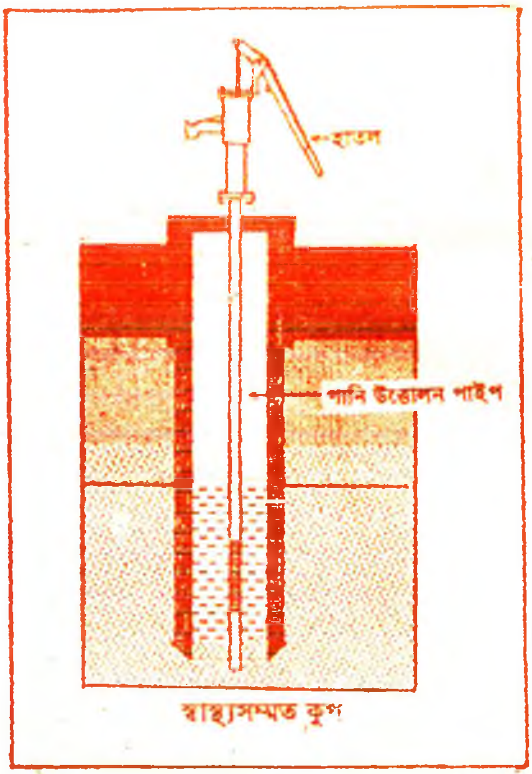

চিত্র ১০.১ : একটি নমুনা পাতকুয়া

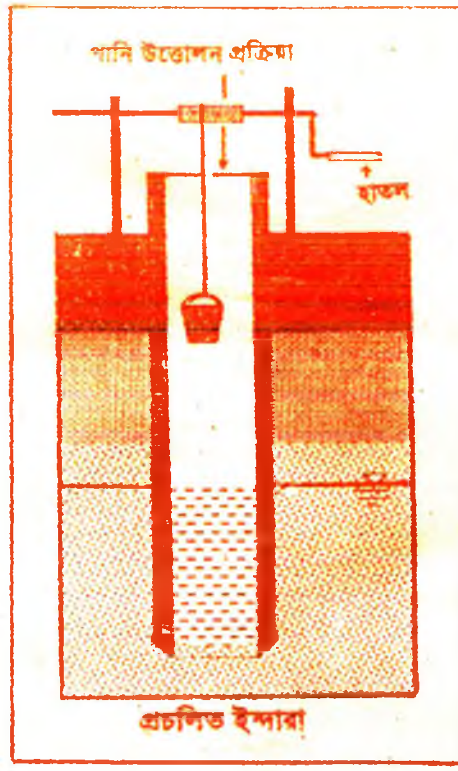

চিত্র ১০.২ : একটি নমুনা ইদারা

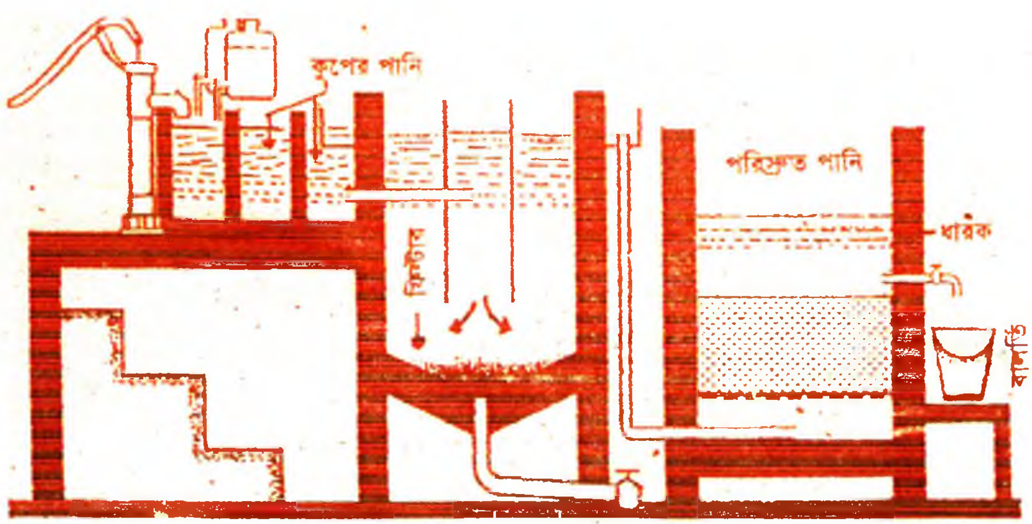

চিত্র ১০.৩ : একটি নমুনা আর্সেনিক অপসারণ ইউনিট

Dhaka University Institutional Repository

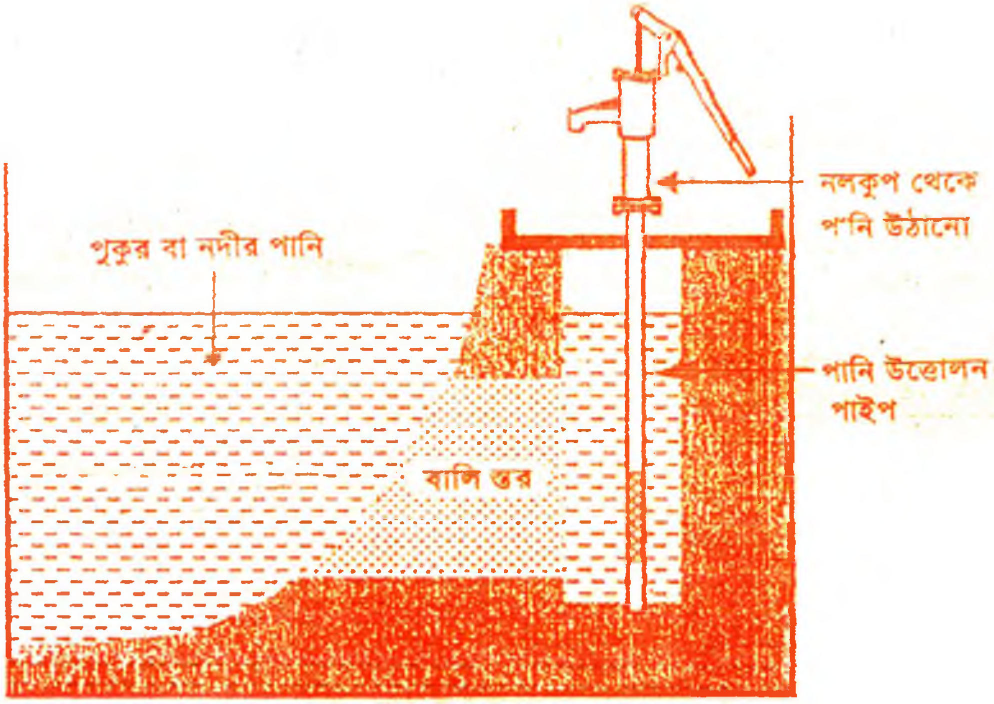

চিত্র ১০.৪ : একটি নমুনা ইনফিল্ট্রেশন গ্যালারী

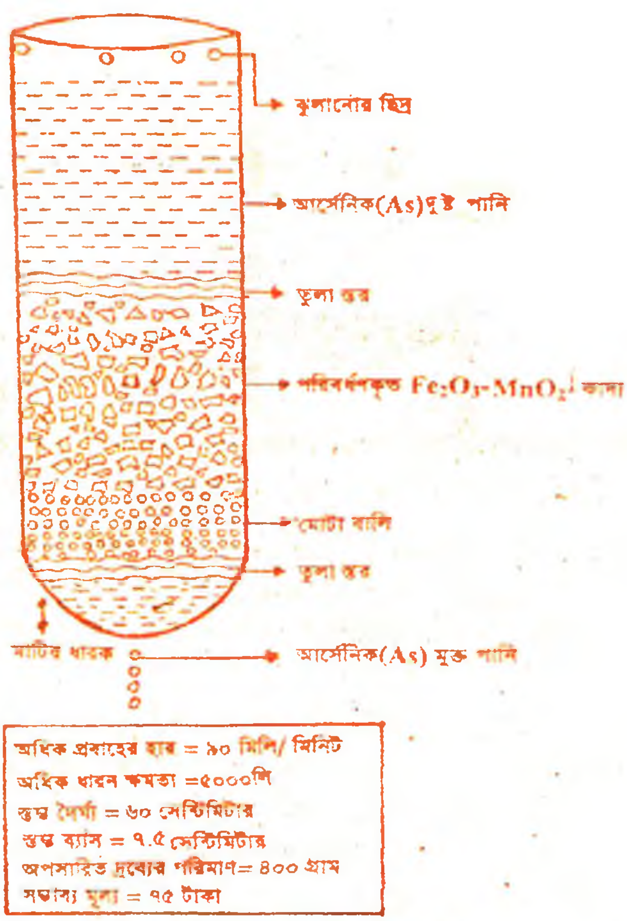

চিত্র ১০.৫ : একটি নমুনা কলাম ফিল্টার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১০.৬ ঃ পারিবারিক ফিল্টার বা কলসি পদ্ধতি

চিত্র ১০.৭ ঃ বালতি পদ্ধতি

চিত্র ১০.৮ ঃ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়

১১

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

১. উপসংহার ও তথ্যপঞ্জি

পরিশেষে বলতে পারি এই গবেষণাটি আর্সেনিক যুক্ত একটি গ্রামীণ এলাকায় সম্পর্ণ করা হয়েছে। এই এলাকার জনমিতিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত রোগীদের শারিরীক, মানসিক অবস্থা, তাদের পানি পানের অভ্যাস এবং অন্যান্য চলক যেমন- পেশা, আয়-ব্যয়, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা এবং পানির উৎস ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তবে এত ছোট গবেষণা এলাকায় এবং কম নমুনার মাধ্যমে উপসংহারে আসা অত্যন্ত দুরহ কাজ। যাই হোক এই গবেষণার মাধ্যমে নিম্নোক্ত উপসংহারে পৌছাতে পেরেছি।

বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ।এদেশের বিতর দিয়ে তিনটি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের পানি সম্পদের প্রধান উৎস হলো পদ্মা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী যেগুলোর উৎস পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। এ নদীগুলোর সমাপ্তি ঘটেছে বঙ্গোপসাগরে, ভারতের ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার আর্সেনিকের একটি অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ নীচু এলাকা হওয়ায় প্রতি বছর বন্যার ফলে দীর্ঘস্থায়ী পানি অবস্থানের কারণে পানি আর্সেনিক যুক্ত হয়।

আর্সেনিকোসিস সমস্যা বর্তমান বাংলাদেশে তথা গবেষণা এলাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা, ভূর্গস্থ পানি, ভূ-রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তনের ফলে পানি আর্সেনিক যুক্ত হয়। সম্ভবত সবুজ বিপ্লবের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বেড়ে গেছে। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ক্রমেই দূষিত হচ্ছে। অতি মাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার সাথে আর্সেনো পাইরেট মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকা দূষিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য ও আর্সেনিকে আক্রান্ত হচ্ছে। শিবচর এলাকার ভূ-তলস্থ পানি মারাত্মক ভাবে আর্সেনিক যুক্ত। এই এলাকার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ প্রতিদিন আর্সেনিক যুক্ত পানি ব্যবহার করছে। ফলে এ এলাকায় ক্যান্সারের মত মারাত্মক আর্সেনিকোসিস রোগ দেখা দিয়েছে। নমুণায়নে দেখা গেছে অনেক মানুষের হাতে, পায়ে, বুকে ও পিঠের, ত্বকের সমস্যার পাশাপাশি বৃক্কীয় সমস্যা, কীডনীর সমস্যা, হার্ট, ফুসফুস, মস্তিষ্কের সমস্যা, নখ, চুল, মাথা ব্যাথা প্রভৃতি সমস্যায় তারা জর্জরিত। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীরা তাদের স্বাভাবিক চেহারা নষ্ট হবার জন্য মানসিক যন্ত্রণা

Dhaka University Institutional Repository

অনুভব করছে। গ্যাংগ্রীণ রোগের ভয়ে ও তারা আতংকীত। কিন্তু তারা জানেনা কিভাবে এরূপ অবস্থা হতে মুক্তি পাবে। আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ছেলে ও মেয়ে উভয়ই একে অন্যকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। এর ফলে ছেলে মেয়েরা অসুখী জীবন যাপন করছে। অনেক দম্পতিরা আর্সেনিকোসিসের কারণে যৌন সমস্যায় ভূগছে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় অত্যন্ত বেশী। তাই তারা গ্রামের ডাক্তার দিয়ে অল্প খরচে চিকিৎসা করে। গবেষণা এলাকায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে খাবার ও রান্নার পানি সংগ্রহ করা। কেননা গবেষণা এলাকার প্রায় ১০০% লোকই পান করা সহ গৃহস্থালির অন্যান্য কাজে নলকূপের পানি ব্যবহার করে। আর এ সমস্ত নলকূপের অধিকাংশেই রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক। ফলে অত্র এলাকায় নিরাপদ পানীয় জলের বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় অল্প কিছু পরিবার ব্যতীরেকে অধিকাংশ পরিবারই আর্সেনিকের বিষ অবলিলায় পান করে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ আর্সেনিকোসিস রোগ ও অত্র এলাকায় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। অত্র এলাকায় গবেষণা জরিপ করতে গিয়ে ৩১৮ জন রোগীর সন্ধান পেয়েছি। তবে আনাচে-কানাচে নিজের অজান্তে, ঠিকানার অভাবে, এমনকি অনেকের আর্সেনিকোসিস হয়েছে কিন্তু তা তারা প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক এমন রোগীও রয়েছে; যাদের খবর আমরা জানি না। অর্থাৎ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর সঠিক ও পরিপূর্ণ হিসেব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে একথা স্পষ্ট বলা যায় যে প্রত্যেকটি গ্রামীণ জনপদেই আর্সেনিকোসিস রোগীর সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭১ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন এদেশে মোট জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। অর্থাৎ ৩০ বছর পূর্বে সাত কোটি মানুষ এদেশ স্বাধীন করেছিল আর চলতি সময়ে অর্থাৎ আজ সাত কোটি মানুষ এই মৃত্যু দূত আর্সেনিকোসিসের ঝুকির মধ্যে জীবনযাপন করছে। বিশেষজ্ঞদের মত, প্রায় আড়াই কোটি দেশবাসী যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই গ্রামের মানুষ, এবং তারা আর্সেনিকোসিসের বিনাসী প্রতিক্রিয়ার রাহু গ্রাসে।

এমতাবস্থায় কি উপায়ে বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কি উপায়ে আর্সেনিকোসিসের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার নিমিত্তেই সর্বসাধারণকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সঠিক ভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় মানুষের মধ্যে কুসংস্কার জন্ম নেবে এমনকি নিয়েও ফেলেছে এবং অহেতুক ভীতির সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে আর্সেনিকোসিস কেন হয়, এর লক্ষণ উপসর্গ কি, চিকিৎসা ও প্রতিকার কি, কি করলে প্রথম হতেই আর্সেনিকোসিস হতে দূরে থাকা যায়? আর যাদের আর্সেনিকোসিস হয়ে গেছে, তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সমাজে তারা কিরূপ আছে এবং কেমন থাকা উচিৎ;ইত্যাদি সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাবলী যেমন নিজেদের

Dhaka University Institutional Repository

জানা প্রয়োজন তদ্রূপ দায়িত্বশীলতার সাথে জনসাধারণের মাঝে এসব তথ্য পৌছে দেওয়া ও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন- সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশণ ও অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মিডিয়া এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এখানে আরেকটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য যে, দেখা গেছে গ্রামীণ জনপদের বেশীর ভাগ এলাকায় মানুষের আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও বিকল্প নিরাপদ পানির অভাব হেতু নিরুপায় হয়ে তারা আর্সেনিক যুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ পানি পান করে চলেছে। কাজেই আর্সেনিকোসিস বিষয়ক সচেতনতা বিকাশের অংশ হিসেবেই বিকল্প নিরাপদ পানির উৎস; যেমন- ভূ-পৃষ্ঠের পানি, বৃষ্টির পানি ও অপরাপর ব্যবস্থায় সংগৃহীত নিরাপদ পানি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক প্রচারনার প্রয়োজন।

সবশেষে আরো একবার বলতে হচ্ছে বন্যা, খড়া, জলোচ্ছাস ঘূর্ণিঝর, সুনামী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগের পাশাপাশি আরো ভয়ংকর হয়ে ভিন্নরূপ নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে মহামারী আকারে অন্য একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা জীবন বিনাশী দূর্যোগ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ যার প্রতিক্রিয়া আর্সেনিকোসিস। আমাদের দেশে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের রিপোর্ট মতে আড়াই লক্ষ আর্সেনিকোসিস রোগী রয়েছে। এক সঙ্গে এত মানুষ আক্রান্ত হবার ঘটনা অতি বিরল। এটি সত্যিকার অর্থে একটি মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি। যে পানির অপর নাম ছিল জীবন সেই পানিই আমাদের দেশে হয়ে উঠেছে মৃত্যুর কারণ। এ দেশের আপামর জনসাধারণ এই আর্সেনিক দূষিত পানি পান করে প্রতি চুমুকে জীবনের স্বাদ নেওয়ার বদলে নিয়মিত নিয়ে চলেছে মৃত্যুর আস্বাদ। আর এই আস্বাদ যে তাদেরকে প্রতিনিয়ত জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা তারা জানতেও পারছে না। তাই সর্বশেষ অনুরোধ হলো আমাদের সকলেরই উচিৎ এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো একে অপরকে অবহিত করে পরস্পরকে সাহায্য করা। অন্যথায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ ক্রান্তিকাল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ, (১৯৭৭). *খাদ্য, পুষ্টি ও বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যা,* ত্রৈমাসিক পুষ্টি পত্রিকা' **পুষ্টিবার্তা,** নভেম্বর ১৯৭৭, এ.কে.এম ফজলুর রহমান সম্পাদিত, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলী, শাহ মোঃ কেরামত প্রমুখ সম্পাদিত, (১৯৯২). *দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান,* ৪র্থ সংস্করণ; পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলম,মীর সাহিদুল, (২০০১). *আর্সেনিক সমস্যা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা:* একটি নেটওয়ার্কিং সেমিনার, ২৫ সেপ্টেম্বর পটুয়াখালী: ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

আলম, সাইফুল, (২০০০). *পৌছে দিন আশ্বাস বাণী,* **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

করীম, মীযানুল, (২০০০). *আরও প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়াম,* **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

চৌধুরী, কামরুল ইসলাম, (২০০০). *পিঞ্জিরার পিঞ্জর ভেঙ্গেছে: রেখে গেছে অনেক প্রশ্ন,* **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফ.ই.জেবি) প্রকাশিত।

চৌধুরী, কামরুল ইসলাম, (২০০০). *আর্সেনিকের ছোবল গ্রাম বাংলাদেশ জুড়ে,* **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

চৌধুরী, শামীমা, (২০০০). *আর্সেনিক: বিরাট বিপর্যয়,* **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

তপন, শাহজাহান, (১৯৯৩). *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল,* ঢাকা: প্রতিভা প্রকশনী।

দাস, হীরেন্দ্র কুমার, (২০০০). *বাংলাদেশে আর্সেনিক, ভয়াবহতা ও সম্ভাব্য প্রতিকার,* ঢাকা:বাংলা একাডেমী।

বাকী, আব্দুল, (১৯৯৮). *গ্রামীণ বসতি,* ঢাকা: বঙ্গ প্রকাশনী।

বান, মিসেস আক্তার, (১৯৭৭). *প্রতিদিনের খাবারে শাককে স্থান দিন,* ত্রৈমাসিক পুষ্টি পত্রিকা' **পুষ্টিবার্তা,** নভেম্বর ১৯৭৭, এ.কে.এম ফজলুর রহমান সম্পাদিত, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূঁইয়া, মোঃ আমিনুল হক, চৌধুরী, ডা. মোঃ মজহারুল হক এবং মালেক ডক্টর মোঃ আবদুল, (১৯৮৭). *পুষ্টি পরিচয়,* পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিয়া, মহম্মদ আলী এবং মিরান, মোঃ আলিমউল্যা, (১৯৯৪). *পরিসংখ্যান পরিচিতি,* ঢাকা: আইডিয়াল প্রকাশনী।

মিয়া, আবদুল জব্বার, (১৯৯৯). *মাদারীপুর জেলা পরিচিতি,* মাদারীপুর:গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশনী।

মোসাদ্দেক, গোলাম, (২০০৩). *বি.সি.এস সাধারণ জ্ঞান.* ঢাকা: বি.সি.এস প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, এ.এস.এম. আতিকুর এবং শওকুতজ্জান, সৈয়দ, (১৯৯৪). *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রহমান, অদিতি, (২০০০). *আর্সেনিক: সন্ত্রাসে তটস্থ জনপদ*, **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

রহমান, সরদার আব্দুর, (২০০০). *আর্সেনিক কবলিত এক জনপদ*, **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

রহমান, সাইদুর, (১৯৭৮). *খাদ্যের পুষ্টি সংরক্ষণ*, ত্রৈমাসিক পুষ্টি পত্রিকা' **পুষ্টিবার্তা,** নভেম্বর ১৯৭৮, এ.কে.এম ফজলুর রহমান সম্পাদিত, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাহা, রাহুল, (২০০০). *এই মহাদুর্যোগের মুখোমুখি*, **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

শিবচর থানা কৃষি জরিপ, (২০০৬). কৃষি অফিসার মাহবুবুর রহমান, শিবচর, মাদারীপুর: কৃষি বিভাগীয় অফিসার রিপোর্ট।

সোমা, শাহপার আহমেদ, (২০০২). *আর্সেনিক*, ঢাকা: ঢাকা আহছানিয়া মিশন।

হক, ডা. এম. মজিবুল, (২০০২). *পানিতে আর্সেনিক তরলে গরল*, ঢাকা: মিসেস নার্গিস আক্তার, বাড়ি নং ৯২ (এ-১), রোড নং ১১/এ ধানমন্ডি আ/এ।

হক, শেখ এনামুল,(২০০০). *রোগীর সংখ্যা বাড়ছেই* , **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

হাফিজ, হাসান, (২০০০). *আর্সেনিক দূষণ ও প্রতিকার*. **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত,ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফইজেবি) প্রকাশিত।

হাসান, মহবুব, আকন্দ, আব্দুল মতিন এবং হোসেন, মোঃ ইসতিয়াক (১৯৯৫). *বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হোসেন, ডা. এ.জেড. এমইফতিখার,(২০০০). *ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া*, **বাংলাদেশ আর্সেনিক চিত্র ২০০০,** কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম (এফ.ই.জেবি) প্রকাশিত।

Abdulla,, M., and Reis, M.F., (1998). Probable Role of Nutrition on Arsenic Toxicity. Paper presented in the International Conference on Arsenic Pbllution of Ground water in Bangladesh: Causes, Effects and Remedies, in Dhaka.

ACIC,(1998), West Bengal and Bangladesh: Arsenic Crisis Information Center.

Adriano, D.C., (1986). Trace Elements in the Terrestrial Environment. New York: Springer-Verlage.

Dhaka University Institutional Repository

Ahmad, S.A, Swyed MHSU, khan, MH, Faruquee, MH, Jalil, M.A ahmad, R,(1998), Arsenic Information Package kit, NGO forum for drinking water supply. Arsenicosis: Neoplastic Manifestations of skin: JOPSOM.

Ahmad, S.A, Swyed, MHSV, Faruquee, M.H. khan, MH, Jalil, M.A Ahmed, R, Hadi, S.A, (1998); Chronic arsenicosis, Management by vitamin A.E.C. Regimen: JOPSOM.

Ahmad, S.A. Swyed, MHSU Hadi, S.A, khan, A.W,,(1997). Modified arsenic field. Test Kit; A cheap and easy device for detection of arsenic in water: JOPSOM.

Ahmed, K., (1982),Food and Pusti, Food and Nutrition, Science Institute. Dhaka University.

Ahmed, M. F., (2002). "An Assessment of Arsenic Problems in Bangladesh", ***International Workshop on Arsenic Mitigation,*** Dhaka, 14-16 January, 2002.

Ahmed, M. F.,(2002). "Environment and Sustainasie Development: A Conceptual Model," The 2nd International Conference on ***Bangladesh Environment (ICBEN-2002)***, eds. Ahmed, Tanveer, Badruzzaman, Dhaka: Bangladesh Poribesh Andolon (BAPA), Vol. 1.

Alernathy, C.O. Cothern, C.R, (ed).,(1994), Arsenic Exposure and Health, Science and Technology letters: Nort wood.

Ali, M. and Trafder, S. S.,(2002). "Drinking Water Arsenic Pollution in Bangladesh and Health Effects", The 2nd International Conference on ***Bangladesh Environment (ICBEN-2002),*** eds. Ahmed, Tanveer, Badruzzaman, Dhaka: Bangladesh Poribesh Andolon (BAPA),Vol.1

ANN, (1999). Arsenic Contamination of Ground Water in Bangladesh. An Interim Report of the Research of Samta Village. Asia Arsenic Network, Research group for Applied Geology. department of Occupational & Environmental Health; NIPSOM Dhaka.

Anwar, J.,(2000). ***Arsenic Pollution in Bangladesh-End of A Civilization ?*** Dhaka: Palash Media And Publisher, 10 Kabi Jashimuddin Road.

Arsenic in Bangladesh Report on the 500 Village Rapid Assessment Project May, 2000, Edited by Q. Quamruzman, M. Rahman and A. Quapi Dhaka Community Hospital (DCH). Fimanced by UNDP. A Ministry of Health and Family welfare . Govt of Bangladesh.

ASIA ARSENIC NETWORK,(1998). Special Edition on Bangladesh, January 30.

Bagachi, K.N., (1969). Poisons and Poisoning Their History and Romance and Their Detection in Crimes: University of Calcutta: Press, Bengal.

Bangladesh Bureau of Statistics,(1996). Bangladesh Population census 1991 (community series: madaripur) Dhaka: govt of Bangladesh.

BGS, (1998). interim report of groundwater studies for arsenic contamination in Bangladesh Rapid Investigation Phase 1 (unpublished)

Dhaka University Institutional Repository

Bhuiyan, R. H. and Uddin, B.,(2001). "Social and Psychological Scenario of Arsenicosis Patients: A Gender Perspective", ***Oriental Geographer,*** Vol. 45, No. 2, July.

Bridge, T. E. and Husain, M. T.,(2000), "Groundwater Arsenic Poisonic and Solution the Arsenic Disaster in Bangladesh," ***Bangladesh Environment*** 2000, Vol. 1.

Chowdhury et al,(1995). The biggest arsenic calamity in the world: the status up to 1995.

Chowdhury, Dr. I.A. and Murshed, Dr. M.,(2000). Arsenic Contamination in Bangladesh, Yearly Health Situation report 2000, Edited by Dr. A. M. Zakir Hussain, IEDCR: Ministry of Health and Family Welfare.

Chowdhury, Q.I., (2001). "Bangladesh is at risk of arsenic poisoning", ***Bangladesh State of Arsenic 2001,*** The Second annual report on the country's state of Arsenic, Dhaka: Forum of Environmental Journalists of Bangladesh (FEJB).

Das H.K.,(1998). Report on Arenac Monitoring in Noakhali Pourashava. DPHE, Danida Urban Water and Sanitation Project Management Unite. Noakhali (unpublished).

DCH, (2000). ***Groundwater Arsenic Contamination in Bangladesh,*** Dhaka: School of Environment Studies, Jadavpur University Calcutta, and Dhaka Community Hospital, Dhaka.

DCH, (1998). The arsenic problem in Bangladesh: An introduction to the country and its arsenic situation. A paper presented in International Conference on Arsenic Pollution of groundwater in Bangladesh: Causes, Effects and Remedies in Dhaka.

Dhar, H.K. and 12 others, (1997). Groundwater arsenic calamity in Bangladesh. *Current Science.*

Dhar, R.K. biswas, Bk, Samanta, G. et al, (1997). Ground water arsenic calamity in Bangladesh: Current Science.

Editorial,(2002). "Arsenic and Contamination of Drinking Water in Bangladesh: A Public Health Perspective", ***J Health Popul Nutr,*** Vol. 20, No. 3.

Farago, M.E., Thornton, I., Kavanagh, P., Elliott, P., and Leonardi, G.S,(1997) Health aspects of human exposure to high arsenic concentration in soil in south-west England In: C.O., Abernatahy, Calderon. R.L., Chappell. W.R. (ed). *Arsenic exposure and health effects,* London: Chapman and Hall.

Food and Nutrition Science Institute, (1980). Deshiya Khadhadrabbur Pustiman. food and Nutrition Science Institute. Dhaka University. Dhaka.

Gorby, M.S.,(1994). "Arsenic in Human Medicine", Arsenic in environment, ***Jerome O. Nriagu,*** Vol. 27.

Hasan, Saywad Kamrul,(2003). Community Based Arsenic Action Research Project in Shibchar, Financed by UNICEF. Madwripur: Gano Unnawan Prochesta (GUP).

Dhaka University Institutional Repository

Irgolic, K.J. Goessler, W. and Kuehnelt, D.,(1998). "Arsenic Compounds in Terrestrial Biota", ***Proceedings of the Third International Conference on Arsenic Exposure and Health Effects,*** July, 12-15, San Diego, California, USA.

Khan, A. W. and Ahmed, Sk. A.,(2002). "Arsenic in Drinking Water: Health Effects and Management", ***Research Studies on Health Impact of Arsenic Exposure,*** Mohakhali, Dhaka: Bangladesh Medical Research Council (BMRC).

Khan, A.A., Imam, B., Akhter, S.H., Hazan, M.A., and Ahmed,K.M.,(1998). Research study report on subsurace investigation in the arsenic problem areas of Rajarampur, Chanial and Barogharia. Nawabgani Districts, Bangladsh.

Khan, A.W. Ahmad, S.A, Hadi, S.A, et al., (1997), Arsenic in Drinking water Health Effects and Management. A Training Manual Department of Occupational and Environmental Health, Dhaka: NIPSOM.

Khan, A.W. Ahmed, S.K.A, et al., (1997) Arsenic contamination in ground water & its effects on human health with particular reference to Bangladesh. Journal of Preventive & Social Medicine, Dhaka: JOPSOM.

Khan. A. W., and Ahmad, SK. A., (1997). Arsenic in drinking water: Health effects and management. A Training Manual.

Khopkar, S. M.,(1995). ***Environmental Pollution Analysis,*** New Delhi: New Age International (P) Limited.

Kothari, C.R.,(1986). Research Methodology and techniques. New Delhi: Willey Eastern Ltd.

Maidul, A.Z.M. Chronic arsenic toxicity & Skin problem in Bangladesh, J Dermatol, venero: leprol.

Mia, Mr. F.U.A., (1999). "Bangladesh Arsenic Mitigation Water Supply Project", ***The Bangladesh Observer,*** October 2.

NAS,(1977). ***Medical and biological effects of environmental Pollutants: Arsenic,*** Washington D.C. National Academy of Science.

Nriagu, J.O.,(1994). ***Arsenic in the Environment: Part 1,*** London: John Wiley & Sons.

Nriagu, J.O.; and Nazue, J.M., (1990). Food contamination with arsenic in the environmental. In: Nriagu, J.O. and Simmons M. S. (Ed.). *Food contamination from environmental sources.* 23.

Nrigu, J.O.,(1994). Arsenic in Environment Part II: Human health and Ecosystem Effects, Singapore willey, Inter science Publication.

Philp, R.B.,(1995). ***Toxicity of Metals, In Environmental Hazards and Human Health.***

Dhaka University Institutional Repository

Rashid, Firoz, (2004). Ground. water Arsenic contamination in Ramgonj, Lakshmipur: A Geo-Environmental Analysis Unpublished , M. Phil Thesis, University of Dhaka.

Rashid, H. Er.,(1991), ***Geography of Bangladesh,*** Dhaka: The University Press Limited, 114, Motijheel C/A, Bangladesh.

Saha, K.C,(1998). Diagnosis of Arsenicosis International conference on Arsenic pollution of Ground water in Bangladesh: cause Effects and Remedies.

Saha. B. C., (1978). Pusti Parichya. Muktadhara. 74 Farashganj. Dhaka.

Shaha, K.C,,(1995). Experience during early Eighties about arsenical dermatosis among the villagers in Some districts of west Bengla. Abstracts of the International conference on Arsenic in ground water, Calcutta: SOES.

Shehab Ahmed, (2001). Arsenic Contamination in Hathkopa", ***Bangladesh State of Arsenic 2001,*** The Second annual report on the country's state of Arsenic, Dhaka: Forum of Environmental Journalists of Bangladesh (FEJB).

Syed, A. S.,(1998). Introduction to Environmental Laws of Bangladesh, ACE DATA Products Dhaka.

Talukder, Dr. Md. H.K.,(1997). Study on Knowledge and Awareness on Arsenicosis among People in the Selected Affected & Non-affected Areas of Bangladesh, Unpublished MPH thesis in Occupational and Environmental Health, National Institute of Preventive and Social Medicine (NIPSOM), Mohakhali, Dhaka.

UNICFF.,(1964). Pusti Biddya. food and Nutrition Science Institute Dhaka: Dhaka University.

Vahter, M.,(1998). "Exposure to Arsenic During Early Human Development", ***Proceedings International Conference on Arsenic Pollution of Groundwater in Bangladesh: Causes, Effects and Remedies,*** Dhaka Community Hospital and School of Environmental Studies, Jadavpur University, Calcutta, India, February, 8-12, Dhaka: LGED Auditorium.

Watsan: Quarterly Newsletter of the NGO Forum for Drinking Water Supply & Sanitation, 31st Issue, October to December 1996.

WHO,(1984). ***Guidelines for Drinking Water Quality Volume 2: Health Criteria and Other Supporting Information,*** Geneva, Switzerland.

WHO,(2001). ***Environmental Health Criteria 224: Arsenic and Arsenic Compounds,*** 2nd edn.

Wilkinson, P. S & Bhanbankar, P.L.,(1986). Methodology and techniques of Social Research Bombay : Himalaya Publishing House.

Zaldiver, R.,(1974). Arsenic contamination of drinking water and foodstuffs causing endemic chronic Poisoning, ***Beitr, Pathol,*** Vol. 151.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

গ্রাম বাংলার আর্সেনিকোসিস রোগীদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ও মানসিক তথ্য সম্বলিত প্রশ্নমালা। শিবচর উপজেলা মাদারীপুর।

পারিবারিক তথ্যঃ

পরিবারের সদস্য ও রোগীর সংখ্যা	লিঙ্গ রোগী		রোগীর বয়স	বৈবাহিক অবস্থা (রোগী		রোগীর পেশা	রোগী পরিবারের মাসিক আয়	বাড়ির ধরণ	ধর্ম	আর্সেনিকোসিস রোগীর সংখ্যা	রোগীর শিক্ষা
	পুরুষ	মহিলা		বিবাহিত	অবিবাহিত						
											অশিক্ষা
											দস্তখত
											প্রাথমিক
											মাধ্যমিক
											উচ্চমাধ্যমিক

খ. রোগীর রোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। নাম .... পরিবার প্রধান কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

২। কবে/ কত বছর আগে আপনি আর্সেনিকোসিস রোগের লক্ষণগুলো লক্ষ্য করেন? ☐ বছর

৩। লক্ষণ গুলো সণাক্ত করণঃ(লক্ষণ অনুযায়ী নামে টিক ✓ দিন)

(ক) মেলানোসিস (খ) কেরাটোসিস (গ) কনজাংটিভাইটিস (ঘ) ব্রংকাইটিস

(ঙ) লিউকোমেলানোসিস (চ) নডিওলার হাইপার কেরাটোসিস (ছ) গ্যাংগ্রীন

৪। লক্ষণগুলো কি আপনি নিজেই প্রথম সণাক্ত করেছেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

৪.১। উত্তর 'না' হলে কে প্রথম সনাক্ত করেছেন ? (ক) বন্ধু বান্ধব (খ) প্রতিবেশী (গ) গ্রাম্য ডাক্তার (ঘ) সরকারী ডাক্তার

(ঙ) এন.জি.ও. কর্মী (চ) বন্ধু বান্ধব (ছ) হোমিও প্যাথিক (জ) বাড়ির অন্যান্য সদস্য কর্তৃক

৫। এই রোগ (আর্সেনিকোসিস) ধরা পড়ার পর আপনি কি করেছেন?

(ক) কিছুই করিনাই (খ) গ্রাম্য ডাক্তার দেখিয়েছি (গ) হাসপাতাল বা সরকারী ডাক্তার দেখিয়েছি।

(ঘ) হেকিম/কবিরাজ দেখিয়েছি (ঙ) হোমিও ডাক্তার দেখিয়েছি।

৬। কোন ডাক্তার বা কবিরাজ পরিবর্তন করেছেন কি? হাঁ ☐ না ☐

৬.১ । উত্তর হ্যাঁ হলে কেন?..?

৭। ডাক্তার বা কবিরাজের কারণে আপনার শরীরের অন্য কোন সমস্যা হয়েছে কি না? হাঁ ☐ না ☐

৭.১। উত্তর হ্যাঁ হলে কি কি সমস্যা উল্লেখ করুন? ....

৮। আপনি আর্সেনিকোসিস রোগকে জীবনের জন্য কেমন ঝুঁকি বলে মনে করেন?

(ক) খুব কম (খ) কম (গ) মাঝারী (ঘ) বেশী (ঙ) খুব বেশী

৯। আপনার মতে এই রোগের মূল কারণ কি? উল্লেখ ....

১০। এই রোগের (আর্সেনিকোসিস) কারণে আপনি আর কি কি রোগের সম্মুখীন হয়েছেন বলে মনে করেন।..............

১১। আপনার বাড়ীতে কোন নলকূপ আছে কি? হাঁ ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

১১.১। (ক) উত্তর হ্যাঁ হলে সেটা কি আর্সেনিকোসিস মুক্ত? হাঁ ☐ না ☐

১১.১.১। উত্তর না হলে কত বছর যাবৎ আপনি এই নলকূপের পানি পান করছেন? ☐ বছর

১১.২। নলকূপ না থাককে কোথাকার পানি পান করেছেন? (ক) পাশের বাড়ীর নলকূপ (খ) অন্যান্য ....

১১.২.১। সেই নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কি? হাঁ ☐ না ☐

১১.২.২। উত্তর হাঁ হলে কত বছর যাবৎ আপনি এই নলকূপের পানি পান করছেন? ☐ বছর

১২। পান করা ব্যতীত আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পান আর কি কি কাজে ব্যবহার করেছেন?

(ক) রান্না বান্না করা (খ) থালা বাসন ধোয়া (গ) কাচা ফলমূল ধোয়া (ঘ) কুল্লকুচি করা (ঙ) অন্যান্য.....................

১৩। আপনার বাড়ীর নলকূপে আর্সেনিক ধরা পড়ার পর তার পানি পান করা বন্ধ করেছেন কি? হাঁ ☐ না ☐

১৩.১। উত্তর না হলে কেন বন্ধ করেননি?..

১৪। আপনার বাড়ীর নলকূপটির গভীরতা উল্লেক করুন। ☐ গভীরতা ফুট

১৫। রোগীর পরিবারের বর্তমানে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত পানির উৎসঃ

কাজ	নিরাপদ পানি	দুষণযুক্ত পানি
রান্না করা		
তালাবাসন ধোয়া		
কুলকুচি/ওজু গোসল করা		
খাওয়ার আগে হাত ধোয়া		
পান্তাভাতের পানি		
টয়লেটে ব্যবহার		

গ রোগীর খাদ্যাভ্যাস বিষয়ক তথ্যঃ

১। আপনার খাওয়ার রুচি কেমন? (ক) ভালনা ☐ (খ) মোটামুটি ☐ (গ) ভাল ☐

২। এই রোগ ধরা পড়ার পর আপনার খাদ্যাভাসের কোন পরিবর্তন করেছেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

২.১। উত্তর হ্যাঁ হলে কি কি পরিবর্তন করেছেন উল্লেখ করুনঃ ....

৩। আপনি প্রতিদিন কতবার খাবার গ্রহণ করেন এবং কখন?

রোগ সণাক্তের পূর্বে ঃ........ বার সকাল ☐ দুপুর ☐ বিকাল ☐ রাত্র ☐

রোগসণাক্তের পর ....বার সকাল ☐ দুপুর ☐ বিকাল ☐ রাত্র ☐

৪। আপনি প্রতিদিন কোন কোন খাবার কি পরিমাণ খান?

খাবারের সময়	খাবারের নাম														
	গরম ভাত	পান্তা ভাত	রুচি	সব্জী	ডাল	ভাজী/ভর্তা					দুধ	ডিম	গুর	চিনি	অন্যান্য
							আলু	কলা	কচু						
সকাল															
পরিমান															
দুপুর															
বিকাল															
পরিমান															
রাত্র															
পরিমান															

৪.১। মোট খাদ্য শক্তি = ☐ কিলো ক্যালোরী

৫। উত্তরে শাক-শব্জি থাকলে কোন শাকটি আপনি বেশী খেয়েছেন? এবং বর্তমান খাচ্ছেন?

৫.১। পূর্বে

কচু	পুই	ডাটা	পালং	অন্যান্য

৫.২। বর্তমান

কচু	পুই	ডাটা	পালং	অন্যান্য

৬। আপনি যে শাক খান তা কোথায় পান? (ক) নিজেরা চাষ করেন (খ) বাজার হতে আনেন

৬.১। উত্তর 'ক' হলে কিভাবে চাষ করেন? (ক) সাধারণ ভাবে (খ) সেচের মাধ্যমে (গ) অন্যান্য

৬.১.১। উত্তর 'খ' হলে কিভাবে?

(ক) আর্সেনিক মুক্ত নলকূপের পানি (খ) আর্সেনিক যুক্ত নলকূপের পানি

(গ) আর্সেনিক মুক্ত পাম্পের পানি (ঘ) আর্সেনিক যুক্ত পাম্পের পানি (ঙ) অন্যান্য।

Dhaka University Institutional Repository

৭। আপনি প্রতিদিন (২৪ ঘন্টায়) কতটুকু পানি পান করেন ঃ লিটার

৮। আপনি প্রতিদিন (২৪ ঘন্টায়) কতটুকু হাটেন............. ঘন্টা।

৯. তিন দিনের গড় হাটার পরিমান বের করুন। .... ঘন্টা।

১০। আপনি ধুমপান বা নেশা সেবন করেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

ঘ. পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক তথ্যঃ

১। আপনার বাড়ীতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আছে কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

১.১। উত্তর হ্যা হলে পায়খানাটি কো ধরনের?

২। পরিবারের সদস্যদের 'স্বাস্থ্য সম্মত' পায়খানা ব্যবহার না করার কারণ কি?

(শুধু মাত্র অ-স্বাস্থ্যকর ঘরে টিক থাকলে এই প্রশ্ন প্রযোজ্য)

(ক) অসচেতনতা (খ) জায়গার অভাব (গ) অর্থের অভাব (ঘ) অন্যান্য.............

ঙ. স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক তথ্যঃ

১। নিরাপদ পানি পান না করলে কি কি রোগ হতে পারে? (উত্তর একাধিক হতে পারে)

(ক) ডায়রিয়া (খ) আমাশয় (গ) চর্মরোগ (ঘ) কৃষি (ঙ) আর্সেনিকোসিস

(চ) জন্ডিস (ছ) উপরের সবগুলো

২। গত একমাসে আপনার পরিবারের কারো ডায়রিয়া হয়েছে কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করলে কি ক্ষতি হয় আপনি জানেন কি? হ্যা ☐ না ☐

৪। খাওয়ার আগে আপনি হাত পরিষ্কার করেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

৪.১। হ্যাঁ হলে কিভাবে করেন? (ক) শুধু পানি (খ) সাবান (গ) ছাই/মাটি

৫। পায়খানা থেকে ফিরে আপনি কত পরিষ্কার করেন কি? হ্যা ☐ না ☐

৫.১। উত্তর হ্যা হলে কিভাবে করেন? (ক) শুধু পানি (খ) সাবান (গ) ছাই (ঘ) মাটি

৬। পায়খানায় যাবার সময় পরিবারের সকলেই স্যান্ডেল ব্যবহার করেন কি? হ্যা ☐ না ☐

৬.১। উত্তর না হলে কেন? ....

৭। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের পায়খানা কোথায় ফেলেন?

(ক) পায়খানায় (খ) বাগানে (গ) নির্দিষ্ট গর্তে (ঘ) যেখানে সেখানে (ঙ) কোথাও না (চ) অন্যান্য

৮। বাচ্চার মল পরিষ্কার করার পর আপনি হাত পরিষ্কার করেন কি? হ্যা ☐ না ☐

৮.১। উত্তর হ্যা হলে কিভাবে? (ক) শুধু পানি (খ) সাবান (গ) ছাই /মাটি

চ. সামাজিক তথ্যঃ

১। আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে আপনার সংসার থেকে পৃথক রাখা হয়েছিল কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

২। শারিরীক নির্যাতন করা হচ্ছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। বিবাহ কার্য কর্মে কি ধরনের সমস্যা হয় হ্যাঁ ☐ না ☐

৪.১। উত্তর হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা হয়?

(ক) বিবাহবিচ্ছেদ (খ) রোগের কথা শুনে --- (গ) যৌতুক দাবী করছে (ঘ) অন্যান্য

৫। বাপের বাড়িপাঠিয়ে দেওয়া হয় কি না হ্যাঁ ☐ না ☐

৬। বিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয় কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। চাকুরীতে কোন সমস্যা হয় কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে দাওয়াত দেওয়া হয় কি না?

৯। ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা কোন ফতুয়ার সম্মুখীন হয় কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আনি কি অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

১০.১। এই রোগের চিকিৎসার্থে আপনার কত টাকা খরচহচ্ছে?

১১.১। আর্সেনিকোসিস রোগের কারণে আপনার কাজকরতে অসুবিধা হয় কিনা ? হ্যাঁ ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

১২। আর্সেনিকোসিস রোগের জন্য আলাদা খেতে হয় কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৩। আপনার পরিবারে সবাই কি আপনার সাথে ভালো আচরণ করে? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৪। আর্সেনিকোসিসের কারণে আপনি কি বাইরে বেরুতে দ্বিধা বোধ করেন? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৫। এই রোগকে আপনি ছোয়াচে মনে করেন কি? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৬। আপনাকে কি আলাদা ঘরে বা বিছানায় রাখা হয়? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৭। আপনি নিজেকেই আলাদা করে রাখেন কি না হ্যাঁ ☐ না ☐

১৮। এই রোগের কারণে নিজেকে একাকিত্ব লাগে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৯। এই রোগের কারণে আপনার বিষাদগ্রস্থ লাগে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। এই রোগের কারণে আপনার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হচ্ছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

২১। এই রোগের কারণে নিজেকে কতটুকু স্বতঃস্ফুত মনে করেন

(ক) ভাল (খ) খুব বাল (গ) খারাপ (ঘ) খুব খারাপ

২২। আপনার প্রতি পরিবারের অন্যান্যদের ব্যবহার কেমন?

(ক) ভাল (খ) মুটামুটি ভাল (গ) ভাল না

২৩। এই রোগকে আপনি খোদা (আল্লাহ) প্রদত্ত গজব মনে করেন কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

২৪। এই রোগ হওয়ার পর পরিবারের কার দ্বারা আপনি বেশী আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন?

(ক) স্বামী-স্ত্রী (খ) বাবা-মা (গ) ছেরে-মেয়ে (ঘ) পাড়া-প্রতিবেশী

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ....

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ..

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

Arsenic Patient Identification and Management in 7 Upazila

Implemented by Dhaka Community Hospital

Supported by : UNICEF- Bangladesh

Upazila : Shibchar
District : Madaripur

Total Patient : 300
Male : 193 (69%), Female: 88 (31%)

Dhaka University Institutional Repository

Patient list of Shibchar Uapzila
Total Patient 300

SL	IDEN-DATE	NAMEOF PARIENT	HEAD OF FAMILY	AGE	SEX	VILLAGE	UNION	UPAZILA	DIST
1	28-Mar-2002	MD. LATIF MOLLAH	OWN	70	MALE	BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
2	17-Jan-2002	MD. LAL MIA HOWLADAR	OWN	55	MALE	BARA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
3	17-Jan-2002	MRS. NAJMA BEGUM	MD. SHOUKET MOLLAH	27	FEMALE	BARA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
4	19-Jan-2002	MRS ROKEYA BEGUM	KARIM	55	FEMALE	BARA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
5	19-Jan-2002	MRS. ROHIMON BEGUM	MOHAMMAD SHIKDAR	30	FEMALE	BARA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
6	19-Jan-2002	MRS. SURJAN BEGUM	OWN	40	FEMALE	BARA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
7	24-Jan-2002	MRS. RAHIMA BEGUM	MD. SABID ALI MADBAR	48	FEMALE	BARA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
8	30-Mar-2002	ABDUS SATTAR HOWLADA	OWN	50	MALE	CHAR GAJARIA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
9	12-Jan-2002	OJIFA BEGUM	ABDUL MANNAN BAPARY	55	FEMALE	CHAR GAZARIA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
10	15-Jan-2002	MD. MONIR HOSSAIN	ABDUR SATTAR HOWLAD	19	MALE	CHAR GAZARIA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
11	24-Jan-2002	MRS. GOLANUR BEGUM	KALU MADBAR	28	FEMALE	CHOTTA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
12	24-Jan-2002	MD. ABDUL KAIYUM	OWN	35	MALE	CHOTTA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
13	24-Jan-2002	MD. RASHID MOLLAH	OWN	55	MALE	CHOTTA BAHARATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
14	13-Jan-2002	MD. JAHANGIR HOSSAIN	MD JABBAR	32	MALE	GAZARIA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
15	16-Jan-2002	AMINUDDIN HOWLADAR	OWN	37	MALE	GAZARIA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
16	24-Jan-2002	MD. CHAN MIA	OWN	45	MALE	LOPTA SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
17	07-Jan-2002	MRS. ALEP JAN	OWN	45	FEMALE	MADBAR KANDI	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
18	14-Jan-2002	ALI AKBAR	OWN	40	MALE	SANARBAT	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
19	14-Jan-2002	SOHIDULLAH KHA	OWN	45	MALE	SANARBAT	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
20	15-Jan-2002	MRS. AMBIA KHATUN	ZIYAUR RAHMAN	26	FEMALE	SANARBAT	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
21	15-Jan-2002	ABDUR RASHID KHAN	OWN	70	MALE	SANARBAT	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
22	15-Jan-2002	MRS. PANCHA BIBI	MD. ABUL HOSSAIN	55	FEMALE	SANARBAT	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
23	06-Jan-2002	ABDUL KHALIK	OWN	55	MALE	SARDAR KANDI	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
24	24-Jan-2002	MD. SAMSU AKON	OWN	51	MALE	SARKAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
25	24-Jan-2002	DALOWAR HOSSAIN	OWN	40	MALE	SARKAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
26	15-Jan-2002	MD. KUDDUS MIA	SHAHABUDDIN	16	MALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
27	15-Jan-2002	MD. SOLIMAN FAKIR	OWN	60	MALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
28	16-Jan-2002	MRS. FULL MAHAR	LATE MD. ANU	50	FEMALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
29	16-Jan-2002	RAHIMUN BEGUM	HOBIUDDIN	50	FEMALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
30	16-Jan-2002	GIUS UDDIN KHALASI	OWN	63	MALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
31	16-Jan-2002	HARUN HOWLADAR	OWN	34	MALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
32	16-Jan-2002	IBRAHIM HOWLADAR	OWN	41	MALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
33	16-Jan-2002	SAKANDAR	OWN	55	MALE	SARKARAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
34	12-Jan-2002	MD. HABIBUR RAHMAN	OWN	28	MALE	VENNATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
35	12-Jan-2002	MRS. KHINUR BEGUM	LATE SAHABUDDIN AKO	38	FEMALE	VENNATALA	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
36	03-Jan-2002	MD. HOBI AKON	OWN	45	MALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
37	05-Jan-2002	ABDUL KUDDUS MADBAR	OWN	60	MALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
38	05-Jan-2002	SYFUN NESA	MD. JABBAR MOLLAH	55	FEMALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
39	07-Jan-2002	NAJMA	OWN	45	FEMALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
40	08-Jan-2002	MRS. HALIMON NASA	ABDUR RAZZAK	45	FEMALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
41	09-Jan-2002	MD SIDDIQE SHIKDAR	OWN	33	MALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
42	09-Jan-2002	MRS. ALEYA BEGUM	ABUL HOSSAIN	40	FEMALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR

43	10-Jan-2001	ABDUL LATIF	OWN	60	MALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
44	10-Jan-2002	OSMAN TALUKDAR	OWN	45	MALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
45	10-Jan-2002	MD LAL MIA	OWN	60	MALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
46	10-Jan-2002	MRS. AMIRUN NASA	ABDUS SALAM GAZI	50	FEMALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
47	10-Jan-2002	MRS. AKIMON NASA	MD. OHAB GAZI	45	FEMALE	ZADUWAR CHAR	BAHARATALA	SHIBCHAR	MADARIPUR
48	28-Mar-2002	NAYA MIR	OWN	45	MALE	PASCHIM SARDAR CHAR	BANDAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
49	07-Feb-2002	SAKANDAR SHAKH	OWN	50	MALE	BAPARY KANDI	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
50	10-Feb-2002	MUSTAFA KHA	OWN	55	MALE	CHAR SHAKH PUR	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
51	14-Feb-2002	MRS. SALEHA BEGUM	MOSHARAF MADBAR	37	FEMALE	KHALIFA KANDI	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
52	14-Feb-2002	MRS. RUBIYA BEGUM	MD. MORSHID	39	FEMALE	KHALIFA KANDI	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
53	09-Feb-2002	MD. ABUL KHAN	OWN	41	MALE	MADBAR KANDI	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
54	04-Feb-2002	MD. ASRIF ALI	KHABIR UDDIN	37	MALE	MERJA KANDI	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
55	05-Feb-2002	MD. GOWAS MADBAR	OWN	28	MALE	MERJA KANDI	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
56	05-Feb-2002	MD. AFTAB UDDIN	OWN	50	MALE	MREJA NAGAR	BAS KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
57	13-Mar-2002	MRS. SHAHIMA KHATUN	MD. HARUN CHAKIDAR	29	FEMALE	CHAR BACHA MARA	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
58	16-Mar-2002	JOYTAN BEGUM	MD. ALAM MIA	35	FEMALE	BACHA MARA WARD NO 2	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
59	30-Mar-2002	BABU AKON	OWN	37	MALE	BACHAMARA	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
60	14-Mar-2002	MRS. RAHIMAN KHATUN	QUHINUR HOWLADAR	28	FEMALE	BADSHA KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
61	14-Mar-2002	MD. MOSLAM AKON	OWN	45	MALE	BADSHA KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
62	16-Mar-2002	MD. SIKIM ALI AKAN	OWN	36	MALE	BADSHA KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
63	17-Mar-2002	ELA UDDIN QUAZI	OWN	52	MALE	BADSHA KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
64	17-Mar-2002	ANWAR QUAZI	OWN	54	MALE	BADSHA KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
65	17-Mar-2002	NURU UDDIN LAKTI	OWN	50	MALE	BADSHA KANDI (CHAR CHAMRA	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
66	17-Mar-2002	NURU UDDIN QUAZI	OWN	50	MALE	BADSHA KANDI/WARD NO	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
67	16-Mar-2002	SIRAJ MOLLA	OWN	35	MALE	BAJE HAR CHAR	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
68	30-Mar-2002	MRS. JAYGUN BIBI	SHAMSUDDIN MIA	55	FEMALE	CHAR BACHAMARA	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
69	16-Mar-2002	MD. YOUNUS MATBAR	OWN	45	MALE	CHAR BACHAMARA BADSHA KA	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
70	14-Mar-2002	ABDUL JABBAR MUNSHI	OWN	62	MALE	CHAR KA CHAMARA TALUKDAR	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
71	13-Mar-2002	MD. ABDUR ROUF	OWN	35	MALE	ERFAN FARAZIR KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
72	06-Mar-2002	SRI DASHARAT CHANDA G	OWN	60	MALE	GUFA GAZI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
73	16-Mar-2002	MAMATAJ BEGUM	MD. BABU AKAN	45	FEMALE	MAMATAJ UDDIN KHAN KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
74	19-Mar-2002	ALAUDDIN MRIDHA	OWN	65	MALE	MRIDHA KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
75	16-Mar-2002	HARA KRISTA MANDAL	OWN	55	MALE	NAMA KANDI BANCHA MARAQ	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
76	13-Mar-2002	KAMALJA	TOTA BAPARY	29	FEMALE	SHIKDAR KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
77	14-Mar-2002	SHAMSUDDIN AKAN	OWN	62	MALE	TAUKDAR KANDI	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
78	05-Mar-2002	CHOWDHURY WAHIDUZ Z	OWN	52	MALE	TAZ PUR(SIDDIQ CHOWDHURY	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
79	17-Mar-2002	ALHAJ HALIM CHOWDHUR	OWN	62	MALE	UTTAR CHAR TAJAPUR CHOWD	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
80	12-Mar-2002	ABDUL OHUB CHOWDHUR	OWN	62	MALE	UTTAR TAZ PUR CHOWDHURY	DATTA PARA	SHIBCHAR	MADARIPUR
81	10-Dec-2001	KAZIA BEGUM	ABDUL KADIR	45	MALE	CHAR GUYATALA	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
82	10-Dec-2001	SHUKKUR FAKIR	OWN	65	MALE	CHAR GUYATALA	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
83	23-Dec-2001	MD. YOUNUS ALI	OWN	48	MALE	CHAR GUYATALA	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
84	23-Dec-2001	KALAI KHAN	OWN	45	MALE	CHAR GUYATALA	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
85	29-Dec-2001	MD. HAKIM ALI BAPARY	OWN	60	MALE	DEGREE CHAR	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
86	29-Dec-2001	MOYNA BIBI	LATE AMIR MADBAR	55	FEMALE	DEGREE CHAR	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
87	10-Dec-2001	SHOKHILA BEGUM	LATE ANOWAR MONSHI	40	FEMALE	MALAR KANDI	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
88	31-Dec-2001	MD. DALIL UDDIN	OWN	55	MALE	MALAR KANDI	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR

Dhaka University Institutional Repository

89	10-Dec-2001	MD. RABI MORAL	OWN		42	MALE	MORAL KANDI	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
90	09-Dec-2001	MOJIDUNNASA BEGUM	CHANDU AKON		40	FEMALE	SHIKDAR KANDI	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
91	27-Dec-2001	MD. AZIZUL HUQ	OWN		45	MALE	SHIKDAR KANDI	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
92	23-Dec-2001	MONOWARA BEGUM	MD. ANSAR ALI		60	FEMALE	TALUKDAR KANDI	DETIYA KHANDA	SHIBCHAR	MADARIPUR
93	03-Apr-2002	MAFAJJAL HOSSAIN	OWN		35	MALE	SHEIKHDAR KANDI	DETIYA KHANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
94	27-Feb-2002	MD. JABBER DEOYAN	OWN		65	MALE	DEOYAN KANDI	KATHAL BARI	SHIBCHAR	MADARIPUR
95	19-Feb-2002	ISMAIL BAPARY	OWN		60	MALE	HAZI OMAR ALI BAPARY KANDI	KATHAL BARI	SHIBCHAR	MADARIPUR
96	03-Mar-2002	ABDUR RASHID MOLLAH	OWN		55	MALE	KASIM MUNSHI GRAM	KATHAL BARI	SHIBCHAR	MADARIPUR
97	10-Feb-2002	ABDUL AZIZ SHIKDAR	OWN		50	MALE	SHIKDAR KANDI	KATHAL BARI	SHIBCHAR	MADARIPUR
98	18-Feb-2002	MRS. SHAHINA BEGUM	MD. ANIS HOWLADAR		22	FEMALE	FAJLU BAPARY KANDI	KUTUBPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
99	04-Mar-2002	MD. SAMSUJJAMAN	OWN		52	MALE	DARAR CHAR	MATBAR CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
100	04-Mar-2002	MES. NURUN NAHAR JAMA	MD. SAMSUJJAMAN		40	FEMALE	DARAR CHAR	MATBAR CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
101	04-Mar-2002	ABUL KHAYER	MD. SAMSUZ ZAMAN		18	MALE	DARAR CHAR	MATBAR CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
102	28-Mar-2002	MRS. MAHARUNNESA	BARIK MOLLAH		32	FEMALE	BAGMARA	NILKHI	SHIBCHAR	MADARIPUR
103	09-Mar-2002	MD. KHAJA JASIM UDDIN	MD KHAJA NAOSHIR ALI		21	MALE	NILKHE BANDAR	NILKHI	SHIBCHAR	MADARIPUR
104	28-Mar-2002	MRS. YEARUNNASA	KALAM MATBAR		30	FEMALE	PURBO NILKHI BANDAR	NILKHI BANDAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
105	29-Jan-2002	MD. KALU KHA	OWN		60	MALE	ALA PUR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
106	29-Jan-2002	MOTI MADBAR	OWN		45	MALE	ALA PUR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
107	26-Jan-2002	MD. ABDUL JABBAR	OWN		41	MALE	CHAR KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
108	29-Jan-2002	MD. ABDUL MAJID	OWN		55	MALE	CHAR RAM RAYAR KANDI	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
109	31-Jan-2002	FAJLUL HUQ HOWLADAR	OWN		40	MALE	JOGDAR MATH	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
110	26-Jan-2002	MD HABIBUR RAHMAN BA	OWN		45	MALE	OMADPUR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
111	25-Mar-2002	BADAL DATTA	RAMIS DATTA		50	MALE	PASCHIM KACHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
112	30-Jan-2002	ANONDA CHANDRA	OWN		40	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
113	30-Jan-2002	SUPRIA RANI DEY	MAHANANDA DEY		35	FEMALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
114	30-Jan-2002	NARAYAN CHANDRA DEY	OWN		30	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
115	30-Jan-2002	BIPUL DEY	OWN		29	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
116	30-Jan-2002	KAJALI BALA	SUBAS CHANDA		50	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
117	30-Jan-2002	BISHWAJIT DAS	BIJOY DAS		31	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
118	30-Jan-2002	BISEMWAR DAS	OWN		35	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
119	07-Feb-2002	SHREE SHUKUMAR DEY	OWN		50	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
120	31-Jan-2002	GOPAL DAS	OWN		40	MALE	PASCHIM KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
121	26-Jan-2002	MRS. ASAIA BEGUM	MD. FIROJ HOWLADAR		28	FEMALE	POLLA QUMIR PAR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
122	30-Jan-2002	MD. HATIM HOWLADAR	OWN		45	MALE	POLLA QUMIR PAR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
123	30-Jan-2002	MS. MONIRA KHATUN	HATIM HOWLADAR		23	FEMALE	POLLA QUMIR PAR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
124	30-Jan-2002	MS. KANIJ FATIMA	MD. HATIM HOWLADAR		19	FEMALE	POLLA QUMIR PAR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
125	26-Jan-2002	JAHANGIR HOWLADAR	OWN		45	MALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
126	26-Jan-2002	MRS. LILI AKTAR	JAHANGIR HOWLADAR		38	FEMALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
127	27-Jan-2002	MD. ANOWAR HOWLADAR	OWN		50	MALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
128	27-Jan-2002	MD. MAJIBER RAKIR	OWN		36	MALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
129	27-Jan-2002	MD. NUR ISLAM	OWN		47	MALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
130	29-Jan-2002	MRS. HALIMA BEGUM	ABDUL JABBAR		50	FEMALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
131	29-Jan-2002	MRS. SATARA BEGUM	NUR ISLAM		40	FEMALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
132	29-Jan-2002	MD. HARUN-UR-RASHID	OWN		50	MALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
133	29-Jan-2002	MRS. ONGUR NAHAR	NURUL AMIN		35	FEMALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
134	30-Jan-2002	GOPAL	OWN		60	MALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR

Dhaka University Institutional Repository

135	31-Jan-2002	SOBITA	SAKAR SHIL	32	FEMALE	PROBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
136	24-Mar-2002	MOMIN UDDIN SIPAHI	OWN	62	MALE	PURBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
137	26-Mar-2002	RAHANA BEGUM	KABIR CHOKIDAR	25	FEMALE	PURBO KANCHIKATA	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
138	29-Jan-2002	MRS. MAYA RANI	SHANTI BARAI	30	FEMALE	QUMIR PAR	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
139	02-Feb-2002	MRS. AMINA BIBI	ABDUL HUQ	60	MALE	RAM ROYAR KANDI	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
140	02-Feb-2002	BEJAN KUMAR	OWN	50	MALE	RAM ROYAR KANDI	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
141	03-Feb-2002	MRS. REBA ISLAM	SHOHIDUL ISLAM	23	FEMALE	RAM ROYAR KANDI	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
142	15-Mar-2002	ABDUL HAQ MUNSHI	OWN	45	MALE	SABAK RAMRAYER KANSHI	OMADPUR	SHIBCHAR	MADARIPUR
143	09-Feb-2002	MRS. MEHER JAN	MD. FAJLUR RAHMAN	30	FEMALE	BAHADURPUR	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
144	19-Feb-2002	MRS. FAHIMA KHATUN	ABDUL AHAD	24	FEMALE	BAHADURPUR	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
145	19-Feb-2002	MRS. ALEYA KHATUN	MD. ELIYAS ALI	30	FEMALE	BAHADURPUR KHAN KANDI	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
146	09-Feb-2002	MRS. JAMILA KHATUN	ABUL KHALIK MUNSHI	55	FEMALE	BANG CHARA	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
147	09-Feb-2002	ABDUL SALAM MUNSHI	ABDUL KHALIK MUNSHI	35	MALE	BANG CHARA	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
148	09-Feb-2002	JULHAS MIA	ABDUL KHALIK MUNSHI	30	MALE	BANG CHARA	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
149	09-Feb-2002	MANJU DAS	NARAYAN DAS	35	FEMALE	BARO BAHADURPUR	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
150	11-Feb-2002	MRS. ALEYA BEGUM	MD. IDRIS ALI BAPARY	34	FEMALE	BARO DOYALI	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
151	12-Feb-2002	MRS. FATEMA BEGUM	MD. JAHANGER KHA	25	FEMALE	MAJHI KANDI	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
152	11-Feb-2002	MRS. BEGUM KHATUN KA	OWN	45	FEMALE	SONA POTTI	PACH CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
153	04-Nov-2001	MD. RASTOM BAPARE	OWN	59	MALE	BASUNDARA ABASIK ARI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
154	04-Nov-2001	ABDUL MALIK BAPARI	OWN	35	MALE	BASUNDARA ABASIK ARI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
155	04-Nov-2001	MD. ALTAB HOSSAIN	OWN	45	MALE	BASUNDARA ABASIK ARI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
156	04-Nov-2001	MD. LITON	MD. MOKSAD MATABBAR	21	MALE	CHAR GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
157	06-Nov-2001	MD. BARIK SHIKDER	OWN	50	MALE	CHAR GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
158	24-Nov-2001	MRS. ANOWARA BEGUM	DALOWAR MAHBUB KHA	45	FEMALE	GAN KANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
159	24-Nov-2001	BIDYUT KHAN	DALOWAR MAHBUB KHA	24	MALE	GAN KANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
160	13-Nov-2001	MD. AYUB ALI KHAN	MOMREJ KHAN	34	MALE	GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
161	13-Nov-2001	SUNIL DAS	OWN	49	MALE	GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
162	15-Nov-2001	MRS. AKHI	GUSHIS UDDIN	40	FEMALE	GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
163	05-Nov-2001	MD. ABDUR MALIK SHIKDE	OWN	47	MALE	GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
164	05-Nov-2001	MD. JASIM MIA	OWN	40	MALE	GUYATALA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
165	10-Nov-2001	MD HASIM MOLLAH	OWN	60	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
166	10-Nov-2001	ABDUL HALIM	OWN	60	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
167	10-Nov-2001	MD. ROSTAM QUIZI	OWN	50	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
168	10-Nov-2001	MD. SHAMSUL HUQ MIA	OWN	52	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
169	13-Nov-2001	MD. OLIL	HAZI ABDUL KUDDUS	30	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
170	13-Nov-2001	AINUDDIN HOWLADAR	OWN	50	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
171	13-Nov-2001	JANNAT ALI SHEIKH	OWN	48	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
172	13-Nov-2001	MRS. JULAKHA BIBI	MD. KADIR SARKAR	40	FEMALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
173	15-Nov-2001	INSAN UDDIN TALUKDAR	OWN	56	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
174	15-Nov-2001	ALIMADDI HSAKH	OWN	57	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
175	21-Nov-2001	ABDUL MANNAN	OWN	65	MALE	GUYATALA BAHERCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
176	06-Nov-2001	MD. KAYAMAT ALI	OWN	65	MALE	JADUWAR CHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
177	06-Nov-2001	SAKANDER KHA	OWN	55	MALE	JADUWARCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
178	04-Nov-2001	MD. SIDDIKUR RAHMAN	OWN	48	MALE	JADUWARCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
179	04-Nov-2001	MD. MASLAM MOULADER	OWN	70	MALE	JADUWARCHAR	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
180	18-Nov-2001	INSAN BAPARI	OWN	55	MALE	KARANIBAT	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR

Dhaka University Institutional Repository

181	24-Nov-2001	MD. HAIDAR RAHMAN	GAJIAR RAHMAN	35	MALE	KHAN KANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
182	24-Nov-2001	YEADUL ISLAM	ALTAB HOSSAIN KHAN	23	MALE	KHAN KANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
183	25-Nov-2001	ABDUL KARIM MUNSHI	OWN	50	MALE	KHAN KANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
184	12-Feb-2002	ABDUL HALIM MIA	OWN	60	MALE	NALGORA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
185	26-Mar-2002	MD. RAFIQUL ISLAM KHAN	DR. HABIBUR RAHMAN K	20	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
186	27-Mar-2002	MRS. SAJIDA BEGUM	DR. HABIBUR RAHMAN K	40	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
187	27-Mar-2002	RATON	OWN	45	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
188	22-Nov-2001	MD. NUR UDDIN SHAKH	OWN	55	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
189	22-Nov-2001	SORAP AKON	OWN	33	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
190	22-Nov-2001	RAHAMALI IAQUB	OWN	45	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
191	24-Nov-2001	ROFEYA BEGUM	LAL MIA BAPARI	45	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
192	26-Nov-2001	ABDUL KADIR MOLLAH	OWN	65	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
193	26-Nov-2001	ANISUNNASA	SHEKIM ALI MOLLAH	50	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
194	26-Nov-2001	MD.ROB MIA	OWN	40	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
195	26-Nov-2001	MD. ABDUL KALAM	OWN	28	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
196	26-Nov-2001	MD. SURUS MIA	OWN	30	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
197	26-Nov-2001	HASINA AKTER	MOSLIM MUNSHE	18	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
198	27-Nov-2001	MD. HOSSAIN MOLLAH	OWN	35	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
199	27-Nov-2001	MRS. RABIYA BEGUM	ABDUS SAMAD	45	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
200	27-Nov-2001	MRS JOBEDA KHATUN	RAHIM KHAN	45	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
201	27-Nov-2001	HALIM MATABBAR	OWN	50	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
202	27-Nov-2001	MD. DALOWAR HOSSAIN	OWN	56	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
203	27-Nov-2001	MRS. NAZMA	MD SALAM	27	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
204	27-Nov-2001	NUR ISLAM BAPARY	OWN	72	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
205	27-Nov-2001	MD. FARID HOSSAIN	MD. RATON SHAKH	26	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
206	27-Nov-2001	MD. FARID AKON	OWN	55	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
207	28-Nov-2001	SHEBU MALO	OWN	28	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
208	28-Nov-2001	BEAUTY RANI	GOPAL SHIL	18	FEMALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
209	28-Nov-2001	MD. LAL CHAND MIA	OWN	45	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
210	28-Nov-2001	MD. SHERAJUL ISLAM	OWN	43	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
211	28-Nov-2001	HABIBUR RAHMAN KHAN	OWN	50	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
212	28-Nov-2001	MD. JASIM UDDIN KHA	OWN	40	MALE	NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
213	27-Nov-2001	MD. SAKANDAR AKON	OWN	48	MALE	NOLGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
214	26-Mar-2002	MD. UJJAL	MD. ALI BOX BAPARY	19	MALE	PASCHIM NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
215	27-Nov-2001	MD. KABIR HOWLADAR	OWN	53	MALE	PASCHIM NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
216	27-Nov-2001	MRS. NIRU BIBI	KABIR HOWLADAR	45	FEMALE	PASCHIM NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
217	27-Nov-2001	MD. JOYNAL HOWLADAR	MD. KABIR HOWLADAR	18	MALE	PASCHIM NALGURA	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
218	27-Mar-2002	MD. ELIYAS KHA	MD. OYACHER KHA	35	MALE	PURBO SAMAIL	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
219	06-Apr-2002	MD. ANOWAR KHAN	OWN	42	MALE	PURBO SAMAIL	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
220	06-Apr-2002	MD. KINAI KHA	OWN	68	MALE	PURBO SAMAIL	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
221	29-Nov-2001	MD. MONIRUZZAMAN	LATE MOFIJ UDDIN	30	MALE	PURBO SHAMAIL	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
222	02-Dec-2001	MD.MAHBUB MRIDHA	OWN	35	MALE	PURBO SHAMAIL	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
223	06-Nov-2001	MD. HATAM MIA	OWN	63	MALE	SAWSTHA COLONI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
224	15-Nov-2001	MD. ABDUL AZIZ	LATE SHAMSUL HUQ	25	MALE	SHIBRAY KANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
225	06-Nov-2001	MD. HUMAYAN KABIR	OWN	40	MALE	SHIBROYARKANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR
226	06-Nov-2001	MD SAKAN MADBER	OWN	45	MALE	SHIBROYARKANDI	PAURASABHA	SHIBCHAR	MADARIPUR

Dhaka University Institutional Repository

227	13-Mar-2002	NURUL ISLAM	OWN		40	MALE	BISAI MADBAR KANDI (7)	SANNASIR CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
228	06-Mar-2002	MAMTAJ BEGUM	LAL MIA SHEIKH		45	FEMALE	MATBAR KANDI	SANNASIR CHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
229	12-Mar-2002	MRS. MANJURA BEGUM	ABDUL WAHUB KHAN		42	FEMALE	UTTR CHAR BACHA MARA PAB	SANNASIR CHAR W	SHIBCHAR	MADARIPUR
230	16-Mar-2002	JAYTON NESA	OWN		45	FEMALE	SHERUIL	SHERUIL	SHIBCHAR	MADARIPUR
231	12-Mar-2002	MRS. SAHIRA KHATUN	ABDUL ROB BAPARY		45	FEMALE	UTRAIL	SHERUIL	SHIBCHAR	MADARIPUR
232	10-Mar-2002	ROKEYA BEGUM	MD. RATAN KHA		40	FEMALE	UTRAIL	SHERUIL	SHIBCHAR	MADARIPUR
233	01-Dec-2001	RAHMAN MRIDHA	OWN		65	MALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
234	01-Dec-2001	MRS. MONOWARA KHATU	MD. ANSAR MADBAR		40	FEMALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
235	01-Dec-2001	NAJMA BEGUM	NOYAN HOWLADAR		45	FEMALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
236	01-Dec-2001	MD. ANOWAR MADBAR	OWN		55	MALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
237	01-Dec-2001	MD. CHAN MIA MADBAR	OWN		58	MALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
238	01-Dec-2001	MD. ABDUL ALAM	ABDUL KHALIK		30	MALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
239	01-Dec-2001	MD. FOJLUL RAHMAN	OWN		50	MALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
240	02-Dec-2001	MD ANSAR UDDIN	OWN		50	MALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
241	04-Dec-2001	REBA BEGUM	MD. NAZRUL MADBER		20	FEMALE	CHAR SAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
242	04-Dec-2001	MD. SOWDAR ALI MATBAR	OWN		50	MALE	CHAR SHAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
243	29-Nov-2001	JOYNAL HOWLADAR	OWN		60	MALE	CHAR SHAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
244	21-Nov-2001	MD JALAL KHA	OWN		33	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
245	29-Nov-2001	MD NAWAB ALI SHORIF	OWN		51	MALE	UTTAR SHAMAIL	SHIBCHAR	SHIBCHAR	MADARIPUR
246	20-Nov-2001	MD. BABUL KHAN	MD. ANOWAR KHAN		17	MALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
247	20-Nov-2001	MRS. ROZINA AKTER	MD. SAKANDAR ALI KHA		26	FEMALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
248	20-Nov-2001	SHEMULA BEGUM	MD. SHEKIM KHAN		26	FEMALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
249	20-Nov-2001	OJUFA BEGUM	MD. ANSER SHIKDER		40	FEMALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
250	20-Nov-2001	SANOWARA BEGUM	MD. SHERIJ SHIKDAR		30	FEMALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
251	27-Nov-2001	MD. DALOWAR HOSSAIN	OWN		35	MALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
252	27-Nov-2001	SHREE HAREKRISHANA	OWN		70	MALE	NALGURA	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
253	20-Nov-2001	MD. RAHIM UDDIN DALI	OWN		45	MALE	NALGURA PURBO SHASAL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
254	21-Nov-2001	MAIN UDDIN KHA	OWN		55	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
255	21-Nov-2001	ABDUR RAZZAK MUNSHI	ABDUL KHALIK		30	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
256	21-Nov-2001	MD. ABDUL KADIR SHARIF	MD ALI SHARIF		24	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
257	21-Nov-2001	MD. LITON KHA	OWN		45	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
258	25-Nov-2001	ANOWAR HOSSAIN QUIZI	ABDUL GOFUR QUIZI		26	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
259	26-Nov-2001	MARZINA	MD LATIF KHA		35	FEMALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
260	26-Nov-2001	MRS SALEHA	SOBOL KHA		50	FEMALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
261	26-Nov-2001	MRS. JABEDA	MD SHAMSUL KHA		60	FEMALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
262	22-Nov-2001	MD MAHIN UDDIN	OWN		45	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
263	22-Nov-2001	MD. MOIN UDDIN KHA	OWN		32	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
264	22-Nov-2001	MD. DULU KHAN	OWN		45	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
265	22-Nov-2001	MRS. TAZIYA BEGUM	MD. HAFIZ MIA		40	FEMALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
266	21-Nov-2001	MD. ABDUL DABIR KHA	OWN		50	MALE	PURBO SHAMAIL	SHIBCHARPAURASA	SHIBCHAR	MADARIPUR
267	04-Feb-2002	MRS. SAYARAN BIBI	KHALIK MORAL		50	FEMALE	DEGREE CHAR	VADRASAN	SHIBCHAR	MADARIPUR
268	04-Feb-2002	ANOWAR HOSSAIN	OWN		55	MALE	MOLLAH KANDI	VADRASAN	SHIBCHAR	MADARIPUR
269	04-Feb-2002	ABDUL MANNAN MOLLA	OWN		40	MALE	MOLLAH KANDI	VADRASAN	SHIBCHAR	MADARIPUR
270	04-Feb-2002	MD. ANOWAR HOSSAIN	OWN		43	MALE	TATI PARA	VADRASAN	SHIBCHAR	MADARIPUR
271	11-Feb-2002	AKHAIL CHAKRABATI	OWN		52	MALE	VADRASAN	VADRASAN	SHIBCHAR	MADARIPUR
272	11-Feb-2002	ABDUR SATTAR	OWN		50	MALE	CROKCHAR VADRASAN	VADRASAN 7 NO	SHIBCHAR	MADARIPUR

Dhaka University Institutional Repository

273	11-Feb-2002	RUPBAN BAWAYA	SONA MIA	41	FEMALE	CROKCHAR VADRASAN	VADRASAN 7 NO	SHIBCHAR	MADARIPUR
274	10-Feb-2002	SERIN AKTAR	NUR JAHAN BEGUM	27	FEMALE	CROKCHAR BAPARY KAND	VADRASAN 8 NO	SHIBCHAR	MADARIPUR
275	16-Feb-2002	ROKAYA BEGUM	MOHAMMAD SHORIF	30	FEMALE	SHORIF KANDI 7NO	VANDARI KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
276	06-Mar-2002	MD BADHSA	LATE NURCHAN MADBAR	35	MALE	TANGRAMARI	VANDARI KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
277	05-Mar-2002	MD ANFAR	LATE NURCHAN MADBAR	26	MALE	TANGRAMARI	VANDARI KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
278	13-Feb-2002	MANNAN HOWLADAR	OWN	60	MALE	VANDARY KANDI	VANDARI KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
279	13-Feb-2002	MOTIUR RAHMAN HOWLAI	OWN	52	MALE	VANDARY KANDI	VANDARI KANDI	SHIBCHAR	MADARIPUR
280	16-Feb-2002	NURUL ISLAM	OWN	38	MALE	SHORIF KANDI	VANDARY KANDI 7 N	SHIBCHAR	MADARIPUR
281	13-Feb-2002	SHREE SALANDA MONDAL	SHREE DULAL MONDAL	20	MALE	CROKCHAR	VANDARY KANDI 8 N	SHIBCHAR	MADARIPUR

উৎস ঃ ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতাল, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

List of villages with at least 10 patients

Sl. No.	District	Thana	Union	Village	Total Pop	Total Patient	Patient per thousand
1	Satkhira	Tala	Jalalpur	Kumira	3888	214	55.04
2	Noakhali	Begumgonj	Amanullapur	Lakuriakandi	781	99	126.76
3	Chuadnga	Alomdanga	Nagbaha	Benagari	121	97	801.65
4	Laxmipur	Raipur	Sadar	Carroya	24462	96	3.92
5	Pabna	Ishwardi	Pakshi	Charruppur	7570	69	9.11
6	Jessore	Keshabpur	Bidyanandakati	Dakhin Chandipur	1698	62	36.51
7	Pabna	Sujanagor	Jatsakini	Uttar Saidpur	2089	61	29.20
8	Chuadanga	Alomdanga	Nagbaha	Takpara	678	56	82.60
9	Kushtia	Bheramara	Mokarrampur	Ramkrishnapur	1960	56	28.57
10	Chandpur	Sadar	Sadar	Lodargaon	3692	54	14.63
11	Pabna	Ishwardi	Pakshi	Bilkeda	1992	54	27.11
12	Jessore	Keshabpur	Bidyanandakati	Purbachandipur	2083	51	24.48
13	Nawabganj	Sadar	Sadar	N Rajarampur	4765	46	9.65
14	Pabna	Sujanagor	Jatsakini	Bora Ahmedpur	3604	46	12.76
15	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Delorbagh	824	44	53.40
16	Satkhira	Tala	Jalalpur	Krishnakathi	1270	43	33.86
17	Laxmipur	Laxmipur	Municipality	Bashikpur	3497	38	10.87
18	Pabna	Sujanagor	Jatsakini	Saidpur	3151	32	10.16
19	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Charlal	644	29	45.03
20	Chandpur	Hajiganj	Sadar	Hazigonj	7682	28	3.64
21	Jessore	Keshabpur	Bidyanandakati	Uttarchandipur	1882	28	14.88
22	Jessore	Keshabpur	Bidyanandakati	Farmaiskhana	1804	28	15.52
23	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Changa kandi	923	26	28.17
24	Chandpur	Hajiganj	Razergaon	Mukunadswar	1748	26	14.87
25	Jessore	Keshabpur	Bidyanandakati	Shugandhi	521	26	49.90
26	Noakhali	Chatkhil	Chatkhil	Jatrapara	1211	26	21.47
27	Narayangonj	Sonargaon	Samvopur	Alahi Nagar	2033	25	12.30
28	Barishal	Sadar	Charbaria	Sapania	1358	23	16.94
29	Noakhali	Begumgonj	Nateswar	Gonipur	2856	22	7.70

Dhaka University Institutional Repository

Sl. No.	District	Thana	Union	Village	Total Pop	Total Patient	Patient per thousand
30	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Tajpur	347	22	63.40
31	Laxmipur	Laxmipur	Municipality	Talhati	603	21	34.83
32	Bagerhat	Fakirhat	Fakirhat	Pagla Diarpara	1932	21	10.87
33	Meherpur	Sadar	Kutubpur	Shazipara	287	20	69.69
34	Chandpur	Hajiganj	Razergaon	Radhunimura	1880	20	10.64
35	Magura	Sadar	Kasandi	Paranduali	7888	20	2.54
36	Kushtia	Bheramara	Mokarrampur	Naodakhamirdi-ar	1884	20	10.62
37	Faridpur	Nagarkanda	Ramnagor	Dabinager	709	19	26.80
38	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Hossainpur	788	17	21.57
39	Faridpur	Sadar	Ambikapur	Griha Laxmipur	2733	17	6.22
40	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Hatkopa	793	16	20.18
41	Faridpur	Bhanga	Hamerdi	Munsurrabadh	1470	15	10.20
42	Jessore	Keshabpur	Bidyanandakati	Paschimchandipur	1963	15	7.64
43	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Pirojpur	1847	15	8.12
44	Jessore	Sharsha	Ganganathpur	Satmail	1965	15	7.63
45	Laxmipur	Laxmipur	Municipality	dayopara	3391	14	4.13
46	Laxmipur	Ramgonj	Isapur	Shibpur	879	14	15.93
47	Jamalpur	Sarishabari	Baushi	East Izarpur	834	14	16.79
48	Chandpur	Matlab	Sadullapur	Kaladi	3509	13	3.70
49	Chandpur	Hajiganj	Razergaon	Monapur	1548	12	7.75
50	Noakhali	Chatkhil	Chatkhil	South gatlabag	1603	11	6.86
51	Laxmipur	Raipur	Charababil	Udmara	9281	11	1.19
52	Khulna	Rupsha	T.S. Bahardia	Shalpabahardia	1183	11	9.30
53	Meherpur	Sadar	Kutubpur	Monoharpur	1396	11	7.88
54	Bagerhat	Fakirhat	Pilgong	Berbari	273	10	36.63
55	Chandpur	Sadar	Bagadi	Shobanpur	1581	10	6.33
56	Laxmipur	Laxmipur	Municipality	Pachpara	8220	10	1.22
57	Faridpur	Nagarkanda	Ramnagor	Gojdhaha	1959	10	5.10
58	Pabna	Ishwardi	Pakshi	Hospitalpara	61	10	163.93
59	Kushtia	Sadar	Sadar	Harishankerpur	3822	10	2.62

Dhaka University Institutional Repository

List of villages with 100% TWs contaminated and at least one identified patient

Sl. No.	District	Thana	Union	Village	Total Patients	Patient per 1000
1	Bagerhat	Fakirhat	Pilgonj	Berbari	10	36.63
2	Chandpur	Chandpur Sadar	Bagadi	Shobanpur	10	6.33
3	Chandpur	Chandpur Sadar	Bagadi	Makimpur	1	1.77
4	Chandpur	Chandpur Sadar	Bagadi	Hazra	1	1.56
5	Chandpur	Hajiganj	Hajiganj Sadar	Ahmedpur	3	4.09
6	Chandpur	Hajiganj	Razergaon	Radhunimura	20	10.64
7	Chandpur	Hajiganj	Razergaon	Maishamura	1	0.58
8	Faridpur	Bhanga	Hamerdi	Charkanda	4	2.90
9	Faridpur	Bhanga	Hamerdi	hoglakaandi	2	2.77
10	Gopalgonj	Mokshedpur	Mokshedpur Sadar	Gayender	1	1.53
11	Gopalgonj	Mokshedpur	Mokshedpur Sadar	Raghdi	1	0.79
12	Jessore	Keshabpur	Khosabpur	Hijaldanga	5	7.96
13	Laxmipur	Laxmipur	Laxmipur Municipality	Talhati	21	29.87
14	Laxmipur	•Laxmipur	Laxmipur Municipality	Gazipur	1	1.01
15	Meherpur	Meherpur Sadar	Kutubpur	Shazipara	20	69.69
16	Munshigonj	Srinagor	Srinagor	Balasur	1	0.57
17	Narayangonj	Sonargaon	Aminpur	Hossainpur	17	21.57
18	Narayangonj	Sonargaon	Samvopur	Alahi Nagar	25	12.30
19	Noakhali	Chatkhil	Chatkhil	Vimpur	3	2.08
20	Norshingdi	Raipura	Chanderkandi	Baarmanpara	1	6.76
21	Norshingdi	Raipura	Chanderkandi	Monahorpur	1	1.03
22	Satkhira	Tala	Tatulia	Hatbas	1	0.77

Sourse : Dhaka Community Hospital & UPOSHON Bangladesh.